অধিকার

শক্তিপদ রাজগুরু

গ্রন্থপ্রকাশ । ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ, ১৩৭২

প্রকাশক :

ময়ূখ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

অতীশ বর্ধন

দীপ্তি প্রিন্টার্স

৩, রামনারায়ণ মতিলাল লেন

কলিকাতা-৭০০ ০১৪

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

আবার একটা জেলে নৌকার উপর হানা দিয়ে বাছাড়ি নৌকাটাকে ডুবিয়ে দিয়েছে মনসাতলার গাং-এ। কাউখালির ভূষণ নস্করের নৌকা, একজন মেছোকে নিয়ে গেছে হাঙরটা, আর বাকী চারজন জালের বড় প্লাষ্টিকের বল ধরে ভেসে ছিল, ওদিক থেকে অন্য নৌকা এসে তাদের তোলবার আগে একজনকে কামটে খেয়েছে। পায়ের সব মাংসটুকু ধারালো দাঁতে কেটে নিয়ে গেছে; বিষাক্ত এই ক্ষত।

লোকটাকে কাকদ্বীপে এনেছিল, কিন্তু এখান থেকে ডায়মণ্ড হারবার হাসপাতালে পাঠাবার পরেই মারা গেছে লোকটা।

সুন্দরবনের লাগোয়া গাং—সমুদ্রের খাড়ি। এপার ওপার দেখা যায় না। এই গাং-এ মাছ মারে ওরা, নিজেরাও মরে। মরে সুন্দরবনের বাঘের পেটে, না হয় নৌকাডুবিতে, না হয় কামট-কুমীরের পেটে যায়। তবু রোজগারের আশায় গাং-এ যেতে হয় তাদের।

জেলে-মালোদের পাড়ায় তাই বিধবার সংখ্যাই বেশী। অসহায় কিল্লি-বিল্লির মত বাচ্চা ছেলেগুলোকে খাওয়াবার কেউ নেই। ঘরের চালে খড় নেই। পেটে দানাপানি নেই। ডাঙায় থাকলেও অনাহারে মরতে হবে। জালে গেলে তবু খেতে পাবে তারা। তাই মরতেই যেতে হয় ওদের।

শেষ দ্বীপটি হলো সাগর দ্বীপ—তারপরই বঙ্গোপসাগরের শুরু, অবশ্য তার ভূমিকা শুরু হয়েছে আগে থেকেই। গঙ্গার বিস্তার এই মোহানার মুখে বিরাট। এপার ওপার দেখা যায় না। ওপারে মেদিনীপুরের কণ্টাই মহকুমা, এদিকে ওদিকে বের হয়েছে বিস্তীর্ণ খাড়ি, সমুদ্র যেন লোভী হাঙরের মত সব এখানের মাটিটুকু গ্রাস করতে চায়।

ওদিকে আদিম অরণ্য আর চারিদিকে মারমুখী গাং-এর জলও নোনা, জলে তৃষ্ণা মেটাবার কোন আশ্বাস নেই, আদিগন্ত মৃত্যুগহিন এই গাং। তুফান-এর সময় এর রূপ বদলে যায়।

এর তীরে বসতির লোকজনের রুজি-রোজগার চলে এই গাং-এর মাছ ধরে। ভেটকি—গলদা—বাগ্‌দা চিংড়ি—পমফ্রেট—ভাঙন—গুর্জালি—পারশে এসব তো আছেই। সমুদ্রের বিরাট কচ্ছপগুলোও জালে ওঠে। মুক্ত অবাধ গাং-এ নৌকা নিয়ে ফেরে এরা—হঠাৎ দেখা যায় নীল জলের বিস্তারে উঠছে যেন সফেন উচ্ছ্বাস, বিস্তীর্ণ এলাকার জল ছাপিয়ে সমুদ্র থেকে গাং-এর মধ্যে ঢুকছে রূপালী ইলিশের দল। ওই নৌকাগুলোর মানুষজন কলরব করে ওঠে আনন্দে। নোনা বাতাসে খড়ি উঠছে ওদের সর্বাঙ্গে, চুলগুলোয়

ভেদ পড়ে না। সমুদ্রের দুর্বার হাওয়ায় এলোমেলো চুল—কোটরাগত চোখগুলো ঝক ঝক করে ওঠে, হাঁক পড়ে—

—হোই ই-ই।

মুক্ত গাং-এর বুকে দূরে দূরে ছড়ানো লম্বা সরু বাছাড়ি নৌকাগুলোর লোকজন সজীব হয়ে ওঠে, ওই সমুদ্রফেরার রূপালী মাছগুলো তখন জল মাথিয়ে মনের আনন্দে ঢুকছে নদীর মোহানা দিয়ে, নৌকাগুলো দ্রুতগতিতে জাল ফেলে চলেছে, বেড় দিয়ে কয়েকটা নৌকা মিলে জাল ফেলে ওই ঝাঁকটাকে ঘিরে ফেলতে চায়।

মাছগুলোও টের পেয়ে গেছে।

জলের বুক থেকে তলিয়ে যায় ওরা, গভীরে ডুব দিয়ে জাল-এর তলা ফুঁড়ে পালাতে চায় ওরা। এরাও জাল গোটাচ্ছে, বিস্তীর্ণ পরিসরে ফেলা জালটাকে গুটিয়ে এবার ছোট করে আনছে। বন্দী রূপালী মাছগুলো জালবন্দী হয়ে দাপাচ্ছে, মাঝখানের জালটা মাছ-এ ভরে গেছে। রূপালী ফসল তুলছে ওরা।

মনসাতলার গাং, শুধু, মনসাতলার গাং-এই নয়, কুলতলি, ধবলাট, কাউখালি ফ্রেজারগঞ্জ, জম্বুদ্বীপ-এর সীমানা থেকে হারবার পয়েন্টের বিস্তীর্ণ গাং ধরে এমাথায় সাগরদ্বীপের নীচে গঙ্গার মোহানাতেও কিছুদিন ধরে হাঙ্গর এক জোড়া ঘুরছে।

মাঝে মাঝে ওই মেছো নৌকার দিকে তেড়ে আসে বিরাট দেহ নিয়ে, ল্যাজের ঝাপটায় ওই খুনে হাঙ্গর দুটো নৌকা উলটে মানুষ নিয়ে যাচ্ছে, অকুল গাং-এ নৌকা ডুবতে মরছে-নিখোঁজ হচ্ছে বেশ কিছু মানুষ।

আজও মনসাতলার গাং-এ ওই হাঙ্গরই চড়াও হয়েছে ভূষণদের ডিঙ্গিতে।

কাকদ্বীপের মাছের আড়তগুলো নদীর ধারে ছড়ানো। মদন মোহান্তের আড়তে ভিড় জমেছে। নদীর ধারে বাঁশের খুটির মাথায় টিন-উলুখড় ছাপিয়ে অস্থায়ী চালাগুলোয় সকাল থেকে বৈকাল অবধি তেমন কাজ থাকে না, মাছগুলো এখানে আসতে সুরু হয় সন্ধ্যার মুখে। তখন কলকাতা থেকে ট্রাক-এর সারি যায়, হারবার পয়েন্টের বিস্তীর্ণ গাং-এর বিস্তারের ওপারে দেখা যায় সাগর দ্বীপের গ্রাম-বসতির নিশানা। সাগর দ্বীপেই রয়েছে জাগ্রত দেবতা কপিল মুনির আশ্রম। সেটা অবশ্য দ্বীপের এমাথা থেকে অনেক দূরে। ওপ্রান্তেও আছে মহেশ মান্নার মাছের আড়ত। তার আড়তের মাল আসে নৌকায় কাছে এপারে—ট্রাক বোঝাই হয়ে চলে যায় কলকাতায়।

কিন্তু এবার মাছের আমদানি কমছে।

কাকদ্বীপের আড়তে সেদিন মদন মোহান্তের দাদন দেওয়া নৌকায় জেলেরা এসে জমেছে। নিশু বলে—পরান দিতে ওই গাং-এ যাবো না মহাজন।

মহাজন বলে ওঠে—মাছ ধরবি না গাং-এ? আরে হাঙরতো কটাই ধরা পড়েছে ঘনাবাবুর হাতে। দেখবি এব্যাটাও মরবে একদিন। তাই বলে মাছ ধরতে যাবি না কি রে? এ্যা।

মদন মোহান্ত বেশ সাহস দিয়েই কথাটা বলে। তার আড়তে মাছ না এলে হাজার হাজার টাকা লোকসান হয়ে যাবে।

অনেকেই ভাবছে কথাটা।

বড় নদীর এদিকে বহু জেলেনৌকা দূর গাং থেকে ওই হাঙরের ভয়ে পালিয়ে এসেছে। এমন উৎপাত অবশ্য এই সব গাং-এ হয় মাঝে মাঝে।

দু-একটা খুনে হাঙর এসে পড়ে সমুদ্র থেকে, তারা মানুষ-এর মাংসের স্বাদ পেয়ে হয়তো মেতে ওঠে। একদিন ধরাও পড়ে যায়।

নিশু বলে—একটা নয় গো—মনে হয় জোড়ায় ঘুরছে আর ধরো কেনে এই এক মাসে পেরায় বারো পনেরো জনকে নিয়ে গেছে। নৌকা ডুবিয়ে মেরেছে আর পঁচিশ তিরিশ জনকে।

মদন মোহান্ত, বিধান নস্কর, গদাই রায়-এই মাছের মহাজনরা বিপদে পড়েছে। জেলেদের ও কথাগুলো মিথ্যে নয়।

হঠাৎ নীল জলের বিস্তারে সাদা রাজহাঁসের মত লঞ্চটার গুরু গুরু শব্দে চাইল মদন মোহান্ত, বিস্তীর্ণ গাং-এর বুক ফাটিয়ে লঞ্চটা আসছে। ওর মজবুত রাষ্টন ডিজেল ইঞ্জিনের শব্দটাই আলাদা। লঞ্চটার পিছনে খান চারেক জেলে ডিঙ্গি বাঁধা। কিছুটা তফাৎ তফাৎ-এ বাঁধা ওই নৌকা বহরকে টেনে আনছে লঞ্চটা।

মদন মোহান্ত বলে—ঘনাবাবুর লঞ্চ।

জেলেরা—নিশু কন্দর্প অনেকেই এগিয়ে আসে।

—ছোটবাবু।

কঠিন শক্ত সমর্থ একটি তরুণ লঞ্চের ছাদের সারেঙের ঘর থেকে স্টিয়ারিং ছেড়ে বাইরে এসেছে। উস্কোখুস্কো চুল উড়ছে নোনা হাওয়ায়, পরনে প্যান্ট-সার্ট, ময়লা তেলকালির দাগ লাগানো।

ঘনশ্যাম লঞ্চ-এর ছাদ থেকে কাদায় লাফ দিয়ে নেমে হাঁক পাড়ে—সর্দার, ওগো মহাজন-এর মালপত্র ট্রাকে তুলে দাও। এ্যাই মটরা লঞ্চের ইঞ্জিনটার তেলকালি মোছ, ডেকটা ধুয়ে ফেল।

তীরের লোকজন মায় মহাজন মদন মোহান্তকে দেখে বলে ঘনশ্যাম—কি ব্যাপার মোহান্ত মহারাজ। এ্যাই মুখবোদা করে আছো কেন মাইরী? আজ মাছপত্র ভালো আসেনি? তুমিও আমাদের সাগর দ্বীপের মহেশ মান্নার মত হয়ে উঠলে দেখছি। মাল না পেলেই মুখ ব্যাজার।

মদন বলে—আজও বেপদ ঘটেছে গো।

কাউখালির নিশু বলে—আবার আজ মনসাতলার গাং থেকে একটা নৌকা বুড়িয়ে একজনকে সে গেল ব্যাটা। আর কিষ্ট গাং-এর জলে পড়েছিল কামটে কেটে শেষ হয়েছে।

—সেকি! আবার আজও হানা দিয়েছে সেটা! গর্জে ওঠে ঘনশ্যাম—তোরা ডবল জাল দিয়ে ঘেরতি পারলি না? ক্যামন মাছমারা রে? এ্যাঁ! গাং-এ হাঙর মারতি পারিস না, হাঙরই এসে শেষ করে দেবে তোদের।

মদন মোহান্ত এবার ভরসা পেয়ে বলে—তাই তো বলছিলাম ওদের। জেলের পো—জলের জীব, মানুষ হয়ে ডরিয়ে থাকবি?

নিশু দেখেছে সেই হাঙরটাকে।

বলে সে ঘনশ্যামকে—সিবার নয়নতলির গাং-এ যিটাকে মারলেন ইটা তার চেয়ে বড়ো গ। সন্ঝার মুখে মুখে একেবারে ঘাই মারলে নৌকার প্যাট বরাবর—

ঘনশ্যাম কি ভাবছে।

দেখছে সে ওই অসহায় মানুষগুলোকে। রুজি রোজগার বন্ধ করে প্রাণের ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে এসেছে। এর আগেও ঘনশ্যাম দেখেছে এই সমুদ্রের খাঁড়িগুলোয় দু'একটা সমুদ্রচর হাঙর এসে হানা দিয়েছে। কিছুদিন উৎপাত করে ফিরে চলে গেছে সমুদ্রে, দু-তিনটে হাঙরকে ঘনশ্যামই শেষ করেছে। সে শুনেছে এই নোতুন উৎপাতের কথা। বলে ঘনশ্যাম—মনসাতলির গাং-এ ছিল আজ?

ঘাড় নাড়ে নিশু—হি গো। পেল্লায় হাঙর।

ঘনশ্যাম-এর মনে এই হাঙরের কথাটা গেঁথে যায়। দেখেছে সে এখানের জীবনকে, মানুষদের। সেও ওই নদীর পারে সাগর দ্বীপের বাসিন্দা, জলের বেড়াজালে বন্দী সাগর দ্বীপের মাটিতে মানুষ হয়েছে। লড়াই করে চলেছে, বাঁচার লড়াই।

নিজের লঞ্চ নিয়ে মাছের ব্যবসায় নেমেছে. চিনেছে এই মাছ মহাজনদের,

দেখেছে সাগর দ্বীপের কিছু লোভী মানুষদের, মহেশ মান্নাকেও।

হাঙরের কথা শুনলেই তার মনে হয় নিষ্ঠুর নৃশংস লোভী একটা শ্রেণী। তারা গহিন অতল গাং ঘুরে বেড়ায় কি অপরিসীম বুভুক্ষা নিয়ে, সব কিছু গ্রাস করতে চায় তারা।

শুধু অতল গহীন এই গাং-এই নয়, মাটিতে—মানুষের সমাজে দেখেছে তেমনি লোভী, হিংস্র কিছু আদিম মানুষকে। তারা অপরের সর্বস্ব লুঠ করে নিতে চায়। তার জন্য যে কোন পথ নিতে বাধে না তাদের। ঘনশ্যাম-এর রাগ এই জলের, ডাঙার ওদের উপর।

কিন্তু ডাঙার হাঙররা আরও কৌশলী চতুর, তাই সহজে ধরা পড়ে না। তাই ঘনশ্যাম যেন জলের অতলের ওই আদিম হিংস্র জানোয়ারগুলোকেই শেষ করতে চায়। ওদের শেষ করে আনন্দ পেতে চায়।

নিশাকর সর্দার দলবল নিয়ে মহেশ মান্নার আড়তে ওদেরই ধরে আনা মাছগুলো এবার চালান দিচ্ছে ট্রাকে করে।

যতীন-রতন-সবাই ওরা ঝুড়ি ঝুড়ি পমফ্রেট-ইলিশ-ভেটকি আর গলদা চিংড়ি তুলছে।

মদন মোহান্ত-গদাই আরও মহাজনরা দেখছে ওই মাছগুলোকে। জানে ঘনশ্যামের লক্ষে করে ওই নিশাকর সর্দার তাদের বসতির জেলেদের নিয়ে নৌকা বেঁধে দূর গাং-এ যায়। তাই মাছ ভালো পায় তারা। সরেশ মাছ।

অবশ্য সবই সাগর দ্বীপের মহেশ মান্নার দাদনের মাল, মায় সাগরজাল অবধি দেয় ওদের মান্নামশাই। আর রোজগারও করে তেমনি।

মদন বলে—সর্দার এসব মাছ এখানে আমাদের আড়তে আনলে মান্নাবাবুর চেয়েও ভালো দর দিতাম গো। আজ কি দরে দিলে ইলিশ ওই বাগদা?

সর্দার জানে মহেশ মান্না তাদের কম দামই দেয়। বাধ্য হয়ে নিতে হয় তাদের সেই দামই। তবু ইদানীং ঘনশ্যামবাবুর লঞ্চ পেয়ে তারা ভালো মাছ ধরছে।

বলে সর্দার—পাঁচশো টাকা মণ দিচ্ছি ইলিশ, বাগদা গেছে কুড়ি টাকা কিলো।

—এ্যাঁ—ই যে জলের দর হে?

কথাটা ভাবছে এবার নিশাকর। যতীন ঝুড়ির মাছ ট্রাকে ঢেলে বলে—ঐ মান্না মশয় সব লাভ খেছে গো। দাদনের ট্যাকা শ্লা আর শোধ হয় না তবু!

নিশাকর সর্দার বলে—মাছ জাল কেটে বেরুতি পারে না আমাদের হাতে, কিন্তুক ওই মান্না মশয়-এর জাল আরও কঠিন গো, উ জাল কেটে

বেরুতি পারলি বাঁচতাম—তা বাবা কপিল মুনি কি সিদিন দিবে ?

কথাটা ভাবছে ওরা।

মদন মোহন্ত বলে—কেন ? সমবায় করো না ? বলো ঘনশ্যামবাবুকে, লঞ্চ আছে তুমাদের হাতে। ট্যাকা দিবে সরকার !

ওরা যেন কথাটা নোতুন শুনছে।

রতন বলে—কি গো সর্দার। বলো কেনে বেতাস্তটা ঘনাবাবুকে—

ঘনশ্যাম-এর ভাবনা এখন সেই হাঙরটাকে নিয়ে। জেলেরা ডিঙি ছেড়ে এসে ঘিরে ধরেছে তাকে। কে বলে—একবার দেখেন ছোটবাবু। নালে মাছমারা বন্‌ধো—খাবো কি ?

ঘনশ্যাম বলে—দেখছি। কি করা যায়।

নিশাকর সর্দারকে দেখে চাইল। বৈকাল নামছে। ঘনশ্যাম বলে,—কাজ শেষ হ'ল ! চলো ফেরা যাক্ ! ঘাটে গে লঞ্চে কিছু মালপত্তর তুলতে হবে রতন ! যদি সামনে পড়ে যায় ব্যাটা, ঘায়েল করতে হবে সেটাকে !

রতন বলে—আবার হাঙরের পিছনে ঘোরবা ? হুদ্দা জানোয়ার মারি কি দাম পাবা ? সিবার মারলা—ইয়া জানোয়ার ! পেলাম মোটে দুশো ট্যাকা বকশিশ ! সরকার থেকে ফটোক তুললেক, তাতে কি হয়েলো বলো !

ঘনশ্যাম ধমকে ওঠে—থাম তুই !

লাফ দিয়ে গিয়ে লঞ্চে উঠে নিজেই হুইলখানি ধরে ঘণ্টা দেয়, ইঞ্জিনটা সুরেলা শব্দে গর্জে ওঠে। জলকেটে ব্যাক করে ঘাটের পাটাতন পিছনে রেখে এগিয়ে চলেছে ঘনশ্যামের লঞ্চটা। পিছনে স্রোতে লাফাচ্ছে বাঁধা নৌকাগুলো। নিশাকর সর্দার বিড়ি ধরিয়ে টানছে। দূরে দেখা যায় তাদের সাগর দ্বীপ-এর ঘর-বাড়িগুলো। আরও দূরে ঝাউবন-সুন্দরবনের কিছু চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেওড়া-গরান গাছের ঝুপি জঙ্গল, তার পরই সমুদ্র।

বেলাভূমিতে দেখা যায় সাদা চুড়াটা—কপিল দেবের মন্দির। বালিয়াড়ি—আর সমুদ্র। এখন জনহীন মন্দিরের দেবতার উদ্দেশে দু'হাত তুলে নমস্কার জানায় ওরা।

—জয় বাবা কপিল মুনি। জয় মা গঙ্গা—

জমিতে ফল দিও, ফসল দিও। গাং-এ দিও রূপালী মাছের ঝাঁক।

ঝড় তুফান ডাঙরিকে সামলে দিও মা। বাঁচতি দাও। বড় কষ্টের এ জেবন।

ভুবন মাইতির বয়স হয়েছে। চোখের নজরও কমে আসছে। শক্ত

সমর্থ শরীরের বাঁধন এবার ধ্বসে পড়ছে। বিরাট একটা মহীরুহের কাণ্ডের ভিতর ঘুন পোকা বাসা করলে বাইরে থেকে তার খবর মেলে না, কিন্তু ক্রমশঃ গাছটা শুকিয়ে আসে, ভুবন মাইতির অবস্থাও ঠিক তেমনি।

এককালে ভুবন মাইতি ছিল সাগর দ্বীপের বহু জোতজমার মালিক. তখন ভরজোয়ান একটি যুবক। নিজের চেষ্টায় সমুদ্রের মধ্যে এই সাগর দ্বীপে এসে বেশ কিছু জঙ্গল জলা কেটে বাঁধ দিয়ে লাট-এর পত্তন করেছিল, জমিদার লাহা বাবুদের কলকাতার কাছারিতে গিয়ে বন্দোবস্ত নিয়ে এসে তার দখল কায়েম করেছিল।

নোনা গাং তিনদিকে—একটা ছোট খাল দ্বীপের শেষ প্রান্তের এ মাথা থেকে ফুঁড়ে ও মাথা দিয়ে বের হয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে, তার ওদিকে বিস্তীর্ণ বালুচরে কপিল মুনির মন্দিরের এপাশের লাটগুলোর চারিদিকে ভেড়ি বাঁধ দিয়ে ভুবন মাইতি সেদিন ফসল ফলিয়েছিল।

মেন ল্যাণ্ড বলতে কাকদ্বীপ অঞ্চল। ডায়মণ্ডহারবার থেকে টানা পথ এসে থেমেছে কাকদ্বীপের হাটতলায়। সাগর দ্বীপের গ্রামবসতের মানুষকে এখান থেকে বিরাট চওড়া খাড়ি পার হয়ে দ্বীপে আসতে হয়। লোকজন মালপত্র সবকিছু আনতে হয় ওই পথেই। শীতের ক'মাস গাং ঠাণ্ডা থাকে, তাও মেঘ দেখলে খোলা সমুদ্র মেতে ওঠে। তবু কোনরকমে আসা যায় নৌকায়। তারপর দখনে বাতাস উঠলে ওই খাড়ির বুক উত্তাল হয়ে ওঠে। কয়া ঢেউগুলো লাফিয়ে ওঠে ছোবল মারা গোখরো সাপের মত—বেকায়দায় নৌকা পড়লে তলিয়ে যাবে। তলিয়েও যায় অনেক নৌকা।

মৃত্যুমুখর ওই বিস্তীর্ণ গাং—তবু ভুবন মাইতিই সদরে দরবার করে সরকারি খেয়াঘাট-এর প্রতিষ্ঠা করেছিল এখানে।

এস-ডি-ও সাহেব বলেন—ওই গাং-এ বারো মাস খেয়া পারাপার করতে পারবে?

তখনও এটা ভাবার কথাই ছিল।

নির্জন সাগর দ্বীপে সাধারণ মানুষজন বড় একটা যেতো না, যেতো শুধু মাত্র বছরে একবার। সেই সাগরতীর্থে যাবার রেওয়াজ আছে যুগ যুগ ধরে। বিস্তীর্ণ সমুদ্রের স্বাদে মাতাল খাড়ি, দ্বীপের বেশ কিছু অংশ তখনও আদিম অরণ্যে আবৃত। থাকার কোন আশ্রয় নেই।

তবু সারা ভারতবর্ষ থেকে আসে তীর্থযাত্রীর দল ওই মকর সংক্রান্তির সময়। যুগ যুগ ধরে আসছে ওই সাগরসঙ্গমের তীর্থে।

সব তীর্থ বার বার

গঙ্গাসাগর একবার।

এমন দুর্গম বিপদসঙ্কুল স্থান এই সাগরদ্বীপ।

তবু এই দুর্বার গাং পার হয়ে নৌকায় করে কয়েকদিন ধরে ভাসতে ভাসতে মানুষ আসে ওই তিনদিনের জন্য। সরকারী লোকজন পুলিশ পাহারা দিয়ে রাখে সেই চরভূমি। তবু রাতের অন্ধকারে বন থেকে বাঘ বের হয়ে আসে চড়াও হয় মানুষের উপর। আর নদীর উত্তাল গর্ভে কত নৌকা তলিয়ে যায়—কত মানুষ ভেসে যায় হারিয়ে যায়, তার খবর থাকে না।

কয়েকদিনের পর মেলার কলরব থেমে আসে। বালুচরে পড়ে থাকে ক'দিনের মানুষের পায়ের চিহ্ন, শালপাতা, টুকরো বাঁশ, খড়—এটা সেটা। কোটালের জোয়ারে দেবতার অঙ্গন আবার সাফ করে দেয় সমুদ্র, আবার সারা বছর ধরে ওই চরভূমিতে জেগে থাকে অসীম, অখণ্ড নির্জনতা। বাতাসে ওঠে সমুদ্রের গর্জন আর গাং চিলের তীব্র চীৎকার!

····সেই আদিম সাগর দ্বীপকে দেখেছিল তরুণ ভুবন মাইতি। রয়ে গেছলো এখানে, ক্রমশঃ জমি জারাত করে এবার পারঘাটার দায়িত্ব সেইই নেয়।

এস-ডি-ওর কথায় বলে ভুবন—গাং পাউড়ি দিতি পারবো সাহেব, ওই গাং-এতো আমাদের সব। মানুষ ইথানে ঘর-বসত করছে, পারাপার হবে না?

নোতুন কয়েকখানা মেদনীপুরী টাইপের সমুদ্রে চলাচল করার নৌকাও বানিয়ে নেয় মজবুত করে, দাঁড় হাল ছাড়াও এই নৌকায় বিরাট পাল কয়েকখানা লাগানো থাকে, যেদিকেই হাওয়া থাকুক না কেন—এরা পালকে সেইভাবে টাঙিয়ে হাওয়ার সাহায্যেই ভেসে চলে বেশ জোরে।

ভুবন মাইতি সেদিনের কথা ভুলতে পারেনি আজও।

সাগর দ্বীপে সবে দু-দশটা বসতি গড়ে উঠছে। নোতুন জমি পত্তন করে এবার ফসল ফলাচ্ছে, আর মাছ-এর লোভে এসেছে অনেক জেলে-মালো।

নিশাকর সর্দার তখন যুবক। সেও এসেছিল তার কাকার সঙ্গে জীর্ণ কয়েকটা নৌকা আর পুরানো জাল নিয়ে। ওরা বলে—একটু ঠাই দ্যান বাবু, তালি ঘর বাঁধতে পারি।

ভুবন মাইতিও চায় আবাদে—এই দ্বীপে আরও মানুষ আসুক।

ভুবন বলে—বেশতো। জায়গার অভাব কি হে সর্দার। দিচ্ছি, সব ব্যবস্থা করে। কাছাকাছি গাং-এর ধারেই থাকো।

প্রশস্ত বালিয়াড়ি চলে গেছে সমুদ্রের জলের কাছে, এদিকে বেশ খাড়া বালির পাহাড়। আপনা থেকেই গজিয়েছে ঝাউ গাছগুলো।

সেই থাড়া চড়াই-এর বিস্তীর্ণ জমিতে ওরা ঘর তোলে।

ভুবন বলে—মানুষ জন নাহলি দ্বীপের বসত জমবে কেন ? ঘর বাঁধো, গাং-এ মাছ-এর শেষ নাই মা গঙ্গা আর বাবা কপিল মুনির দয়ায়। ধরো।

ওরা বসে গেল এখানে তখন থেকেই।

ভুবন মাইতির পারঘাট পত্তন হবার দিন তাই দ্বীপের এদিক ওদিকে ছড়ানো বসতিগুলো থেকে মানুষজন ভিড় করে আসে। নিশাকর-এর কাকা, বসতির অনেকে নোতুন কাপড় পরে ভুবনের সঙ্গে কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দিয়ে এসে নৌকাগুলোর গলুই-এ তেল সিঁদুর মাখিয়ে ঢোল বাজিয়ে যাত্রীদের নিয়ে গাং পাড়ি দিল। তরুণ নিশাকর বৈঠা ধরেছে। ওপারের মেনল্যাণ্ড-এর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটছে তাদের। নরহরি ভটচায এসেছিল মেদিনীপুর-এর কোন গাঁ থেকে সাগর মেলায়। শীর্ণ প্যাকাটির মত লম্বা মানুষটা, হাওয়ায় যেন উড়ে যাবে। হিল্ হিল্ করছে, পরনে ময়লা কাপড় আর ফতুয়া। ওই শীতে গায়ে জড়িয়েছে একটা ভুটকম্বল, বগলে পুঁটুলি। ওই তার একমাত্র স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি।

তাই নিয়ে মেলায় আসে ও ক'বছর থেকেই।

দু-একদিন আগে এসে বসতির কোন চাষীর কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে একটা এড়ে বাছুর দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায় মন্দিরের ওদিকের ঘাটে।

যাত্রীদের গঙ্গাস্নান—গঙ্গাপূজা করিয়ে দেয়। আর তার চেয়ে বেশী পুণ্যার্থীদের অনেকেই ব্রাহ্মণকে গরু দান করে। ষোল আনায় সেই গোবৎস কিনে দান করে ভটচাযকে। অর্থাৎ ফি পুণ্যার্থী পিছু তার ওই গরু বেচাকেনা করে লাভ হয় এক টাকা। কুল্যে তিনদিনে কয়েকশো টাকা কিছু কাপড় আতপান্ন জোটে।

কিন্তু তিনদিনের কেনা বেচার পর আবার সব শেষ। নরহরি ভটচাযও কোন দেহাতী নৌকায় ফিরে যায় তার গ্রামে। সেখানে অপেক্ষা করে আছে মুখরা ব্রাহ্মণী—কয়েকটা এণ্ডি গেণ্ডি ছেলেমেয়ে আর সম্বৎসরান্ত উপবাস।

কয়েকবার এই মৌসুমী পাখীর মত মেলার সময় সাগর দ্বীপে আসা যাওয়ার ফলে ভটচায এখানে পরিচিত হয়ে উঠেছে। দেখেছে ধূর্ত লোকটা ক'বছরের মধ্যেই সাগর দ্বীপের হাল বদলাচ্ছে। মাছের ব্যবসা জমছে, গড়ে উঠছে চাষ আবাদী জমি, নোতুন গ্রামবসত। আর এবার সরকারী পারঘাটা হওয়ার ফলে মেনল্যাণ্ড-এর সঙ্গে যাতায়াতের পথও সুগম হয়েছে। রুদ্রনগর—কচুবেড়িয়ায় হাট ইস্কুল বসেছে। রাখি দোকান বাঁধি দোকানও হয়েছে।

নরহরি ভটচাযও এবার ভেবেছে কথাটা।

আর জানে একটা লোক তাকে সাহায্য করতে পারে। সে ভুবন মাইতি।

পারঘাটের পুজো ঘটপুজো করতে আসে নরহরি ভটচায। কারণ পূজারী বামুন এখানে নেই। তাই ভুবনের কথায় নরহরি মেলার পরও ক'দিন রয়ে গেছে এখানে।

আর তখনই মতলবটা মাথায় এসেছে তার।

নরহরি ভটচায, বলে—মাইতিমশাই, ভাবছি এখানেই একটু ঘর তুলে থেকে যাই। গাঁয়ে কি আছে যে ফিরবো? একটুন ভরসা পেলে এখানেই থাকবো, ওদেরও নিয়ে আসবো।

ভুবন মাইতি ধর্মভীরু লোক। ঠাকুর দেবতা মানে। একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে বসানোয় পুণ্য আছে, নোতুন বসতে সকলেরই দরকার। এর মধ্যে কিছু কর্মকার—ছুতোর এসে গেছে। নৌকা ডিঙ্গি গডতে, ঘর গড়তে ছুতোর লাগে। দাল-কাস্তে-কুড়ুল গড়তে চাই কর্মকার। তাও এসেছে।

এসেছে গিরীশ কবিরেজ, গঞ্জের বাজারে কবরেজখানা খুলেছে। এবার পূজারী বামুনের সন্ধান পেয়ে ভুবন মাইতি বলে—বেশ তো। থাকতে চাও ঠাকুর—সব ব্যবস্থা হবে।

নরহরিও বসত গেড়েছে। আর এদিক ওদিক করে বিঘে সাতেক ধান-জমিও পেয়েছে ভেড়ির ঘেরে। এতদিন পর এই দ্বীপে এসে মাটির সন্ধান পায় নরহরি। এখানেই বসতি করার কথা ভাবছে সে।

নরহরি বলে—তাহলে গিন্নীকেও আনছি এবার।

ভাত-ভিতের ব্যবস্থা হয়ে যায় নরহরির ভুবন মাইতির দয়ায়। বাতাসে ফুলফোটার খবর ছড়িয়ে পড়ে। মৌমাছিদের কানে এখবর দিতে হয় না। আপনা থেকেই পৌঁছে যায়। সাগর দ্বীপের মাছ ধরার কাজ শুরু হয়েছে। কারণ এই দিকের গাং-এ মাছ অনেক, তাই এবার ভিড় করছে জেলেরা।

ভুবন মাইতির ছেলেপুলে নেই। শূন্য ঘর। গিন্নী কাঞ্চনবালা দিন রাত সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আর আছে বিধবা ননদ গিরিবালা। ভুবন মাইতির তখন বাড়বাড়ন্ত। সাগর মেলার কিছু দিন আগে থেকেই দ্বীপে সরকারী মানুষজনের বোট-ইষ্টিমার-এর যাতায়াত শুরু হয়।

এখন কচুবেড়িয়াতে ভুবন মাইতির পারঘাটা হওয়ার ফলে জেটির মত হয়েছে। গঞ্জের স্কুলে লোকজনের থাকার জায়গা হয়, ভুবন মাইতির লম্বা চালাগুলোতেও কিছু লোকজন যারা মেলা পত্তন করার কাজে আসে তারাও থাকে।

ইনজিনিয়ার সাহেব বলেন—মাইতিমশায়, এতদিন সাগর দ্বীপের লোকজনদের সাহায্য পাইনি, কোন রকমে আমাদেরই মেলার সব ব্যবস্থা করতে হতো। এবার আপনিও আসুন। মেলার কাজ বাড়ছে, আপনিও ঠিকেদারী নিয়ে ঘর ফর একটু তুলে দেবার ব্যবস্থা করুন। মিঠে জলের পুকুরে ওষুধপত্র দিয়ে দিচ্ছি—ওটাকে পাহারা দেবার লোক রাখুন। টাকার জন্য ভাবনা হবে না। এসব তো স্থানীয় লোকদেরই কাজ।

ভুবন মাইতি এগিয়ে এসেছিল।

এসেছিল গঞ্জের গিরীশ কবরেজ, জগন্নাথ জানা আর বসন্ত পণ্ডিত। ওই স্কুলের মাষ্টার। জেলাকমিটি গড়ে উঠেছিল।

ভুবন মাইতি ঠিকাদারী নিয়ে সেবার বেশ কিছু টাকা রোজগার করেছে।

মেলা ভেঙ্গে আসছে।

মকর স্নানের বৈকাল থেকেই সেবার আকাশ ছেয়ে মেঘ জমে ওঠে। সমুদ্রের বুক থেকে কালো মেঘ শীতের দিনও হানা দিয়েছে দল বেঁধে। সমুদ্রের হালও বদলাচ্ছে।

তার জের এসে পৌঁচেছে খাঁড়ির বিস্তারেও।

সরকারী লোকজন মেলায় ঘোষণা করছে—সাবধানে যাবেন। সম্ভব হলে নৌকা ছাড়বেন না এসময়।

তবু ভীত ত্রস্ত যাত্রীদল এই জায়গা থেকে চলে যেতে চায়। জানে ঝড় তুফান উঠলে সমুদ্র উত্তাল হয়ে এসে এই চরভূমির আশ্রয়টুকু ভাসিয়ে দিতে পারে।

ঝড় উঠেছিল সন্ধ্যার বেশ কিছু পরে, তখন চলেছে জোয়ারের টান। সমুদ্রের জল ছুটেছে সভ্য মানুষের বসতের দিকে। অনেকেই ভেবেছিল ঝড়ের আগেই তারা কাকদ্বীপ—না হয় আরও উপরে ডায়মণ্ডহারবার নাহয় ওপারে মেদিনীপুরের দিকের তীরে পৌঁছে যাবে।

দু-চারজন ভাগ্যবান পৌঁছেও গেছে।

কিন্তু অনেকেই তখনও পাউঁড়ি তুলতে পারে নি। মাঝ গাং-এ রয়ে গেছে। হঠাৎ রাতের কালিঢালা অন্ধকার সমুদ্রের দিক থেকে এসে হানা দিল দুরন্ত ঝড়।

সারা নদী খাড়ির বুকে গর্জে ওঠে তুফান।

ঢেউগুলো ক্ষেপে ওঠে—মাতাল নদীর ঢেউ-এর মাথায় আছড়ে ওঠে নৌকাগুলো। রাতের অন্ধকারে চীৎকার, আর্তনাদ কোথায় তলিয়ে যায়

ওই গর্জনে।

ছিটকে পড়লো কত যাত্রী, তলিয়ে গেল নৌকা—গহনার বড় নৌকা। কাছি ছিঁড়ে অনেক মাল গুজারী নৌকা নদীতে গিয়ে তলিয়ে গেল—কেউ ভেসে গেল কোন দিকে।

....রাত্রিভোর ঝড় তুফান-এর মাতামাতি চলে।

সাগর দ্বীপের জনবসতের মানুষ এমন ঝড়ে অভ্যস্ত। কিন্তু এই সময় এমন ঝড় তারা দেখেনি। ফুঁসছে নদী—আছড়ে পড়ে মত্ত ঢেউগুলো বালুচর ছাপিয়ে বনভূমিতে-প্রান্তরে। কালিঢালা রাতের অন্ধকারে যেন মেতে উঠেছে পৃথিবী—এই দ্বীপটাকে গ্রাস করার জন্য।

সকাল হয়েছে—আকাশ তখন কিছুটা শান্ত। তবু ঘসা কাচের মত ঘোলাটে মেঘ জমে আছে। নদী, গাং-এর ফোঁসানি তখনও যায়নি।

ভুবন মাইতি, সরকারী অফিসাররা স্টিমার আর বড় নৌকা নিয়ে বের হয়েছে গাং-এ। ভেসে চলেছে অনেক ভাঙ্গা নৌকা।

কাঠ বাঁশ ভেসে চলেছে।

নির্জন চরভূমিতে হঠাৎ নেমে চমকে ওঠে ওরা!

নৌকাটা বোধহয় ডুবেছিল কাছেই, মাঝ গাং-এ ভাঙ্গা নৌকার বড হালটা ভেসে এসেছে এইদিকে, ভাটার টানে এখন কাদাবালি বের হয়ে গাং-এর তুফানে ফুলে ওঠা জল নীচে নেমে গেছে। সেই কাদার উপর হালের পাটাতনে পড়ে আছে একটি বয়স্কা মহিলার মৃতদেহ--ওর বুকে জড়ানো ছেলেটার দিকে চেয়ে চমকে ওঠে ভুবন মাইতি।

ছুটে গিয়ে ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখে হিম ঠাণ্ডা হলেও ছেলেটা বেঁচে আছে। চীৎকার করে ওঠে ভুবন—স্যার। বাচ্চাটা বোধ হয় বেঁচে আছে।

—তাই নাকি!

ওঁরাও এগিয়ে যান। স্টিমারে ওদের তুলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ডায়মণ্ডহারবার এনে বাচ্চাটাকে সুস্থ করা হয়, কিন্তু মহিলা আগেই মারা গেছেন।

খোঁজ খবর করার চেষ্টা চলতে থাকে।

ভুবন মাইতির ছেলেপুলে নেই। আজ ওই বাচ্চা ছেলেটাকে বাঁচিয়ে তুলে তার মনের কোণে একটা নোতুন ভাবনা দেখা দেয়। আশা, হয় তো স্বপ্নও।

সরকারি মহল থেকে খোঁজখবর করা হতে থাকে।

কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছিল দূর দুরান্ত—ভারতের বহু প্রদেশ থেকে। তারা অনেকেই ফিরে গেছে। অনেকে ফেরেনি। কেউ মারা গেছে, নিখোঁজ হয়ে গেছে এই দুস্তর গাং-এ।

এই ছোট্ট একটা ছেলের খোঁজও কেউ জানে না।

দু' চারজন আসছে, হাসপাতালে বাচ্চাটাকে দেখে। কিন্তু তারা নিশানা দিতে পারে না।

ভুবন মাইতি বলে এস-ডি-ওকে —স্যার। এখানে অযত্নে পড়ে আছে বাচ্চাটা। তার চেয়ে বরং যদি অনুমতি দেন আমি ওকে বাড়িতে নিয়ে যাই। ওখানেই রাখবো—কোন অযত্ন হবে না। যদি এর মধ্যে খোঁজখবর মেলে যার ছেলে তাদের ফিরিয়ে দেবেন।

এখানে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে স্যার। হয়তো শক্ত অসুখে পড়ে যাবে।

প্রবীণ এস-ডি-ও সাহেবও ভাবছেন কথাটা। ভুবন মাইতি সাগর দ্বীপের নামকরা লোক। তাকে বিশ্বাস করা যায়, আর ছেলেটা ওখানে তবু ওর বাড়ির মেয়েদের কাছে যত্নেই থাকবে।

তিনি বলেন—ঠিক আছে।

ভুবন মাইতি সেদিন খুশিমনে বাড়ি ফেরে ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে।

কাঞ্চনবালা আর ভুবনের বোন গিরি দুজনেই অবাক হয়। কদিন ধরে ভুবন সহরে গেছে, এদিকে ঝড়ের পর নানা বিপদের খবর আসছে, গঞ্জের মানুষগুলো দেখেছে এই গাং-এই ধ্বংসের একটা নোতুন রূপকে।

অবশ্য সরকার আছে, অঘোর সরকার।

পারঘাটের কাজ এখন জোর চলেছে, কাতারে কাতারে মানুষজন আসছে এদিকে হারানো বহু যাত্রির খোঁজ নিতে। কান্নার রোল ওঠে।

এমনি সময় সেদিন সন্ধ্যার মুখে ফিরে এল ভুবন মাইতি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে। অবাক হয় বাড়ির লোকজন?

—কাদের ছেলে গো? এগিয়ে আসে কাঞ্চন।

ভুবন ছেলেটাকে ওর হাতে দিয়ে বলল—কাদের তা জানি না এখন তোমারই!

চমকে ওঠে কাঞ্চনবালা! বাচ্চাটার বয়স বেশী নয়, বছর দু-আড়াই-এর হবে। ডাগর চোখ, শ্যামলা বরণ, মাথায় একরাশি কোকড়ান চুল, এতটুকু ভয় ডর নেই, ছোট্ট দুটো নরম হাত দিয়ে কাঞ্চনের একরাশি চুল ধরে খেলা করছে।

অস্পষ্টস্বরে সন্ত শেখা দু-একটা আওয়াজ করে—ম্-মা-ম্—কাঞ্চন চমকে ওঠে।

কয়েক বছর বিয়ে হয়েছে তাদের, মা হতে সে পারে নি। কোথায় একটা অব্যক্ত বেদনা লুকিয়ে ছিল, কচি কাঁচা শিশুর নিবিড় স্পর্শে আর ওই ডাকে সারা মনে ঝড় ওঠে কাঞ্চনের।

পরম আদরে বুকে জড়িয়ে ধরে বাচ্চাটাকে—ডাকাত। ডাকাত রে। খুদে ডাকাত। ও ঠাকুরঝি।

গিরিবালা কলাই পাছড়াচ্ছিল, কুলোটা নামিয়ে এখন ছেলেটাকে দেখে শুধোয়—কাদের ছেলে গো দাদা। এ্যা—একবারে শ্যাম-এর মতন।

খবরটা শুনে চমকে ওঠে ওরা।

কচি বাচ্চাটার জন্য দুঃখ হয়—আহা এইটুকু শিশুকে নে কেউ এই তীর্থে আসে? এখন কোথায় এর খোঁজ করবে। আর বরাতও এর, এই বয়েসে মাকে হারালো।

ভুবন বলে—মাকে হারিয়ে নোতুন মাকে পেয়েছে। তোকে পেয়েছে। পারবি না একে মানুষ করতে?

গিরিবালা অবাক হয়—আমাদের ঘরে থাকবে?

—হ্যারে। লোকে জানবে আমাদেরই ছেলে! আর ওর নাম রাখছি তোর কথা মতই ঘনশ্যাম।

দামাল বাচ্চাটা এক রাশ চুল নেড়ে ডাগর চোখ মেলে তার নোতুন মা—নোতুন আবাসটাকেই দেখছে নিশ্চিন্ত মনে।

সে আজ কত দিনের কথা।

আর ওই ঘনশ্যাম এবাড়িতে আসার পর ভুবন মাইতির অবস্থাও বদলে গেছলো।

পারঘাটের ব্যবসা চলছে জোর। অনেকখানি জমি জোত নিয়ে চাষবাস ফেঁদেছে, সংসারে এসেছে প্রাচুর্য, আর ছেলেটাও বড় হয়ে উঠেছে। এখানেই রয়ে গেছে। এই মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

সাগর দ্বীপ কচুবেড়িয়া রুদ্রনগর-এর সবাই জানে তাকে ভুবন মাইতির ছেলে হিসেবেই।

মাছ-এর কারবার করতে আসে সেবার মরশুমের সময় কালো মুষকো একটি তরুণ। পরনে ডবল কাপ সার্ট মিহি-ধুতি কালো মোষের কাঁধের মত ভাঁজ পড়া গলায় একটা মফচেন হারও রয়েছে। ওর কাকার চোখ দুটো ঘুরছে। সঙ্গের ছেলেটাও কাকারই মিনি সংস্করণ।

কাকার সঙ্গে মহেশ মান্না অবশ্য এর আগেও এসেছে এই দ্বীপে, সেবারে

লাহা বাবুদের ওখানে দরবার করে গঞ্জের ওদিকে একলপ্তে পাতত প্রায় বিঘে ষাট জায়গা বন্দোবস্তও নিয়েছে ওর কাকা, যোগ্য ভাইপো মহেশ চাষ আবাদ দেখছে কাকদ্বীপে থেকে।

মহেশ এবার এসেছে নিজের ডিঙি নিয়ে। পানসীই বলা যায়, নামখানার ওদিকে মাছের কারবার করতে চায় সে। এবারে সাগর দ্বীপে এসেছিল মেলায় কিছু ঠিকাদারী কাজ নিয়ে। সেই কাজের পরেই ভোড়ের ওদিকে ঘর তুলেছে। নীচেই গাং-এর বালিচর, এখানের জেলে বসতির অনেকটা জায়গা তার এলাকায় পড়েছে। কারণ তারা মাপজোপ করে বাড়ি ঘর তোলেনি। বসতি বাড়ছে, ওরা পতিত ঝাউবন দখল করে ঘর করেছে।

জেলেরা বালিয়াড়িতে নৌকা মেরামত করে, জাল শুকুতে দেয়। বাড়তি মাছগুলোকে ওই রোদের তাপে তেতে-ওঠা বালিতে রেখে শুঁটকি করে চালান দেয়। কাকাকে ফাঁকি দিয়ে মহেশ মান্না এবার এখানের জমিজারাত দখলই করে নিজে গেড়ে বসেছে, এই বয়সেই সে চালু হয়ে উঠছে।

ঘনশ্যাম এর মধ্যে বসন্ত পণ্ডিতের পাঠশালার পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছে।

দুরন্ত ছেলেটা এই গাং-এর বুকে এর মধ্যেই ডিঙি নিয়ে পাড়ি দেয়, আর দলবলও জুটে গেছে তার। জেলেপাড়ার নিশাকর সর্দারের ভাইপো রতন-যতীন—তার সঙ্গী। ওদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হৈ-চৈ করে।

বসন্ত পণ্ডিতের মেয়ে কমলা সেদিন ঝাউবনের পাশ দিয়ে আসছে মন্দিরের দিক থেকে পুজা দিয়ে। ছোট্ট মেয়েটা যেতে চায়নি, তার মা বাসিনীই জোর করে তাকে পাঠিয়েছে, নোতুন গরুটা বিইয়েছে, প্রথম গরুর দুধ—প্রথম গাছের ফল ওরা কপিলমুনির মন্দির-মা গঙ্গার মন্দিরে নিবেদন করে তবে নিজেরা খায়।

বাসিনী মেয়েকে বলে—এমনিতে তো সারাদিন টো টো করে ঘুরছিস, একবার মন্দিরে যাবি আর আসবি। আমার পুজোর শাড়ি পরে যা কমলা।

শাড়িটাকে কমলা ঠিক সামলাতে পারে না। সবে শাড়ি ধরেছে।

ওই শাড়িপরার লোভে মেয়েটা মন্দিরে গেছে। পুরোহিত অযোধ্যানাথ-এর দাড়ি গোঁফ ঢাকা মুখখানাকে এড়িয়ে চলে বসতির ছোট ছেলেমেয়েরা। অনেকে বলে ও নাকি ছেলেধরা।

কমলা ভয়ে ভয়ে কোনরকমে গিয়ে মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরছে। অযোধ্যানাথ বলে—একলা যেতে পারবি মায়ি!

কমলা ঝাঁকড়া চুল নেড়ে বলে—হ্যাঁ।

বালিয়াড়ির গা ঘেঁসে কিছু ঝারি জঙ্গল। খালের ওপারে এখনও সুন্দরবনের কিছুটা আভাস রয়েছে এই দ্বীপে। তার এদিকে ঝাউবন, জেলেদের ডিঙিগুলো দেখা যায় নীল গাং-এ। গাং চিল উড়ছে, দূরে তাদের বসতির ঘর বাড়ি।

কমলা একটা শশা চিবুতে চিবুতে আসছে। ঝাউবনে সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়া সুর তোলে। হঠাৎ কার চীৎকারে চমকে ওঠে কমলা।

ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা।

ফোঁস—স্—স!

বিকট আওয়াজ ওঠে। ওদিক থেকে তেড়ে আসছে একটা মস্ত কুমীর। কুমীরটা নির্জন বালিয়াড়িতে উঠে রোদ পোয়াচ্ছিল। লোকজন এদিকে কেউ আসে না। হঠাৎ ছোট মেয়েটাকে আনমনে এদিকে আসতে দেখে কুমীরটার গোল গোল হিংস্র চোখ দুটোয় কি বুভুক্ষা জাগে। বিরাট কুমীরটা গুঁড়ি মেরে বিশাল একটা টিকটিকির মত এগিয়ে আসছে বালির উপর দিয়ে নিথর ভঙ্গীতে।

ঘনশ্যাম এর মধ্যে ডিঙি নিয়ে পালাতে শিখেছে গাং-এ। নিশাকর সর্দার, রতনরা বলে—সমুদ্রে যেওনা ছোটবাবু।

দামাল ছেলেটা এর মধ্যে ওই সমুদ্র, খাড়িগুলোকে ভালোবেসে ফেলেছে। ও চেনে কোন ঢেউটা ফাটবে—তার মাথায় নৌকা নিয়ে উঠে হালের মোচড়ে নৌকার শিরানী ঘুরিয়ে ঢেউটাকে এড়িয়ে যায়। ওর চোখে গাং-এর মেজাজ ধরা পড়ে সহজেই। ঢেউ-এর শব্দ শোনে কান পেতে।

রতন বলে—ইযে জেলেদের চেয়ে ভালো না বাও গো বাবু।

ঘনশ্যাম বলে—বড় হলে লঞ্চ চালাবো দেখিস।

এর মধ্যে ছেলেটা দেখেছে সরকারী লঞ্চগুলোকে। কেমন ঢেউ ফাটিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে। ওর স্বপ্ন লঞ্চ চালাবে। এই গাং খাড়িকে দেখবে। ওই সমুদ্র—খাড়ির বিস্তার, দূর দিকচক্রবালে হারানো অসীম জলরাশি—ওই ঝড়ো হাওয়ার সুরে যেন তাকে ডাকে।

ঘনশ্যাম মাছমারা নৌকার সঙ্গে সেদিন চলে গেছল। দু'তিনদিন পর ফিরতে ভুবন গর্জায়—খুন করবো তোকে। বাঁদর কোথাকার।

দু'একটা চড় চাপড়ও পড়ে পিঠে। গিরিবালা টেনে নেয়।

—সত্যিই মেরে ফেলবে নাকি ওটাকে দাদা।

গর্জায় ভুবন—এর মধ্যে নায়েক হয়ে উঠেছে। গুণ্ডামী-বদমাইসীর সীমা

নাই ছেলের। বড় ইস্কুলে পড়তে যায় বলে কোথায় যায় জানো?

ঘনশ্যামের কাছে এই দ্বীপের মানুষগুলো আপনজন। সেবার বসতিতে আগুন লাগতে ছেলেটাও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ভাঙা ঘরের চালায় ঢুকে একটা বুড়িকে তুলে এনেছিল, সেই পোড়ার দাগ রয়েছে পিঠে।

কাঞ্চনবালা কেঁদেকেটে সারা।

ঘনশ্যাম বলে—কিছু হবে না মা। ভালো হয়ে যাবে।

গিরিবালা বলে—মরবি কোনদিন অপঘাতে।

হাসে ঘনশ্যাম—এত সোজা নয় গো পিসী। ঘনশ্যাম এই গাং, এই বাদাবনকে ডরায় না। গাং আমাকে নেবে না—ফিরিয়ে দেবে।

কথাটা মনে পড়ে গিরিবালার। অতীতের কথাটা। তুফানের রাতে নৌকা ডুবিতে ছেলেটা মরেনি। অবশ্য একথা ওকে কেউ বলে না। ঘনশ্যামও জানে না।

কাঞ্চন বলে—বালাই ষাট। ওসব কথা বলিস না বাবা।

তবু গাং যেন ওকে ডাকে।

আজও বের হয়েছে ঘনশ্যাম ডিঙি নিয়ে। মোহানায় সাগরজাল ফেলেছে ওরা, দেখতে যাচ্ছে। সাগরজালে মাছ-এর ছটফটানি দেখতে ভালো লাগে তার। হঠাৎ ঝাউবনের ওপাশে বালিয়াড়ির দিকে চেয়ে চমকে ওঠে ঘনশ্যাম। এদৃশ্য দেখবে ভাবেনি সে। জলের ধার থেকে কুমীরটা চলেছে নিশ্চুপভাবে কমলাকে লক্ষ্য করে। পিঠে শেওলার দাগ। ওই কুমীরটাকে চেনে ঘনশ্যাম। মাঝে মাঝে দ্বীপের মধ্যে বনের নিচেকার গভীর খালে দেখেছে ওটাকে। কোথায় ডিম পাড়ে, তারই সন্ধানে সে আর রতন খালের ধারে গাছাল দিয়ে থেকেছে। ভোরের কুয়াশা সরে সরে যায় গাং-এর বুক থেকে, তারাগুলো ডুবে যায়, দিনের আলোয় গাং ভরে ওঠে সোনালী আভায়।

দেখেছে ঘনশ্যাম কুমীরটার আস্তানা। কিন্তু কুমীরটাকে দেখতে পায় নি।

রতন বলে—শীতের শেষমুখে ডিম পাড়বে। বাচ্চা ফুটে বের হবার সময় মা কুমীরটা না থাকলে দুটো বাচ্চা ঠিক ধরে নে যাবো। শালা যাবে কতি? একদিন মজা দেখাবোই ওটাকে।

ওরা তক্কে তক্কে আছে। আর সেই বিরাট কুমীরটা আজ কমলার পিছু নিয়েছে। জানে ঘনশ্যাম মহাধূর্ত ওরা, জলের কাছে এলে ল্যাজের এক ঝাপটায় মেয়েটাকে ছিটকে শূন্যে তুলে মুখ হাঁ করে সেই হাঁয়ের মধ্যে ওকে ধরে নিয়ে তলিয়ে যাবে।

—কমলা। ঘনশ্যাম মতলব ঠিক করে নিয়ে ডিঙিটা ধারের দিকে আনছে। হাতে তুলে নিয়েছে কাঠের দুটো ডাঁশা। ওই দিয়েই ঠেকাতে হবে কুমীরটাকে।

কমলা চাইতেই দেখে পিছনে বালিয়াড়ির উপর বিরাট কুমীরটা, সেও মরীয়া হয়ে গর্জে ওঠে—ফোঁস—স্—স্। বালিতে কাঁটা কাঁটা ল্যাজটা ঝাপটাচ্ছে—বালি উড়ছে। এবার এগিয়ে এসে একটু ঘুরে গিয়েই ল্যাজ ঝাপটাবে। প্রচণ্ড শক্তি ওর ল্যাজে। এক ঝাপটে হাড়গোড় ভেঙে শূন্যে তুলে দেবে শিকারকে। হা করে তেড়ে আসছে কুৎসিত বীভৎস ওই জীবটা।

বিরাট হাঁ, ধারাল দাঁতগুলো ঝকঝক করে।

কমলা সামনে দেখেছে নিশ্চিত মৃত্যুকে। হঠাৎ একটা গরাণ কাঠের টুকরো তীরবেগে গিয়ে কুমীরটার মুখেই ঢুকে গেছে আর কুমীরটা শিকার কিছু পেয়েছে ভেবেই উন্মাদ রাগে অন্ধ হয়ে হাঁ-মুখ বন্ধ করেছে। কুমীরের লম্বা চোয়াল বন্ধ হলে সহজে খোলে না। 'লক জ' হয়ে আটকে যায়। কাঠ-এর টুকরোটা সমেত হাঁ-মুখ 'লক জ' হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে।

এই ফাঁকে ঘনশ্যাম কমলাকে টেনে এনে ডিঙিতে তুলে ঢেউ-এর মাথায় ঝটকা মেরে ওটাকে ভাসিয়ে দেয়। ডিঙিটা ঢেউ-এর টানে বেশ কিছুটা দূরে সরে গেছে।

বালিয়াড়িতে ব্যর্থ আক্রোশে কুমীরটা ল্যাজ ঝাপটাচ্ছে—ধুলো বালি উড়ছে, চষা ক্ষেতে পরিণত করেছে ঠাঁইটাকে। শেষকালে কাঠসমেত মুখ বন্ধ অবস্থায় গড়িয়ে এসে জলে পড়লো কুমীরটা।

ঘনশ্যামের নৌকাটা তখন বেশ দূরে।

কমলা ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কাঁদছে সে নৌকার পাটাতনে বসে।

ঘনশ্যাম গর্জায়—শালা। তোর দফা এবার শেষ করবো। কাঁদিস না কমলা। আর ভয় নাই। ওরা নৌকায় এসে হানা দেয় না।

মেয়েটা দেখছে ঘনশ্যামকে।

কৈশোর ছাড়িয়ে সবে যৌবনে পড়ছে, বলিষ্ঠ পেটা সুঠাম দেহ, দুচোখে ওর স্থির চাহনি। ভয় ডর নেই। নিপুণ হাতে ঢেউগুলো কাটিয়ে চলেছে বসতির দিকে।

শুধোয় ঘনশ্যাম—কোথা গেছলি?

কমলা বলে—মন্দিরে পূজা দিয়ে মাঠের দিকে না ফিরে এইদিকে আসতি-ছিলাম।

দেখছে ঘনশ্যাম কমলাকে। ভয়ে কাঁপছে মেয়েটি। কালো চোখের তারায় ভয়ের ছায়া। ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছে সে।

কমলার সত্যজাগর কুমারীমনে কি বিচিত্র একটি সুর ওঠে। ঝাউবন কাঁপছে। সামনে নীল সমুদ্র। ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে—সাদা ফুল যেন কে ছিটিয়ে চলেছে।

—কমলা।

কমলা চাইল ওর দিকে।

বলে ঘনশ্যাম—ভয় করছে তোর?

বলিষ্ঠ ওই ছেলেটির সান্নিধ্যে এলে কমলা যেন একটা সাহস পায়। ডাগর কালো চোখ মেলে দেখছে সে ঘনশ্যামকে। ডাগর চোখের উপর কেবল চুলগুলো এসে পড়েছে। ওর কথায় জবাব দিল না।

হাসে ঘনশ্যাম—ভয় কিরে। দেখবি ওই কুমীরটাকেই এবার শেষ করবো।

—পারবে তুমি ওটাকে মারতে।

খুশি হয় কমলা, তবু ভয় হয় ঘনশ্যামের জন্যে। বিরাট কুমীরটা মাঝে মাঝে গোরু বাছুর ধরে, সেবার একটা মানুষকেও মেরেছে।

বলে কমলা—ওটা সাংঘাতিক। অনেক মানুষ মেরেছে। সবাই ভয় করে উটাকে। আজ আমাকেও শেষ করতো উটা।

হাসে ঘনশ্যাম—তাইতো ওই আপদকে মারতে হবে!

খেয়াল হয় কমলার। মা ভাববে দেরী হয়ে গেছে। বলে কমলা—দেরী হয়ে গেল। বাড়ি ফিরবে না?

হাসে ঘনশ্যাম—কেন রে?

—মা ভাববে।

ভাবনার কথাই। মেয়ে এখনও ফেরেনি। বাসিনী ভাবছে, বসন্ত পণ্ডিত পাঠশালা সেরে বাড়ি ফিরেছে, খবরটা পেয়ে সেও ভাবনায় পড়ে।

—তাই তো!

বেলা হয়ে গেছে। দু' চারজন এসে পড়ে।

এই দ্বীপে বিপদ আপদ অনেক। গাং কুমীর কামট তো আছেই। বনেও আধবাঘা, বনশূয়োর-সাপ আছে। মাঝে মাঝে বড় বাঘও আসে। কে জানে কোন বিপদ হ'ল কিনা!

পারঘাটে, গঞ্জেও কোথাও নেই মেয়েটা।

বাসিনী বলে—মাইতি কর্তার বাড়িতে ও যায়, গিরিদিদির ওখানে।

বসন্ত সেখানে খবর নিতে এসে দেখা পায় না।

গিরিবালাও অবাক হয়—তাহলে গেল কোথায়? একবার মন্দিরে কাকে খুঁজতে পাঠাই।

এমন সময় দেখা যায় গাং-এর দিক থেকে ডিঙিটা আসছে। তীরে এসে ভিড়তে ঘনশ্যাম আর কমলা দেখতে পায় ওই ছোটখাটো ভিড়টাকে।

বাসিনী এগিয়ে আসে—কোথায় ছিলি মুখপুড়ি!

মারধোর শুরু হয়েছে।

এমন সময় খবরটা ফাঁস করে দেয় একটা রাখাল মটরা। সে গোরু চরাচ্ছিল ঝাউবনে। ব্যাপারটা দেখেছে সে। ঘনশ্যাম ভাবেনি কমলাকে মারবে ওরা।

সে ওকে বাঁচাতে চায়। কী বলার চেষ্টা করে।

গোরু নিয়ে মটরা ফিরছিল। সে বলে ওঠে—সাংঘাতিক কাণ্ডটা হয়েলো ঠাকরেণ। আজ ফিরি পেতি হতো না মেয়েটাকে। ওই বুড়ো শয়তান পিছু নে ছিল—ইয়া দাঁত মুখ তুলে ধরতি যাবে, ছুটবাবু ডিঙি থে না নামি আসি কুমীরের মুখে ডাঁশা ছুঁড়ি মারলো। ব্যাটারতো মুখ বন্‌ধো, ল্যাজের ঝাপটে বালিয়াড়ি চষে কাঠ মুখে শালা গাং-এ পড়ি গেল, নালি মেয়েকে আর পেতি না! কত্তাটা শুনি তারপর মারবা দিদিকে।

চমকে ওঠে সকলে।

বাসিনীর মার থেমে গেছে। অবাক হয় সে—তাই নাকি রে?

আপশোষ হয় তার। এতবড় বিপদের হাত থেকে বেঁচে-আসা মেয়েটাকে মারধোর করেছে। বলে সে—বলবি তো!

ঘনশ্যাম বলে—বলতি সময় দিলা মাসী! ধরেই তো উপর্যুপরি মার লাগালা। দেখি গে, একজন তো মার খেয়ে মরলো—বাবা আমাকে কি করে!

বাসিনী আজ ঘনশ্যামের প্রতি কৃতজ্ঞ। বলে সে—না, বাবা। আমি গে মাইতি কত্তাকে বলবো।

হাসে ঘনশ্যাম। বলে—আর ওসব বলো না মাসী। বাড়িতে মার খাওয়া আমার অবোস আছে। ওতে পিঠ শক্ত হয় গো।

কুমীরের খবরটা গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে।

গিরিবালা বলে—এমন করে গাং-বনে ঘুরিস নি বাবা। মন দে পড়াশোনা কর খন।

ঘনশ্যাম বলে—পড়া তো করি গো পিসী। তা একটুন গেলাম ডিঙি নে।

কাঞ্চনবালা বলে—বড্ড ভয় করে বাবা। ওসব করিস না। বড় ইস্কুলে পাশ দিই কলেজে পড়তে যাবি শহরে। তোর বাবার কত সাধ।

ঘনশ্যামও তা জানে। বাবার মুখেও শুনেছে কথাটা।

কিন্তু ওই শহর তার মোটেই ভালো লাগে না। দু-একবার কলকাতায় গেছে সে বাবার সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবার থেকে টানা বাসে। বেশ ভালোই লাগে, মাঠ-ধানক্ষেত গ্রাম গঞ্জ পার হয়ে ছুটছে বাসটা, টং টং করে ঘন্টা বাজছে তাদের এদিকে কাকদ্বীপের লঞ্চের মত। বাস থামছে—লোকজন নামছে উঠছে।

কিন্তু শহরে ঢুকে একটু অবাক হয়, কেবল বাড়ি আর লোকজন। তেমনি মানুষজনের ভিড়। বেহালার ওদিক থেকেই দেখেছে ছোট রেলগাড়ির মত দু কামরার ট্রাম গাড়ি দৌড়চ্ছে, ঝুলছে হাতল ধরে লোকজন। বাসগুলো দৌড়চ্ছে, বাস-ট্রাম-রিক্সার ভিড় পথে।

আর এসপ্লানেডে পৌঁছে যেন দিশাহারা হয়ে যায় ছেলেটা। এখানের বাড়িগুলো আকাশ ছুঁয়েছে—সারবন্দী বিরাট বাড়ি।

ভুবন আর সে বাস থেকে নেমেছে।

পাশ দিয়ে একটা বাস বিকট শব্দ তুলে বের হয়ে গেল। লাফ দিয়ে ওঠে ঘনশ্যাম। ওদিক থেকে তেড়ে আসছে আরও কয়েকটা বাস।

ভুবন বলে—চল, রাস্তা পার হতে হবে।

এর চেয়ে ঘনশ্যাম সাঁতরে গাং পাড়ি দিতে পারে সহজে। বাস-ট্রাম ছোট গাড়ির বিকট হর্ন-এর মাঝে ছেলেটা ভয়ে শুকিয়ে গেছে।

বলে সে—বাড়ি কখন যাবো বাবা?

হাসে ভুবন—কেনে রে শহর দেখতে আসবো বলি? চল আর একটু ঘুরে ফিরে কাজ সেরে, কেনাকাটা করি, তবে তো বাড়ি যাবো।

শহরের সখ তার ঘুচে গেছে।

ভয়ে ভয়ে দেখছে চারদিক।

এরপর একবার এসেছিল সরকার মশায়ের সঙ্গে কলকাতায় সেবারের অভিজ্ঞতা আরও বিচিত্র। বেশ কিছু টাকা কড়ি এনেছিল। সরকারমশাই ফতুয়ার পকেটে করে, ওদের নৌকার জন্য মালপত্র কিনতে হবে। আর পারঘাটের ইজারার টাকা জমা দিতে হবে।

কিন্তু চমকে ওঠে সরকার।

ছেলেটাও। ফতুয়ার পকেট একেবারে ফাঁক—কোন টাকা আর নেই।

ঘনশ্যাম অবাক হয়—কি করে চুরি করলো কাকা?

সরকারের হাত পা কাঁপছে। বলে সে—পকেট কেটে নিয়েছে কখন।

শহরের পকেট-কাটাদের জন্যই সেবার ওদের কেনাকাটা কিছু হয়নি। ঘনশ্যামের রঙীন জামা-প্যান্টও জোটেনি। শুধু তাই-ই নয়, খেতেও জোটেনি সারাদিন। খিদের জ্বালায় সারা শহরটাকে যেন বিষ লেগেছিল ঘনশ্যামের। মনে হয়েছিল এখানে সবাই চোর, ওঁৎ পেতে আছে সবকিছু চুরি করে নেবার জন্যই।

তাই মায়ের মুখে শহরে পড়তে যাবার নাম শুনে খুব খুশী হয়নি ঘনশ্যাম। তাদের এই গাং-ঝাউবন-রোদভরা বালিচর-কপিলমুনির মন্দিরই ভালো। এখানের গঞ্জের মানুষগুলো, জেলেপাড়ার নিশাকর সর্দার, যতীন ওরা অনেক ভালো। রতন মালোর মেয়ে কদমের কথা মনে পড়ে।

কদমই খবরটা আনে সেদিন।

ঘনশ্যাম ক'দিন ধরে তক্কে তক্কে ছিল সেই কুমীরটাকে দেখার পর থেকেই।

তাদের ছোট্ট ডিঙ্গি একটা নিয়ে বের হয়ে খালের মুখে এসে ডাইনের খালে ঢোকে। সঙ্গী বলতে মটরা আর তিনকড়ি। ওদের পারঘাটায় ছেলে দুটো থাকে, মাঝি কমতি হলে দাঁড়ে বসে যায়, না হলে যাত্রীদের মালপত্র বয়ে কিছু রোজগার করে। কখনও নিশাকরদের সঙ্গে জালে চলে যায় মাছ ধরতে।

ঘনশ্যামের বাধ্য তারা। ঘনশ্যাম ওদের নিয়েই খালে এসে নজর রাখে, কুমীরটাকে আরও দু' একবার দেখেছে। চতুর কুমীরটা দূরে খালের ওদিক থেকে ভাসা কাঠের টুকরোর মত মাথাটুকু জাগিয়ে পিঠ পিঠ করে চেয়ে দেখে এদের।

গোরু ফেলে মটরা এসেছে। সে বলে—হুই গো শালা ডুবন দিছে—ছুটবাবু! সেদিন একটা গোরুকেই টেনে নিয়ে গেল। মহেশ মান্নার দুধেল গোরু।

মহেশ মান্না ইদানীং গঞ্জের বাজারে আড়ত করে আবাদের ধান-চাল-ডাল-মরসুমের তরমুজ সব কিনে চালান দিচ্ছে, আর সাগর মেলার ঠিকেদারী করে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।

তিনকড়ি বলে—ঐশালা যেমন লোককে ঠকায় তেমনি ওর গোরু নে গেছে কুমীর। বেশ হইছে গ!

মটরা বলে—তা নিল, কিন্তু গুপীর মাটোকে কেন নিল নিবার? ঐ

শালা কুমীরটোকে সিবারও কেউ মারতে পারলেক নাই।

মহেশ মান্নার বন্দুক আছে।

লোকজনও আছে তার। ওর সখের গোরুটাকে কুমীরে ধরতে মহেশ মান্নাও ত্বতিনদিন জাল ফেলে খাল আটকেও কুমীরটার খোঁজ পেল না। দিনভোর ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে কদিন। কুমীরের কোন পাত্তা নেই।

এদিকের গ্রাম-বসতের মানুষ বলে,—শয়তান উটা, কুথায় গেছে আবার কার ক্ষেতি করতে কে জানে?

মটরাই খবরটা আনে। ছোটবাবুর খুব বাধ্য সে। তার জন্যই ক'দিন সে বনে গাছাল দিয়ে বসে থেকে দেখেছে কুমীরটা রোজ একটা সময়ে উঠে আসে বনের একটা মরা খাড়ির ধারে; লম্বা দেহটাকে টেনে টেনে চলে—গাছের ফাঁক দিয়ে তখন রোদ এসে পড়েছে মাটিতে। ভিজে পলিকাদার বুকে মন্থর গতিতে এগিয়ে আসে জানোয়ারটা।

সব শুনে ঘনশ্যামও ভাবছে কথাটা।

মটরা বলে—শ্যালা কে ইবার জাম্পেশ করে গাঁথতে হবে গো।

ঘনশ্যাম বলে—জেলেপাড়ায় পাঁঠা কেটেছে আজ, নাড়িভুঁড়ি ঘেলু সব নিয়ে আয়, আর এবার ব্যবস্থা করছি ব্যাটার। কাউকে বলবি না।

মটরা, তিনকড়ি আর ঘনশ্যাম।

নাইলনের মজবুত রসির সঙ্গে ত্বতিনটে বিরাট হুকের মত ধারালো বঁড়শীতে ওই ঘিলু, নাড়িভুঁড়ি জড়িয়ে ফেলে রেখে ওই বনের গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে কুড়োল ল্যাজা নিয়ে ওরা গাছাল দিয়েছে।

ভোর হয়েছে। সমুদ্রের বুক থেকে জমাট কুয়াশার যবনিকা ফিকে ফিকে হয়ে আসছে, পুবদিকের আকাশটা আবীর-রাঙা হয়ে সূর্য উঠছে। সমুদ্রের বুকে সিন্দুরে আভায় প্লাবন জাগে। বনে গাংচিলগুলো কলরব করে, জোয়ারের গাং—বালিচর ডুবে গেছে, ত্ব একটা শামখোল, বিরাট বাটাম পাখি লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢেউ ভাঙ্গা তীরভূমিতে মাছের সন্ধান করছে।

বনের গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে সকালের সোনালী আলো এসে পড়েছে। গাছের নীচে অবধি জোয়ারের জল ঠেলে এসেছে, হঠাৎ দেখা যায় বিরাট ওই কুমীরটা মাথা তুলে তীরের দিকে এসে উঠেছে, গায়ে মাথায় যেন গোটা গোটা চামড়ার নাল বসানো, সবুজ শেওলা জমেছে তাতে, চোখদুটো কুত কুত করছে। ল্যাজটা এঁকে বেঁকে টেনে টেনে এসে হঠাৎ ওই ছড়ানো নাড়িভুঁড়িঘেলুর তালগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল। পচা পচা গন্ধ উঠছে।

গাছের উপর ঘনশ্যাম মটরা আর তিনকড়ি বসে আছে। ওদের চোখে

ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

কুমীরটা যে সত্যি এতবড় হবে তা ভাবেনি তারা।

এবার বুঝছে এতবড় জানোয়ারকে সামলানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এখন মানেমানে ওটা চলে যাক—তারাও নেমে বাড়ি ফিরে যাবে।

কিন্তু তার আর উপায় নেই।

কুমীরটা দুতিনটে বঁড়শীর সঙ্গে মাথানো ওই নাড়ি ভুঁড়িগুলোকে আস্ত গিলে ফেলেছে, আর তারপরই ধারালো হুকগুলো গলায়, একটা আরও গভীরে গিয়ে আটকে গেছে। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে কুমীরটা এবার খালে পড়তে যায়—কিন্তু মজবুত নাইলনের রসিগুলো খালের ধারে বড়ো কেওড়াগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা, তার যাবার উপায় নেই।

কুমীরটা এবার রুদ্র মূর্তিতে গর্জাচ্ছে—ফোঁস-স! ল্যাজের ঝাপটায় ছোট ছোট গেও গরাণ গাছগুলো মড় মড় করে ভাঙছে। কাদায় ল্যাজটার সাপটে গভীর গর্ত করে দেয়। তবু ওর মত্ততা থামে না।

ওদের গাছটাও কাঁপছে ল্যাজের সাপটে!

যেন ছিটকে পড়বে ওরা। চীৎকার করে মটরা—তিনে হুঁসিয়ার।

ওরা লাফ দিয়ে পড়েছে কুড়ুল নিয়ে।

নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে এবার সুযোগ খুঁজছে. ঘনশ্যাম একবার ওটার কাঁধের কাছে কুড়ুল চালিয়েছে—ছিটকে যায় কুড়ুলটা।

তিনে বলে—ওখানে হবে নাই। শালার নাকে মার মটরা।

কিন্তু কুমীরটা বিশাল হাঁ করে তেড়ে আসে, সরে যায় ওরা।

গঞ্জে কি করে খবরটা পৌঁছে যায় ইতিমধ্যে।

লোকজন মেয়েরাও এসে পড়ে। খালের মুখে জেলেডিঙি থেকে নিশাকর সর্দার—রতনরা এসেছে।

ছুটে এসেছে মহেশ মান্না বন্দুক হাতে। ওর সঙ্গে তার অনুচর গজেনও এসেছে। গর্জাচ্ছে মহেশ—সরে যা মটরা, আমি ওটাকে গুলি করে শেষ করে দিই।

বাধা দেয় ঘনশ্যাম—না। ওটাকে আমরা কায়দা করেছি, শেষ করবো আমরাই। তুমি গুলি করবে না মান্নামশাই।

চমকে ওঠে কমলা। ভীত আর্ত চাহনি মেলে সে ওই যুদ্ধ দেখছে।

জেলেপাড়ার কদমও এসে জুটেছে। বলে সে—হেঁই দিদি, কত বড় জানোয়ারটা গ! আস্ত একটা মানুষকে গিলে ফেলালে সেবার। নির্ঘাৎ দানো আছে উ! সন্ঝে বেলায় ও ব্যাটাই ঝামটাই ফেরে।

বন্দী হয়ে গর্জাচ্ছে কুমীরটা। প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু ছাড়াতে পারেনি। এবার ক্রমশঃ ওর তেজ কমে আসছে, আর্তনাদ করছে যেন ওটা, ছোটখাটো ডিঙির মত দেহটা টানতে কষ্ট হচ্ছে, কষ দিয়ে রক্ত লালা ঝরছে। মাঝে মাঝে এবার চিত্তেন দিচ্ছে রসির টানে! সেই অবকাশে লাফ দিয়ে এসে তিনে মটরা ঘনশ্যাম ওকে ঘায়েল করার জন্য কুড়ুলের চোট মারছে।

পায়ের একটা দিক রক্তাক্ত হয়ে ঝুলছে, ভয় হয় কমলার। কিন্তু কিছু করার নেই।

হঠাৎ কুমীরটা ঝাপ্টা মারতে গিয়েছে—সেই ফাঁকে তিনে একটা বাঁশের লগি দিয়ে ঠেলে দিতেই কুমীরটা চিৎ হয়ে যায় কিছুটা, সেই মুহূর্তে ঘনশ্যামও কুড়ুল দিয়ে একটা কোপ মেরেছে, বুকের নীচে সাদা মাংসল জায়গাটা কুড়ুলের ঘায়ে ফাঁক হয়ে যায়—বের হয়ে আসে তাজা রক্ত। লাল হয়ে যায় বালুচর।

ছটফট করছে কুমীরটা।

এবার ওরাই তিনজনে শেষ করেছে কুমীরটাকে, স্থির হয়ে আসে বিশাল কুমীরটা।

ভুবন মাইতিও এসে পড়ে। ব্যাপারটা দেখে চমকে ওঠে সে—ইকি করেছিস হতভাগা!

হাঁপাচ্ছে ঘনশ্যাম। গঞ্জের গ্রামসেবক নীতিনবাবু কোথা থেকে একটা ক্যামেরা এনে বলে—দাঁড়াও ঘনশ্যাম, একটা ছবি তুলে নিই। এস ডি-ও অপিসে জানাতে হবে। দারুণ কাজ করেছো একটা!

ফটো তোলা হয়।

নিশাকর সর্দার, বসন্ত পণ্ডিত এসেছে, নরহরি ভটচাযও। কুমীরটা তাকেও একদিন তাড়া করেছিল। কোনরকমে বেঁচেছিল সেদিন নরহরি। আজ সেই রাগটা ফেটে পড়ে। বলে সে—বেশ করেছিস বাবা ঘনা। উঃ একটা দানবকে মেরেছিস রে। এ্যাঁ—

মরা কুমীরটাকে ডিঙ্গিতে তুলে ওরা ঢোল সানাই বাজিয়ে হৈ চৈ করে চলেছে, সকলেই স্বীকার করে একবাক্যে—হ্যাঁ, ঘনশ্যাম মেরেছে বটে একখানা কুমীর। শালা মানুষখেকোটাকে কেউ মারতে পারেনি এতদিন। ও মেরেছে হে।

মহেশ মান্না চুপ করে দেখছে ওই বিজয় উৎসব।

কে কলকে ফুলের মালা পরিয়েছে ঘনাকে। নাচছে জেলে পাড়ার লোকজন বসন্ত পণ্ডিতের মেয়েটাও এসে জুটেছে।

জেলেপাড়ার কদম মহেশ মান্নাকে বন্দুক হাতে দেখে বলে—উটা কেনে এনেছিলা গো, এ্যাঁ—বাপ মারেনি টিকটিকি তার ব্যাটা গুলন্দাজ! তা বন্দুক দাগতে পারো গো বাবু?

কদমের কথাবার্তাই অমনি।

মনে যৌবনের ঢল নামা দেহে মাতন তুলে বলে কদম—দেখো আবার গুলিয়ে মানুষ মেরোনা গ। যা লুক তুমি।

মহেশ মান্না দেখছে মেয়েটাকে। গজেন মহেশের ওখানে কাজ নিয়েছে। এতকাল চোলাই মদের কারবার করতো, এখন ওর আড়তে কাজ করে। নিজের গুরুত্ব দেখাবার জন্য ধমকে ওঠে গজেন—এ্যাই। থাম দিকি ছুঁড়ি।

হাসছে কদম।

গজেনের চোখে সে দেখেছে বিচিত্র একটা চাহনি। যেন কুমীরের মত হিংস্র লাল চোখ মেলে দেখছে সে তাকে।

কদম বলে—এত রাগছিস কেনে খামোকাই।

মহেশ মান্না ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য বলে—এ্যাই। চল গজেন।

ব্যাপারটা আদৌ ভালো লাগেনি মহেশের। এতকাল এই দ্বীপে এসে অবধি নিজের বুদ্ধিতে আর কৌশলে আজ বেশ দু' পয়সার মুখ দেখেছে সে এই বয়সেই। আর সে জানে এই দ্বীপের সব কিছুতেই তার প্রাধান্য আসবে। এর মধ্যে ভুবন মাইতির মেলার ঠিকাদারী বরবাদ করে এনেছে, এখন মেলার বড় বড় কিছু কাজ সেই-ই করে থাকে। বাঁধ-ভেড়ির কাজগুলোও পায় সে, এর মধ্যে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের কর্তাদেরও নানাভাবে হাত করে ওই কাজ পাচ্ছে।

তাছাড়া মহেশ এখানের চাষীদের দাদন দিতে শুরু করেছে, যাতে তাদের জমির সব ফসলই সে নিজের গুদামে তুলতে পারে। বর্ষার মুখে তিনগুণ চড়াদামে আবার তাদেরই বিক্রী করে। আর দাদনের টাকা পুরো উশুল করতে পারে না অনেক চাষী, তাদের জমি জারাত ধরেই এবার টানবে মহেশ মান্না।

সবদিক থেকে সেই-ই হবে দ্বীপের প্রধান।

কিন্তু আজ হঠাৎ ওই ছেলেটাকে দেখে একটু চিন্তায় পড়েছে মহেশ মান্না। দেখেছে ওর বুদ্ধি আর সাহস। ওই কুমীরটার পেছনে মহেশ মান্নাও বেশ কিছুদিন ঘুরেছে, তার দামী গাই গোরুটাকে মেরেছিল, তবুও কিছু করতে পারেনি। সকলেই জানে সেটা। আর সেই কুমীরটাকে কিনা স্রেফ রসি দিয়ে বেঁধে কুড়ুলের ঘায়েই মেরে ফেললো ঘনশ্যাম!

এটা মহেশ মান্নারই অপমান।

গুম হয়ে বাড়িতে ফিরেছে মহেশ মান্না।

বিকাল নামছে, তখনও গঞ্জের জেলেপাড়ায় ঢোল বাজার শব্দ ওঠে! ওই ঢোলের শব্দটা স্তব্ধ দিগন্তের বুকে ঢেউ-এর মাথায় মাথায় ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘনশ্যামের জয়ধ্বনি।

কমলা খবরটা নিয়ে দৌড়ে এসেছে গঞ্জে। তার মা বাসিনী পাঠশালের চালাটা নিকোচ্ছিল। কমলা ঝড়ের বেগে ঢুকে বলে—ঘনাদা ইয়া কুমীর, যেটা আমাকে তেড়ে এসেছিল সেটাকে মেরেছে মা। গঞ্জের সব্বাই গেছে।

কুমীর মারার খবর শুনে বাসিনী শুধোয়—কি করে মারলো রে এতবড় কুমীর?

কমলার দাঁড়াবার সময় নেই। এত কথার জবাব দেবার সময় তার নেই।

ময়লা শাড়িটা গাছকোমর করে জড়িয়ে নিয়ে একরাশ রুক্ষ চুলের কেশর নাড়িয়ে দৌড়লো মেয়ে।

—কাকীমাদের খপর দিই আসি, এসে বলবো! যাও কেনে সবাই দেখতে গেছে।

ছুটলো আবার কমলা।

কাঞ্চনবালার শরীর ভালো যাচ্ছে না। ক'দিন থেকেই শয্যাগত।

দ্বীপের একমাত্র ডাক্তার বলতে রমণ। কোনকালে এসেছিল মেদিনীপুর থেকে খেয়া পার হয়ে, সেখানে তার রুগীপত্তর তত হয় না। তাই এখানে এসে বসেছিল।

কণ্টাই-এর হলধর মাইতি ডাক্তারের কাছে কমপাউণ্ডারি করেছিল বছর কয়েক—তার থেকে চিকিৎসা জগতে সম্যক জ্ঞানলাভ করে রমণ এখানে এসে বসেছে গঞ্জে।

মোটা গোলগাল চেহারা, আর ওর চালাঘরের বারান্দায় টিনের চেয়ার দখল করে নরহরি ভটচায, বসন্ত পণ্ডিত, মহেশ মান্নার মাতাল কাকা, মুকুন্দ মাইতিরা আড্ডা জমায়। নরহরি ভটচায খ্যানখেনে গলা তুলে বলে—রমণের মত ডাক্তার এ তল্লাটে নাই! আমার অম্লশূল—ডায়মণ্ডহারবারের বড় ডাক্তার ভালো করতে পারলে নাই, রমণ দিল দু' পুরিয়া ওষুধ, ব্যস।

অবশ্য নরহরি ভটচায জলের মতই স্বভাবের। যখন যে পাত্রে রাখা হয় তখন সেইপাত্রের আকার ধারণ করতে পারে। সে এইরকম কথাই বলে থাকে।

রমণ ডাক্তার তবু এই দ্বীপে এখন নামী লোক।

সেই রমণ ডাক্তার কাঞ্চনবালাকে দেখে শুনে বলে—মাইতি মশায়, সদরের হাসপাতালে নে যান। ভালো করে চিকিৎসা করানোর দরকার।

কাঞ্চনবালা যেতে নারাজ। বলে—সদরের হাসপাতালে যাবো না। আপনিই ওষুধ দেন।

ভুবনের বোন গিরিবালা ঘরের কাজ করছে, বাড়ির সব দায়-দায়িত্বই পড়েছে তার উপর। ঘনশ্যাম সেই সকাল থেকে কোথায় গেছে তার পাত্তা নেই। ছেলেটার ঘাড়ে যেন দানো ভর করেছে। ওই গাং-এ কোথায় চলে যায় নৌকা নিয়ে না হয় মাঠে চাষীদের সঙ্গেই নিজে হাল ধরে। মেঘ ছাওয়া কালো আকাশের বুক ছেয়ে বৃষ্টি নামে, মাঠে সবুজ ধান তুলতে বসে যায় বীজ ধানের ক্ষেতে।

কাঞ্চনবালা বলে—ওই দস্যি ছেলেকে নে পারি না দিদি।

গিরিবালা বলে—ব্যাটা ছেলে। গেছে কোথায়—আসবে।

দুপুরেও ফেরেনি।

ভুবন মাইতি পারঘাট ছেড়ে খেতে এসে দেখে তখনও ফেরেনি ঘনশ্যাম।

কাঞ্চন বলে—ছেলেটাকে এইবার শাসন কর। লেখাপড়া না করে পারঘাটায় বসাও, জমি জারাত দেখুক। ওদিকে ঘেরের জমি না দেখলে তো মহেশ মান্না নিয়ে নেবে বলছিলে?

ভুবন মাইতি বলে—দেখছি এবার মনাকে কাজেই লাগাই। সেকেন ক্লাশ অবধি পড়েছে এতেই ঢের হবে!

কিন্তু গেল কোথায় ছেলেটা?

কাঞ্চন বলে—জেলেদের নৌকায় গেল কিনা খবর নাও। একেই গাং ওকে ডাকে। আবার তুমি বলছো লঞ্চ কিনে দেবে, মাছের ব্যবসা করবে।

ভাবনা হয় ভুবন মাইতির। এমনিতে বেপরোয়া ছেলেটা। শুধোয় সে—খালের ওদিকে যায়নি তো? ওখানে কুমীরটা যা উৎপাত করছে ওটার জন্য ভাবনা হয়।

চমকে ওঠে অসুস্থ কাঞ্চনবালা। বলে—কি বলছো গো? না বাপু

একবার খবর নাও। সোম্‌সারে ওই একটা পোকা রয়েছে। না-না। ওসব অলক্ষুণে কথা মুখে আনবা নি।

হঠাৎ কমলাকে ঝড়ের মত বেগে ঢুকতে দেখে চাইল ওরা। মেয়েটা ঘনশ্যামের সঙ্গেও ঘোরে। রোদে উত্তেজনায় ওর সুন্দর ফর্সা রংটা তামাটে হয়ে গেছে। একরাশ রুক্ষ চুল চোখে পড়েছে। মেয়েটা বলে ওঠে হাঁপাতে হাঁপাতে,—ঘনাদা কি করেছে জানো মাইতি কাকা?

ঘনশ্যাম অনেক কিছুই করে এসেছে এযাবৎ, যার জন্য বাবা ভুবন মাইতিকে বেশ ভাবনায় পড়তে হয়েছে। সেবার সাগর মেলার গাং-এ নৌকাডুবির সময় ঘনা আর তার দুটি চ্যালা ডুবে ডুবেও যাত্রীদের উদ্ধার করেছিল। গাং-এ ভেসে যেতো ঘনা। তবু সেই গাং সেবারেও তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

তাছাড়া কারোও কোন বিপদে হয়তো এগিয়ে গেছে, না হয় কোন জোত-দারের জমি দখলের কাজিয়ার চাষীদের হয়ে লড়তে গেছে কিনা কে জানে। সাগরদ্বীপে এখনও ভালো জমির পরিমাণ সামান্যই। বাকী সব নোনা বাদা। ফসল ফলে না। তাই হাসিল ধেনো জমি নিয়ে লড়াই এখানে স্বাভাবিক ঘটনা।

অনেক জমির মালিকের দখল এখানে সিদ্ধ নয়, ফলে অন্যজন যদি জোর করে দখল করে নিতে পারে সেই জমি তারই হয়ে যায়। তাই জমির লড়াই এখানে চলে। জোতদার-মহাজনরাই আক্রমণকারী, গরীব চাষী এখানে অসহায়।

সেবার ঘনশ্যাম প্রতাপপুরের কোন চাষীর হয়ে লড়ে গেছলো মহেশ মান্নার লোকদের বিরুদ্ধে।

ভুবন শুনে কোনরকমে সামলায় ব্যাপারটা।

তবু ঘনশ্যাম বলে—ওই মহেশ মান্না কেন দখল করবে গরীবের জমি। ও এতকাল চাষ করছে।

আজ আবার কি ঘটিয়েছে কে জানে।

কমলার কথায় চমকে ওঠে ভুবন মাইতি। কাঞ্চনবালা বলে—কি করেছে রে ঘনশ্যাম?

কমলা বলে—দ্যাখগে কাকা খালের সেই মানুষখেগো কুমীরটাকে বঁড়শি দে আটকে কুড়োল দিই কুপিয়ে শেষ করেছে। ইয়া ডিঙির মত কুমীরটা—জেলেপাড়ার ওরা বাছাড়ি নায়ে তুলি নে আসছে ঘাটে।

অবাক হয় গিরিবালা—অ মা! বলিস কি রে? ঘনা এতবড় কুমীর মেরেছে। ওই শয়তানটাকে! অ বৌ—

কাঞ্চন বলে—ওমনি অপঘাতে না শেষ হয় ওটা। দিদি ওটাকে ধরে আনো!

ভুবন মাইতি বিশ্বাস করতে পারে না। বলে সে—ধ্যাৎ!

কমলা বলে—এসো দেখে যাও নিজের চোখে।

সত্যি। বিরাট কুমীরটাকে ওরা ফালা ফালা করে এনেছে।

সারা দ্বীপের লোক জমেছে ঘাটে, ঝাউবনে। গিরিবালাও দেখতে গেছে।

ফিরে এসে বলে—সত্যি বউ। ঘনা ওই দানোকে মারলে কি করে রে। অমা—বাবা কুপিল মুনি, হেঁই মা গঙ্গা—বাছাকে আশীর্বাদ কর ঠাকুর। অ-বউ, একদিন পুজো দে আসতি হবে মন্দিরে।

ঘনশ্যাম সেদিনই শুনেছিল লড়তে পারলে শয়তানকেও কাবু করা যায়। কথাটা বলেছিলেন কপিল মুনির মন্দিরের পুরোহিত অযোধ্যাপ্রসাদ।

দ্বীপের শেষ প্রান্তে সমুদ্রের ধারে মন্দিরটা মাথা তুলেছে, তিন দিকে ওর অবাধ সমুদ্র, ঢেউ আছড়ে পড়ে। দ্বীপের এদিকে এখনও রয়ে গেছে কিছুটা বনভূমি। জনবসতি এতদূর অবধি এসে পৌছায় নি। ওপাশে একটা মিঠে জল ভর্তি বড় দীঘি। প্রবাদ আছে ওটা নাকি সগর রাজার ছেলেদের কাটানো দীঘি। সমুদ্রের এত কাছে এখানে তবু মিঠে জল মেলে, মেলার সময় ওই জলাশয় পানীয় জলের যোগান দেয় কয়েক লক্ষ মানুষকে।

এদিকে উঁচু খানিকটা জমির উপর মন্দির—এদিকে আযোধ্যাপ্রসাদ-এর থাকার ঘর। ওই নির্জন দ্বীপে অযোধ্যাপ্রসাদ একজন সেবককে নিয়ে থাকেন। অন্য সবাই চলে আসে গ্রামে বৈকালের আগেই।

অযোধ্যাপ্রসাদও দেখেছেন কুমীরটাকে। আজ ঘনশ্যাম এদিকের একটা আতঙ্ককে দূর করেছে। বলেন তিনি—জীতা রহো বেটা। কপিল মুনিভি তোকে আশীর্বাদ দেবে। অন্যায়—পাপ-এর সাথে লড়তে হবে। দেখবি ওরা অনেক কমজোরী। বাইরের গর্জন, বকোয়াসই ওদের সব।

ঘনশ্যাম দেখেছে বার বার মানুষের মধ্যেকার সেই লোভটাকে। দেখেছে জলের বুকে হাঙরের লোভ, নিরীহ মানুষদের মারে সেটা।

দেখেছে মহেশ মান্নাকেও। দিন দিন সে দ্বীপের অনেকের জমি গ্রাস করছে দেখেছে, তার বাবার পরাজয়টাও। ঘনশ্যাম-এর তরুণ মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

মায়ের জেদেই পড়া ছাড়তে পারেনি ঘনশ্যাম।

সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে এসেছে বড় গাং পার হয়ে কাকদ্বীপে। কয়েকদিন থাকতে হবে সেখানের বোর্ডিং-এ। মায়ের মুখখানা মনে পড়ে। কাঞ্চনবালার অসুখটা বেড়েছে।

আসার দিনও জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

ঘনশ্যাম বলে—তোমাকে ছেড়ে যাবো না মা।

কাঞ্চনবালা হাসে—পাগল ছেলের কথা শোনো। আমি ভালো হয়ে যাবো রে। মন দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আয় তুই। পাশ করবি ভালো ভাবে।

কাঞ্চনবালা অনেক স্বপ্ন দেখে ছেলেকে কেন্দ্র করে।

ঘনশ্যাম এসেছে পরীক্ষা দিতে।

বৈকালে হোস্টেল থেকে বের হয়ে গাং-এর দিকে যায়, দূরে দিগন্তে দেখা যায় তাদের দ্বীপটা একটা বিন্দুর মত। মাঝে বিরাট গাং।

দিন গোণে সে কবে বাড়ি ফিরবে, মা কেমন আছে কে জানে। পরীক্ষার শেষ দিন বৈকালেই লঞ্চে উঠেছে ঘনশ্যাম।

ঘাটে আসতে অবাক হয়, অঘোর কাকা এগিয়ে আসে—তোকে খবর দিতে গেছে জটাই। দেখা হয় নি?

ঘনশ্যাম বলে—আমি তো পরীক্ষা শেষ হতেই সটান চলে এসেছি। মা কেমন আছে কাকা?

অঘোর সরকার ওর দিকে চাইল। বলে সে—চলো বাড়িতে।

কেমন থমথমে মুখ ওর। সন্ধ্যা নেমেছে দ্বীপে। তারাগুলো ঝকঝক করে। বাতাসে ওঠে সমুদ্রের হাহাকার। বাড়িটা স্তব্ধ। ওই স্তব্ধতার মাঝে একটা কান্নার সুর ওঠে।

ভিতর বাড়িতে ঢুকে চমকে ওঠে ঘনশ্যাম। অনেকেই এসেছে।

গিরিবালা কান্নাভরা স্বরে বলে—এলি বাবা। ছাথ কি সব্বোনাশ হয়ে গেল রে। ঘরের লক্ষ্মী চলে গেল। ও না যেয়ে আমি কেন গেলাম নারে।

অসহ্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে গিরিবালা।

ভুবন মাইতি একপাশে পাথরের মূর্তির মত বসে আছে।

ঘনশ্যাম-এর পায়ের নিচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। অসহায় চীৎকার করে মায়ের প্রাণহীন দেহটার উপর আছড়ে পড়ে।

দামাল বেপরোয়া ছেলেটা বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আজ তার জীবনের পাতা থেকে একটা উজ্জ্বল অধ্যায় খসে গেল।

মৃত্যুকে-শোককে এর আগে অনুভব করেনি ঘনশ্যাম। সারা বাড়িটা শূন্য বোধ হয়, মনে হয়, আর যেন করার কিছুই তার নেই। বাড়ি থেকেও বের হয়নি সে।

—ঘনাদা। কমলার ডাকে চাইল ঘনশ্যাম!

কমলা এগিয়ে আসে। কয়েক বছরের মধ্যে মেয়েটার দেহে মনে এসেছে বিচিত্র পরিবর্তন। আগেকার সেই বেপরোয়া গেছো চঞ্চল মেয়ে এ নয়। আর দেখেছে সে জীবনকে।

বলে কমলা—চুপ করে বসে থাকলেই হবে। মায়ের অনেক কাজ বাকী।

চাইল ঘনশ্যাম। কমলা এগিয়ে আসে।

—ওঠো। কাল থেকে কিছু মুখে দাও নি চলো। স্নান করে কিছু খেতে হবে। পিসী ডাকছে।

—খিদে নাই রে।

কমলা তবু ছাড়বার পাত্রী নয়। ওকে এড়াতে পারে না ঘনশ্যাম।

ওর কাছে কি আশ্বাস যেন পায় সে।

ঝাউবনে বাতাসের সুর ওঠে, জোয়ার এসেছে সমুদ্রে। ঢেউগুলো এসে হানা দেয় তীরভূমিতে।

চেয়ে থাকে ঘনশ্যাম। জেলেপাড়ার নিশাকর সর্দার জাল ঘাড়ে করে চলেছে নৌকাগুলোর দিকে। জালে যাচ্ছে ওরা।

কমলা বলে—মা বলতো তুমি পাশ করবে। কলেজে পড়বে।

ভুবন মাইতিও তাই ভাবছিল!

তার জীবনে এই স্ত্রী বিয়োগ একটা বিপর্যয় এনেছে।

এমনি দিনে খবরটা আসে।

ধবলাটের ওদিকের নাবালে তার বেশ কিছু জমি ছিল। ওখানে চাষ আবাদও হতো ভালোই। হঠাৎ সেখানে বাকী খাজনার নোটিশ করেছে।

মহেশ মান্না এসব ব্যাপার এর মধ্যে রপ্ত করেছে। ওই লাটের জমিগুলোর উপর তার নজর ছিল অনেকদিনের। কিছু চাষীদের হাত করে আর তহশীলদারকে কিছু টাকা ঘুস দিয়ে বাকী করের নোটিশ চেপে সার্টিফিকেট করিয়েছে।

ভুবন মাইতির বাড়িতে তখন এই বিপদ চলেছে। ঘনশ্যামও জমি জায়গার কিছু খবর রাখে না। ঠিক এই সময় মহেশ মান্না এসে কিছু টাকা বেশী খর্চা করে ওই বাহান্ন বিঘের চককে চক বেনামীতে বন্দোবস্ত করে একেবারে

দখল নিয়ে নিজের লাঙল চালিয়ে কলাই ছড়িয়ে দখল কায়েম করে নিয়েছে।

অঘোর সরকার খবরটা শুনে চমকে ওঠে।

মুন্সেফ কোর্ট-এ চেষ্টা করেও কিছু করা যায় নি। এসে খবরটা পৌঁছে দেয় ভুবন মাইতিকে।

তখন সন্ধ্যা নেমেছে।

বাড়িটায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ভুবন মাইতি সরকারের মুখে খবরটা শুনে চাইল বিবর্ণ মুখে।

বিষয়-এর মায়া মানুষের সহজাত। এই বিপদের মাঝেও তাই ওই সাংঘাতিক খবরটা শুনে চমকে ওঠে ভুবন মাইতি।

—কি বলছো সরকার?

খবরটা শুনেছে ঘনশ্যামও। গঞ্জ থেকে খবরটা শুনে বাড়িতে এসে বাবাকে গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে চাইল।

—বাবা! একি শুনছি! ওই মহেশ মান্না নাকি ধবলাটের জমির দখল নিয়েছে! কেন?

ভুবন মাইতি বলে—তহশীলদারকে হাত করে এসব করেছে।

—কেন করবে? গর্জে ওঠে ঘনশ্যাম! কি ভেবেছে ও।

এই প্রশ্নের কোন জবাব নেই। একজন অন্য সকলের সব কিছু অন্যায় ভাবে লুটে নেবেই।

ঘনশ্যাম বলে—গায়ের জোরে দখল নেবে? আমরা ছেড়ে দেব না।

—এখন কিছু করার নেই ঘনশ্যাম। আইন বলে ও এই কাজ করেছে। অঘোর সরকার জানায় কথাটা।

—আইন!

ঘনশ্যাম আজ ওই আইন মানতে রাজি নয়। ওই আইনকে কিনে নিয়েছে মহেশ মান্নার মত ধূর্ত লোকগুলো। সে আজ ওই আইন মানবে না।

বলে ঘনশ্যাম—ওসব মানি না। এই জমির দখল নেবই। তাতে যা হবার হোক!

ভুবন মাইতি ছেলের দিকে চাইল।

জানে বেপরোয়া ও। আর মহেশ মান্নাও তৈরি হয়েই এই ভাবে দখল নিয়েছে। আজ সেও ছেড়ে দেবে না।

লোকটা বাদাবনের শিয়ালের চেয়েও ধূর্ত আর কৌশলী। নাহলে সামান্য ঠিকাদার হয়ে এসেছিল এখানে। আজ ধীরে ধীরে এই দ্বীপের মাটিতে ওর

লোভী থাবাটা চেপে বসিয়ে চলেছে। ভুবন মাইতি বলে—আমরা 'ছানি' মামলা করবো সরকারে। কালই আর্জি করো কোর্টে।

ঘনশ্যাম জানে ওতে কাজ হবে না।

বলে সে—ওতো আর এক ফ্যাসাদ-এর কল। টাকাই যাবে—কাজ কি হবে? দখল নিয়ে নিই—ও যা পারে করুক।

ওকে নিরস্ত করে ভুবন মাইতি।

—ওসব ফৌজদারি করিসনে ঘনশ্যাম। এখন তোর মহাগুরু নিপাতের দশা, আমারও বরাত মন্দ রে—ঘরের লক্ষ্মী চলে গেল—তখনই বোঝা উচিত ছিল সর্বনাশ আরও হবে। তাই হয়েছে রে। এখন ওসব গোলমাল করিস নি বাবা।

গিরিবালাও বলে—দাদা যা বলছে শোন। বরাতে থাকলে বিষয় আবার হবে।

কিন্তু ঘনশ্যাম গর্জায়—তাই বলে ওই লোভী লোকটার এতবড় অপমানটাকে মেনে নিতে হবে? তোমরা চুপ করে থাকলে আমি থাকবো না বাবা। আজ না হোক পরেও এর জবাব দেবই।

নরহরি ভটচায যজমানের হিত চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করে না। দ্বীপের মধ্যে সে যেন সবচেয়ে পণ্ডিত আর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলেই ভাবে নিজেকে। ভুবন মাইতি তার পুরনো যজমান, তাই এসময় সে এসেছে।

কম্বলের আসনে দাওয়ায় চেপে বসে এবার গজখানেক লম্বা কাগজে এন্তার ফর্দ করে চলেছে। চোখ কান তার সজাগ রয়েছে।

শুনছে ওদের কথাগুলো। বেশ বুঝেছি নরহরি ভটচায ভুবন মাইতির এবার পাশা ওলটাবে।

মহেশ মান্নার চাকাই এখন চলবে। ইদানীং নরহরি ভটচায অবশ্য মহেশ মান্নার বৈঠকখানায় রোজ সকালে হাজিরা দেয়। মহেশবাবু চায়ের ব্যবস্থা করেছে।

এবার সাগরদ্বীপের ইলেকসনের মাথা ওইই। কোন নেতা নাকি বলেছিল —তুমিই দাঁড়াও মহেশ। কিন্তু মহেশবাবু নাকি বলেছে—সময় হবে না আমার। তবে আপনারা একটা কাউকে পাঠান, এম-এল-এ করে দেবো!

সেই এলেম এবার রাখছে মহেশ মান্না।

নরহরি আজ তাই ওই খবরটা আনে মহেশ মান্নার কাছে। আরও রাগ

তার শ্রাদ্ধে যে রকম আমদানি হবে ভেবেছিল তা হচ্ছে না।

নরহরি বলে—ক্ষেপেছেন মহেশবাবু, ভুবন মাইতি ওই ধবলাটের জমির দখল নিতে যাবে লড়াই করে? মাদী। মাদী ওটা। বলে কিনা ঘরের লক্ষ্মী চলে গেল, এবার এসব তো যাবেই।

মহেশ মান্নার ভয় তবু যায় না। শুধোয় সে—ওই ঘনা কী বলে?

ঘনশ্যামকে সে ইদানীং একটু সমীহ করছে মনে মনে। বাইরে অবশ্য সেটা প্রকাশ করে না।

নরহরি বলে—তাচ্ছিল্যভরে—ওটার তড়পানিই সার। ভাবি একটা কুমীর মেরে যেন বীর হয়ে উঠেছে। তুই লাগবি মান্নাবাবুর সাথে!

হাসছে মহেশ মান্না।

মহেশ মান্না ইদানীং বৈঠকখানায় চা বিস্কুট সাপ্লাই করে এই গঞ্জের বেশ কিছু মানুষকে স্তাবকে পরিণত করেছে। ও জেনেছে বেশ গুছিয়ে এই দ্বীপে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে হলে নিজের বুদ্ধি এলেম ছাড়াও পিছনে স্তাবক-এর দল কিছু চাই।

আর সেগুলো জুটতে দেরি হয় না এই কালে।

মহেশ মান্না চতুর লোক, ও দেখেছে প্রতিটি মানুষেরই কিছুটা দুর্বলতা আছে, অভাব অভিযোগ তো আছেই। আর সেইগুলোকেই মূলধন করে পুরোহিত নরহরি ভট্টচায, নস্থ বিশ্বাস—মায় রমণ ডাক্তারকে হাতে করেছে।

এই দ্বীপের জেলেরাও এবার তার হাতে এসে গেছে।

মহেশ মান্না নিজেই বেশ কিছু টাকা খরচা করে জাল কিনেছে, গাং-এর ধারের ঝাউবনের নীচে উঁচু বালিয়াড়িতে লম্বা টিনের শেড বানিয়ে মাছের আড়ত করেছে। নিশাচর রতন যতীন গুপীনাথ জেলেপাড়ার অনেককেই ও জাল ভাড়া দেয়, কিছু দাদন দিয়েছে, আর ওদের জালে ধরা পড়া সব মাছ আর গাং পার হয়ে কাকদ্বীপের মোহান্তের আড়তে না গিয়ে সব আসে এখানে। মহেশ মান্নার কাছ থেকে কাকদ্বীপে চালান যায়।

লাভের অঙ্কটা গেলে একা মহেশ মান্না। সাতে পাঁচে মহেশ এখন সাগর দ্বীপকে ক্রমশঃ তার জমিদারিতে পরিণত করতে চলেছে।

সেই অধিকার নিয়েই মহেশ ধবলাটের তিন নম্বর লাটের ভুবন মাইতির জমিগুলো বেনামিতে দখল করেছে। আর লক্ষ্য করেছে এনিয়ে ওই ভুবন মাইতি এই শোক দুঃখের সময় তেমন কঠিন কোন প্রতিবাদ করেনি। ওর ছেলে ঘনশ্যামও রুখে ওঠেনি।

মনে মনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয় মহেশ মান্না।

তবু সেদিন বসন্ত পণ্ডিতের কথায় একটু অবাক হয় মহেশ। আর কেউ প্রতিবাদ করেনি তার কাজের, ভুবন মাইতি অবশ্য টাইটেল স্যুটের মামলা করেছে। মামলাকে ভয় করে না মহেশ।

বসন্ত পণ্ডিতের কথাটা শুনে চাইল ওর দিকে।

বসন্ত পণ্ডিত কয়েক বৎসর আগে এই দ্বীপে এসেছিল। সেদিন কচুবেড়িয়ার আবাদে সবে বসত গড়ে উঠেছে। সমাজজীবন-এর নোতুন একটি ভিত পত্তন হচ্ছে এখানে।

শৈশব অবস্থায় কোন মানুষই সংসারের নীচতা—কাঠিন্য মালিন্যকে দেখে না, সে তখন মালিন্যমুক্ত হয়ে আসে। নোতুন আবাদে তখন মানুষগুলো এসেছে নতুন চেতনা নিয়ে। পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, একে অন্যের জন্যে চিন্তা ভাবনা করে।

তাই ভুবন মাইতি সেদিন চেয়েছিল তাদের ছেলেপুলেদের জন্য একটা পাঠশালা করতে হবে। আর তাই সেদিন কিছু জমির বরাদ্দও হয়ে যায়। বসন্ত পণ্ডিত ঠাঁই পেল এখানে।

সেই থেকে তার পাঠশালা চলে আসছে।

ধর্মভীরু নিরীহ গোছের মানুষ, সংসারে স্ত্রী বাসিনী আর ছোট মেয়ে কমলা। তিনজনের দিন চলে যায় ওই জমির সামান্য আয় থেকে আর ছাত্রও জুটছে বেশ। কয়েকখানা গ্রামের ছেলেমেয়েরা আসে পাঠশালে। তাদের থেকেও কিছু আয়পয় হয়।

সন্ধ্যাবেলায় বসন্ত পণ্ডিত বসতির হাটতলার ওদিকে শিবমন্দিরের খাড়া চাতালে বসে রামায়ণ পাঠ করে। অনেকেই আসে।

ওদিকে মুক্ত সমুদ্র—জোয়ারের গোঙানি, বাতাসে ওঠে সমুদ্রের গর্জন, ঝাউ-বনে সুর ওঠে। ওই মুক্ত পরিবেশে তারাজ্বলা অন্ধকারে বসন্ত পণ্ডিতের সুরেলা গলায় রামায়ণের সুর ওঠে।

রামচন্দ্রের সমুদ্র বন্ধনের কথা। ওপারে স্বর্ণলঙ্কা—সেখানে বন্দী হয়ে আছে সীতা, এপারে শ্রীরামচন্দ্র এসেছেন সেই সীতার উদ্ধারের আশায়—মহোদধির বিস্তীর্ণ বিস্তার তাকে পার হতে হবে।

....সেই বিচিত্র পরিবেশে রামায়ণের কাল যেন ফিরে আসে।

... কিন্তু ক্রমশঃ দিন বদলাচ্ছে।

রূপ বদলাচ্ছে সাগরদ্বীপেরও। বসন্ত পণ্ডিত এই রূপটাকে দেখেছে। দেখেছে আজ মহেশ মান্নার এই নতুন লোভী সত্তাটাকে। আগে এই

আবাদকে অনেকে বলতো ভুবন মাইতির আবাদ।

সেদিনগুলোকে ভোলেনি বসন্ত পণ্ডিত।

সব দিকে তখনও ভেড়ি বাঁধ হয়নি।

গ্রীষ্মেও তবু এখানের বাতাস সমুদ্রের জন্য ঠাণ্ডা থাকে, মাটি তেতে ওঠে, নোনা মাটির তার তখনও মরেনি।

ওদিকে জেগে আছে খালের ধারে আদিম অরণ্য। কেওড়া, গরাণ, বাইন, হেঁতাল গাছের জটলা। তার একদিকে এরা জঙ্গল হাসিল করে নোতুন আবাদ গড়ছে। মাটিতে জড়িয়ে আছে দীর্ঘ শতাব্দীর অরণ্যের শিকড়গুলো। লাঙল টাংনা গাঁইতি মেরে ওরা মাটি কোপাচ্ছে।

এদিকে নদীর ধার ঘেঁসে কিছুটা উঁচু বাদায় কিছু ঘর-বাড়ি গড়ে উঠেছে।

....আকাশের কোলে দেখা যায় কালো একটুকরো মেঘ, নিশাকর কোদাল নামিয়ে দেখছে ঈশান কোণের মেঘটাকে। যতদূর নজর যায় শুধু গাং- উদ্বেল উত্তাল হয়ে উঠছে। সেই সমুদ্রমেঘের ছায়ায় বাতাসের সুর বদলাচ্ছে, গাং-চিল বাটাম পাখীগুলো সমুদ্রের দিক থেকে দ্বীপের ওদিকের বনের গাছ-গাছালিতে আশ্রয় নেয়।

মেঘটা দেখতে দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে ছোট্ট এই বসতের দিকে এগিয়ে আসে।

নিশাকর সমুদ্রে জাল ফেলে, ও চেনে ওই গাং—ওই মেঘটাকে। এই দ্বীপের নোতুন মানুষগুলো অবাক হয়ে চেয়ে আছে। স্থির নিথর হয়ে গেল চারিদিক।

কাঁটা গাছগুলো টেনে ফেলে—জমির শিকড়গুলো তুলছে ওরা। রুক্ষ বন্ধ্যা প্রান্তর। বসন্ত পণ্ডিতও মাথায় গামছা জড়িয়ে কাজ করছে। এখানে এসে ওরা বাঁচার জন্য লড়াই করছে, অরণ্যের বুকে থেকে জমি দখল নিতে চায়, সমুদ্রের সর্বনাশা গ্রাস থেকে এ মাটিকে রক্ষা করে ফলবতী করে তুলতে চায়।

হঠাৎ স্তব্ধ দিগন্তে একটা গর্জন ওঠে—ক্রমশঃ বাড়ছে সেই গর্জনটা। চিৎকার করে ওঠে নিশাকর—হুসিয়ার গো মশায়রা—হেঁই রতনা, শুই পড় গুঁড়ি মেরে। হেঁই ঠাকুর গো—

সমুদ্রের বুক থেকে একটা বিরাট প্রাচীর যেন ঝড়ের মাথায় ছুটে আসছে দ্বীপের দিকে, মানুষগুলোর সব কিছু মুছে শেষ করে দেবে। বালিচরে কপিলমুনির মন্দিরটা ঢেকে গেছে ধুলিঝড়ে—ঘুরতে ঘুরতে সেই ধুলিঝড় উঠছে আকাশের দিকে, কলরব ছাপিয়ে সমুদ্রের ঢেউগুলো এগিয়ে আসছে।

ওরা দৌড়চ্ছে উঁচু বাদার দিকে।

ছিটকে পড়েছে কেউ—বসন্ত পণ্ডিত একজনকে টেনে তুলে দৌড়চ্ছে! পিছনে সফেন জলের সীমা দ্বীপের মাটিতে এসে আছড়ে পড়েছে। শুকনো তৃষিত মাটি আকণ্ঠ পান করছে সেই জল, আর ঢেউগুলো এগিয়ে আসছে।

—সামাল।

একটার পর একটা মত্ত ঢেউকে সমুদ্র পাঠিয়ে চলেছে, দু-হাত শূন্যে তুলে কে আর্ত চীৎকার করে, ঢেউ-এর টানে দু' একবার দেখা গেল তাকে। তারপর কোথায় চলে গেছে।

ভীত ত্রস্ত মানুষগুলো এসে আশ্রয় নিয়েছে উঁচু বাদার উপর। তখনও ঝড় সমানে চলেছে, ভিজছে ওরা আঝোর বৃষ্টিতে। রাত্রি নামে। হিমে ভিজে কাঁপছে ভীত ত্রস্ত মানুষগুলো। ওদের আশ্রয় ওই ঘরগুলোর চাল অক্ষত নেই। কোন ঘরের ছাউনি ঘূর্ণি হাওয়ার সওয়ার হয়ে চলে গেছে গাং-এ।

ভুবন মাইতি-রমণ ডাক্তাররা বের হয় ঝড় থামার পর, সকাল হয়। রাত-ভোর জমে থাকা মেঘগুলো কোথায় হারিয়ে গিয়ে আবার রোদ উঠছে। ঝকঝকে সকাল। ফিরে গেছে মত্ত সমুদ্র তার আক্রমণ শেষ করে।

বীজধান কিছু হয়েছিল, আশা ছিল এবার ধান পুঁতবে দ্বীপের নোতুন আবাদে, কিছু সব্জীও হয়েছিল।

কিন্তু কিছুই নেই। নোনা জলে ডুবে ওই সবুজ গাছগুলে পচে হেজে গেছে। আর সদ্যকর্ষিত মাটির বুকে দূর অবধি পড়েছে নুনের আস্তরণ। ওই মাটিতে ফসল ফলে না।

—কি হবে গো! সকাল সন্ঝেতক খেটে মাটি বানালম, জমি ক্ষার হই গেল গ!

ভুবন মাইতি দেখছে ওই সর্বনাশ।

হেরে যাবে না তারা। তিন চারটে লাটের চাষীরাও এসেছে। নিশাকর বহে—গাং-এ মাছ মারতি নৌকা জাল চাই, তাও নাই। ক্ষেতিও গেল। কি হবে মাইতিমাশায়!

ওরা বলে—ভেঁড়ি বাঁধ দিতে হবে সকলকেই। ই সাগরের তোড় রুখতে হবে।

সেই দিনগুলোর কথা ভোলেনি বসন্ত পণ্ডিত।

সেদিন ভুবন মাইতি এগিয়ে এসেছিল।

ঝড়ে নরহরির ঘরখানা উড়ে গেছে, জমিটুকুও গেছে নোনা জলে।

নরহরি বলে—এ কপিল মুনির ঠাঁই হে। সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান ওই মুনির কোপে ভস্ম হয়ে গেছে, ঐখানে তো সেই ভস্মভরা শ্মশান হে, মানুষ বাঁচবে কি করে এ মাটিতে!

জেলেপাড়ার মাতব্বররাও ভাবছে কথাটা।

তাদের ঘরে মায়া নেই। ডিঙ্গি ভাসিয়ে যে কোন কূলে গিয়ে ভিড়বে তারা। মাছ ধরবে—দিন চালাবে। তাই বলে গোবিন্দ মালো—তা সত্যি গো, নিষ্যাশ সত্যি। ভাবছি ইখান থেকে চলে যাবো, দীঘার দিকে।

ভুবন মাইতি বাধা দেয়—না! সবাই থাকবি। সরকার থেকে ভেড়ি বাঁধ হবে। সাগরমেলার আগেই।

বসন্ত পণ্ডিত বলে—হ্যাঁরে। শুধু এখানে ভস্মই হয় নি ভটচায, ওই সন্তানরা উদ্ধারও হয়েছিল। শোননি!

সেই কাহিনী এরা অনেকেই জানে। তাই আসে সারা ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই অমৃত লগ্নে এখানের সাগরসঙ্গমে স্নান করতে, মহাতীর্থ এই সাগরবেলা।

বসন্ত পণ্ডিতের কথাগুলো শুনছে ওই সর্বহারা মানুষগুলো। বলে সে—ভগীরথ গঙ্গাকে এনেছিল, উদ্ধার করেছিল সকলকে। কপিল মুনির আশীর্বাদ পেয়েছিল। এই মরা দ্বীপ একদিন ধনধান্যে ভরে উঠবে মাতব্বর। ভগীরথের মত সাধনা চাই।

কথাটা ভুবন মাইতির মনে ধরে। —বেশ বলেছো পণ্ডিত। সত্যি বড় ভালো কথা বলেছো।

....নোতুন করে পত্তন হয়েছিল আবাদের।

তখন লোকে বলতো ভুবন মাইতির আবাদ। তারপরের বছরই ভেড়ি বাঁধ শুরু হয়েছিল দ্বীপের প্রতিটি লাটে, মহেশ মান্না এসেছিল সেই বাঁধের ঠিকাদার হয়ে। একটি ঘর পালানো তরুণ—সে এই দ্বীপে নিজের ভাগ্য গড়তে এসেছিল।

ঘনশ্যামও দেখেছিল তাকে। তখন ঘনশ্যাম স্কুলে পড়ছে পণ্ডিতের পাঠশালা ছেড়ে। দেখেছিল মহেশ মান্না জেলেপাড়ার লোকদের দিন ভোর খাটিয়ে চার আনা পয়সা দিত আর এক সের করে গম!

....বসন্ত পণ্ডিত এতদিন ধরে সেই পাঠশালা চালিয়ে এখানের মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছলো। ভুবন মাইতির জমি এভাবে দখল করে নেবার কথাটা শুনে বসন্ত পণ্ডিত সেদিন চমকে ওঠে।

—সেকি নিশাকর!

নিশাকর সর্দার বলে—তাই তো শুনলু পণ্ডিত। বাড়িতে লোকটার এতবড় শোগ-দুঃখ, আর সেই মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছে ওই মান্নাবাবু।

···বসন্ত পণ্ডিতকে সেদিন বৈঠকখানায় আসতে দেখে চাইল মহেশ মান্না। মহেশ এমনিতে বিনয়ী। কথাগুলো খুবই মিষ্টি। ব্যবসাদার মানুষ। তাই এই মিষ্টি স্বভাবটাকে সে বজায় রেখে চলে।

—আসুন পণ্ডিত। চা চলবে তো?

নরহরি ভটচায বলে—চায়ে দোষ নাই হে! ন দোষঃ চা ভক্ষণে। কি হে ঋষি! ডাক্তোর কি বলো?

বসন্ত পণ্ডিত বলে—চা খেতে আসিনি মহেশ! একটা কথা ছিল।

মহেশ একটু অবাক হয়। বলে সে—বলুন!

আড্ডাধারীরাও চুপ করে চেয়ে আছে ওর দিকে। বলে ওঠে বসন্ত পণ্ডিত—কাজটা ভালো করলে না মহেশ!

ওর কথার স্বরে মাষ্টারির ভাব ফুটে ওঠে। মহেশের এই শাসনের সুর ভালো লাগে না। আর কাজ তো সে দু' একটা করে না। তাই শুধোয় শান্ত স্বরে—কোন কাজটার কথা বলছেন পণ্ডিত মশায়?

বসন্ত পণ্ডিত শোনায়—এই শোক দুঃখের সময় ভুবন মাইতিমশায়ের ওই লাটের জমি দখল করে ঠিক কাজ করোনি। এই দ্বীপে বন কেটে বসত করেছিল মাইতিমশায়। এককালে এই আবাদের নাম ছিল মাইতিমশায়ের আবাদ। আজ তার বিপদের দিনে এটা কি কাজ করলে মহেশ! এই দ্বীপে এই সব ছিল না, লোভ-হিংসা এসব আসলো কেন?

মহেশ জবাব দিল না। দেখছে লোকটাকে।

মহেশ যেন নোতুন একটা কথা শুনছে। মানুষ প্রথমে অনেক এসেছে এই নোতুন আবাদে। বদ্ধজলে আপনা হতেই প্রকৃতির নিয়মেই জন্ম নেয় জীব কোষের। কালে কালে তারা বড় হয়ে প্রাণীর রূপ নেয়। সেই মৌল প্রাণশক্তি প্রকৃতির জলবায়ু মাটিতেই নিহিত রয়েছে। তেমনি মানুষের সমাজে বিভিন্ন মানুষের মনের অতলে রয়েছে হিংসা-লোভ-ভালোবাসা-ঘৃণা-সবকিছু। এক এক রূপে তার প্রকাশ পায়।

এখানেও সেই নিয়মের বশেই ঘটছে এই নোতুন জটিলতাগুলো।

মহেশ ওসব ভাবে না। তার ভাবনা ওই দখল করার, সর্বস্ব গ্রাস করার। সেই পথেই চলেছে মহেশ। আজ বসন্ত পণ্ডিতের মুখে প্রতিবাদটা শুনে

ভেবেছে যে প্রতিপক্ষও বসে নেই। এ নিয়ে কিছু মহলে আলোচনা হয়েছে তার কাজের।

মহেশ রেগে উঠেছে ওই শীর্ণ লোকটার উপর। মাষ্টারি করে যেন সকলের উপর শাসন করার, সকলকে উপদেশ দেবার অধিকার তার জন্মে গেছে। তাই এসেছে মহেশকেও শাসন করতে।

বৈঠকখানায় স্তব্ধতা নামে। অবাক হয়েছে নরহরি, রমন ডাক্তারের দল। গজেন মহেশ মান্নার দিকে চাইল। এর মধ্যে গজেন বাদাবনে রাতের অন্ধকারে এদিক ওদিকের বসতির দু' একটা মানুষকে গায়েব করে দিয়েছে। এবারও একটা তেমনি কিছু করতে হবে বোধ হয়।

কিন্তু মহেশ সেদিকে গেল না।

বলে সে বিনীত ভাবে—ওই খবরটা তহশীলদারের কাছে পেতেন পণ্ডিত। জমি সার্টিফিকেট হয়েছিল বাকী করের দায়ে, অন্য যে কেউ ডেকে নিতে পারতো, আমি নিয়ে কি দোষ করেছি? এ্যা।

বসন্ত পণ্ডিত আইনের মারপ্যাচ বোঝে না।

বলে সে,—তবু তাদের না জানিয়ে এটা নিয়ে ঠিক করোনি মহেশ!

চলে গেল বসন্ত পণ্ডিত।

নরহরি এবার ফেটে পড়ে—দালালী করতে এসেছিল বুঝি ওই মাইতির হয়ে?

ঋষি নস্কর বলে—করবে না? ওর মতলব তো অন্যরকম হে?

মহেশ মান্না শুধোয়—সে কি কথা?

ঋষি বলে—দেখেননি ওর মেয়ে কমলার সঙ্গে ওই ঘনার কেমন মেশামেশি। মেয়েটার বয়স হয়েছে বিয়ে-থা দেবার নাম নাই! ও ভেবেছে ভুবন মাইতি ওর মেয়েকে ঘরে নেবে বৌ করে। তাই মাইতির জমির শোকে ওর বুকটা চড় চড় করে উঠেছে।

মহেশ চুপ করে কথাটা শুনছে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে বসন্ত পণ্ডিতের মেয়ে কমলার পুরুষ্ট সুন্দর ফর্সা মুখখানা। এত কাছে আছে অথচ মনে পড়েনি ব্যাপারটা। সে দেখেছে কমলাকে ঘনশ্যামের সঙ্গে গাং-এ গঞ্জের বালিয়াড়িতে ঘুরে বেড়াতে। কপিল মুনির মন্দিরের ওদিকে বালুচরেও দেখেছে। এখন রসাল ফলের মতই টসটসে হয়ে উঠেছে কমলা। আগেকার সেই দস্যিপনা নেই—ভাদরের জোয়ার আসা গাং-এর মত স্থির আর গহিন। তেমনি সুন্দর হয়ে উঠেছে মেয়েটা।

আজ নোতুন করে কথাটা ভাবছে মহেশ।

এ-দ্বীপের সব কিছুতেই তার অধিকার, তার দাবী। আর সেই পথে এগোতে হবে তাকে সাবধানে। কুমীরটাকে দেখেছিল মহেশ, শিকারের দিকে এগোবার সময় দেখেছিল বিরাট শক্তিমান জানোয়ারটা কেমন চুপিসাড়ে সাবধানে এগিয়ে চলেছে। আর শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ার মুহূর্তে সে বদলে গেছে। তখন বিদ্যুৎ গতিতে পূর্ণ বিক্রমে সে আক্রমণ করে শত্রুকে।

এখন সাবধানে এগোতে হবে তাকে।

মহেশ বলে—যেতে দাও ঋষি ওসব কথা। কত জনে কত কথা বলবে, তবে অন্যায় করিনি এটা জানি।

—তাতো বটেই। সমর্থন করে অনেকেই।

হঠাৎ কার ডাকে চাইল রমণ। তার দুটি বাহন—একটা তিন ঠ্যাং-ওয়ালা ঘোড়া, অবশ্য ঠ্যাং তার চারখানাই। সাইস কাম কম্পাউণ্ডার কাম ওষুধের বাক্সবহনদার নিত্যলাল ওকে ডাকছে। ঘোড়াটাকে চরবার জন্য ও সামনের দুটো ঠ্যাং-এ দড়ি বেঁধে একত্র করে ছেড়ে দেয়। ঘোড়াটা ওই তিন ঠ্যাং-এ লাফ দিয়ে দিয়ে জলায় নেমে দল-শ্যাওলা, কচুরীপানা খেয়ে দিন কাটায়, দ্বীপের কোন বসতি থেকে ডাক এলে নেত্যলাল খাল বিল খুঁজে ঘোড়াটাকে তুলে আনে কাদা মাখা অবস্থাতেই, শিরদাড়া বের হওয়া পিঠে কয়েক পুরু চট-এর থলে পেতে গদিমত করে মুখে দড়ি বাঁধা লাগাম চাপিয়ে ডাক্তারের কাছে হাজির হয়—চলেন-গো মুখালি থে ডাক এয়েছেন।

রমণ ডাক্তার উঠে পড়ে তার ডাক শুনে।

—আসি গো মহেশবাবু।

ইদানীং মহেশবাবু ডাকটাই বেশী চলছে।

মহেশ এতে খুশি হয়। বলে সে—কথাটা ভাবছিলাম অনেকদিন থেকেই। দেখি কি করা যায়। আমাদের গ্রামেও ব্যবস্থা করতে হবে। গজেন, কাল ভোরের গোনেই সহরে যেতে হবে। পানসীর মাঝিদের বলে রাখ।

গজেন বুঝেছে এরপর মামামশাই একটা কাণ্ড কিছু বাধাবে। সেও জানে এসব ব্যাপারে তার কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটবে। তাই খুশী হয়ে বলে গজেন —ঠিক আছে। ওদের বলে রাখছি।

মামামশাই ইদানীং নিজের যাতায়াতের জন্যে, সদরের সাহেবদের আসা যাওয়ার সুবিধের জন্যে নিজের পান্সী বানিয়েছে। সেগুন কাঠের হাল্কা মজবুত পানসী, তাতে কাঠের ঘর মত করা, আর গাং-এর রং-এর সঙ্গে ম্যাচ করে সাদা রং করিয়ে লাল বর্ডার দেওয়া হয়েছে।

গজেন বলে—রাজহাস গো। ময়ূরমুখী পান্সী।

ডিঙ্গিতে যাতায়াত করতে এখন অসুবিধা হয় মামাবাবুর।

নরহরি বলে—তাহলে উঠি মহেশবাবু, আবার নিত্যকর্ম আছে।

গঞ্জের হাটের ওদিকে উঁচু বাদার উপর মহেশ মান্না নিজের বসত বাড়ি বানিয়েছে। ভুবন মাইতির বাড়িটার তুলনায় এটা অনেক ভালো। কাকদ্বীপ থেকে রাজমিস্ত্রী আনিয়ে পাকা বাড়িই করেছে; আর ওদিকে একটা পুকুর কেটে মাটি তুলে উঁচু ভিটের উপর করেছে আড়ত-গুদাম-ঘর, ওপাশে কর্তাদের কেউ এলে থাকার জন্য রেস্ট হাউস বানিয়েছে। পুকুরের চারিপাশে ভরাট মাটিতে লাগিয়েছে কলা-নারকেল গাছ, কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলো সবুজ ঘন পাতা মেলে ছায়া ছায়া করে রেখেছে ঠাঁইটাকে।

কিন্তু মহেশের বাড়িতে তেমন শান্তি নাই।

বৌটা বিয়ের পর থেকেই রোগে ভুগছে। শীর্ণ চেহারা—কপালটা উঁচু। আর ছেলেপুলে হয়নি, গলায় হাতে তাবিজ-কবচ মাদুলি অনেক ধারণ করেছে, কিছুই হয়নি। শুধু মেজাজটাই বেড়েছে।

মহেশকে ফিরতে দেখে চাইল বলল—কোথায় ছিলে ?

মহেশ স্ত্রী যশোমতীর দিকে চাইল। শীর্ণ বাখারির মত চেহারা—গলাটাও তেমনি কর্কশ। অবশ্য যশোমতী তার জন্য পরোয়া করে না।

মহেশ জবাব দেয়—গদি ঘরে ছিলাম। মাছের আড়তেও যেতে হ'ল।

যশোমতী দেখছে লোকটাকে।

মহেশ অবশ্য স্ত্রী-র উপরে ভরসা করে বসে নেই। ঘরে আছে মানুষটা, অর্থের অভাব নেই তার। মহেশ তেমন গুরুত্ব দেয় না যশোমতীর কথায়। যশোমতী বলে—দিন রাত লোকের হরেহম্মে নিছ—আর সে পাপের ফল ভুগছি আমি!

আরও কি যেন বলতে চায় যশোমতী। তার অতৃপ্ত মাতৃত্বের জ্বালা তাকে মুখর করে তুলতে চায়। মহেশের সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনে সে। বলে যশোমতী—জেলেপাড়ায় না গেলে ভাত হজম হবে না। ওদের মেয়েগুলোর আধ উদোম গা গতর দেখেই তো মজছো।

হাসে মহেশ। অবশ্য গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতা সে নয়। আর এটাকে দোষের বলে কিছুই দেখে না সে। তাই ও প্রসঙ্গটা থামাবার জন্য বলে—থামো তো। খিদে লেগেছে—চান করে আসছি।

—খেতে দাও দিকি। কাল ভোরে আবার শহরে যেতে হবে। তোমার

কি লাগবে বলে দিও।

যশোমতী জানে ওই করে মানুষটা তাকে ভোলাতে চায়। তবু খিদের কথা শুনে আর কথা বাড়ালো না। যশোমতী বলে—চান করে এসো। খাবার দিতে বলছি। আর শহরে যেতে হবে কেনে? হঠাৎ কি দরকার পড়লো গো।

মহেশ ভাবছে কথাটা। স্ত্রীকে ওসব এখন বলা যাবে না। কাজটা গুছিয়ে না তোলা অবধি পাঁচ কান করা ঠিক হবে না। তাই এড়াবার জন্য বলে—কোর্টে কাজ আছে, জরুরী কাজ।

যশোমতী দেখছে লোকটাকে। আবার কার কি ক্ষেতি করবে কে জানে।

...ক্ষতি সত্যিই হয়েছে ভুবন মাইতির। এক লপ্তে বাগান বিঘে জমিতে এবার গুছিয়ে শ্যালো বসিয়ে চাষ করলে বেশ কিছু আমদানী হতো, সে পথও মেরে দিয়েছে মহেশ মান্না। ঘনশ্যাম ভাবছে কথাটা। মনে হয়েছিল একদিন ঝাঁপিয়ে পড়বে মহেশের উপর, দুহাতে ওর টুঁটি টিপে ধরে তিলে তিলে শেষ করে ওই লোকটার সর্বগ্রাসী ক্ষুধাকে মিটিয়ে দেবে চিরদিনের জন্য। ওটা পারে ঘনশ্যাম।

এখন সে বলিষ্ঠ দামাল একটি যুবক। জানে ঘনশ্যাম তার নিজের শক্তি আর সাহসের খবরটা। কিন্তু সে কাজ করতে পারেনি শুধুমাত্র তার বাবার জন্য। পদে পদে নিষেধ করে ভুবন মাইতি—মাথা গরম করিস না ঘনা।

ঘনশ্যাম চুপ করে থাকে। মনে হয় তার কোথায় নিদারুণ ভাবে হেরে গেছে সে।

বৈকাল নামছে সমুদ্রের বেলাভূমিতে, সবুজ ঝাউবনে লুটোপুটি খায় মাতাল বাতাস, এদিকে ওদিকে দূরে সাদা-লাল বিন্দুর মত পাল তুলে নৌকাগুলো চলেছে মাছ মারতে।

নিশাকর সর্দার-রতন-যতীন-কন্দর্প-গুপীনাথ-এর দল চলেছে সমুদ্রে। নীচে আঁধার নামা কালিঢালা সমুদ্র। রাতের অন্ধকারে ছোঁ মারে ঢেউগুলো, ওরা শীতে হিমে কেঁপে কেঁপে জাল ফেলে চলে। কালো জলের অতলে তলিয়ে যায় জালগুলো, জেগে থাকে লাল বড় মাঝারি নানা সাইজের বলগুলো।

দমকা হাওয়ায় ওঠে সমুদ্রের গর্জন। তীরভূমি থেকে ওদের দেখছে ঘনশ্যাম। মনে মনে ওদের সঙ্গে মুক্ত অবাধ সমুদ্রে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ঘনশ্যাম, সমুদ্র তাকে ডাকে—রাতের অন্ধকারে ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে

গড়িয়ে পড়ে—কে যেন মুঠো মুঠো রূপালী ফুল ছড়িয়ে দেয়, নৌকার বৈঠা-গুলোর ঘায়ে ছিটকে ওঠা জলে ফুলঝুরির আভা ওঠে ফসফরাস-এর দ্যুতিতে।

—ওমা তুমি এখানে ?

চাইল ওর দিকে ঘনশ্যাম।

খুশীতে উপছে পড়ে ছুটে আসছে কমলা, সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ছে ওর এলোমেলো চুল, শাড়ির আঁচল। নতুন এক কমলাকে দেখছে ঘনশ্যাম।

কমলার সারা দেহে যৌবনের মত্ততা, ওকে এইভাবে আগে যেন দেখেনি ঘনশ্যাম, হাঁপাচ্ছে কমলা, ফর্সা গালে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে, ওঠানামা করছে ওর উন্নত নিটোল বুক।

কলরব করে কমলা—আমি খুঁজে খুঁজে সারা—এদিকে এখানে একা একা বসে আছো!

ঘনশ্যাম-এর জবাব দেবার মত তেমন কিছুই নেই। বলে সে—ভাল লাগছিল নারে। তাই চলে এলাম এদিকে—

কমলা বলে—বাবা খবর পেয়েছে পাস করেছো তুমি। পরীক্ষার ফল বের হয়েছে, কাকদ্বীপে কাগজ দেখে এসেছে ভালভাবে পাস করেছো।

ঘনশ্যাম চাইল ওর দিকে।

আজ বারবার মায়ের কথা মনে পড়ে, মা নেই—মা চেয়েছিল সে ভাল ভাবে পাস করবে, সহরে পড়তে যাবে।

আজ মা নেই।

মার কথা ভেবে দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

কমলা দেখছে ওকে। বলে—এই কি হল ?

ঘনশ্যাম-এর চোখের জল পড়ে না সহজে, এমনিতে ও কঠিন ধাতের ছেলে, নিজের মনের দুর্বলতাকে কোথাও প্রকাশ করতে চায় না সে, কিন্তু কমলার সামনে আজ নিজেকে প্রকাশ করতে তার দ্বিধা হয় না। বলে ঘনশ্যাম—আজ মা নেই, মা থাকলে কত খুশী হতো। বার বার তার কথাই মনে পড়ছে রে।

কমলা দুঃখে আজ সমবেদনা জানায়, ও বুঝেছে ঘনশ্যামের মনের সেই নিঃস্বতাটাকে। বলে কমলা—মা তো কারো চিরকাল থাকে না।

হয়তো কথাটা সত্যি। তাই মা তার হারিয়ে গেছে কোন অচেনা জগতে।

ঘনশ্যামের পাসের খবরে খুশি হয় বসন্ত পণ্ডিতও।

বাসিনীও খুশী হয়েছে। মা মারা যাবার পর থেকে বাসিনীর মনেও একটা মায়া জাগে ছেলেটার জন্যে। বলে বাসিনী—আজ মা থাকলে কত খুশী হতো ঘনশ্যাম। বাসিনী তাড়া দেয়—কইরে কমলা। আন।

কমলা একটা থালায় মুড়কি মুড়ির মোয়া আনে।

বসন্ত পণ্ডিত বলে—তোমার পাসের খবর শুনে তোমার মাসীমা ওই সব তৈরী করতে বসে গেল।

ঘনশ্যাম বলে—এতসব কি করেছো মাসি?

বাসিনী শোনায়—কি ই বা মেলে এখানে, শুভ খবরে মিষ্টিমুখ করতে হয়। খাও ঘনশ্যাম।

—এত খেতে পারা যায়? এ্যাই কমল—তুলে নে।

ঘনশ্যামের কথায় কমলা বলে—খাও তো, পড়ে থাকলে ফেলা যাবে না, খেয়ে নাও কিইবা দিইছি।

বসন্ত পণ্ডিত শোনায়—তাহলে এবার ডায়মণ্ডহারবারে গে কলেজে ভর্তি হয়ে যা', অঙ্কতে ভাল নাম্বার আছে। সায়েন্স নাও বাবু। হোষ্টেলেই থাকবে ব্যস—বি-এস-সি পাশ করে ফেলো।

ঘনশ্যাম ভাবছে কথাটা।

এখন সেও বুঝেছে তাদের সংসারের অবস্থা। ওই জমিগুলো চলে যাবার ফলে বিপদে পড়েছে তারা। ভরসা ওই পারঘাটের। আর বাবারও বয়স হয়েছে, এ সময় তাকে খরচের মধ্যে ফেলতে চায় না।

বসন্ত ওকে ভাবতে দেখে বলে—কি এত ভাবছো ঘনশ্যাম!

ঘনশ্যাম খরচের কথাটাই ভাবছিল, বলে সে—মাসে মাসে তো প্রায় দেড়-দুশো টাকার ব্যাপার।

বসন্ত পণ্ডিতও সেটা জানে। তার কাছে ওই টাকাটা সত্যিই অনেক। কিন্তু মনে হয় ভুবন মাইতি তার একমাত্র ছেলেকে মানুষ করার জন্য ও টাকার ব্যবস্থা যে ভাবে হোক করতে পারবে!

বসন্ত পণ্ডিত চায় ঘনশ্যাম লেখাপড়া শিখুক। বাসিনীও বলে,—না বাবা, পয়সার জন্য পড়া তোমার আটকাবে না।

বসন্ত বলে—আমি মাইতিমশায়কে বলবো।

ফিরছে তারা দুইজন, ঘনশ্যাম আর কমলা।

তারাগুলো ঝিলিক তোলে সমুদ্রের জলে, রাতের বাতাসে ওঠে ঢেউ-এর মত্ত গর্জন।

কমলার মনে কথাটা বারবার জাগে।

—তুমি তাহলে চলে যাবে এখান থেকে বোর্ডিং-এ ?

ঘনশ্যাম চাইল ওর দিকে, বলে,—গেলে তোর খুব ভালো হয়, না ? সবাই চাস তোরা আমি এখান থেকে দূর হয়ে যাই।

কমলা ওর অভিমানভরা কথাগুলোর জবাবে বলে—তাই বলেছি নাকি ? তুমি চলে গেলে একা একা খুবই খারাপ লাগবে।

হাসে ঘনশ্যাম—কেন ? জানাবাড়ির শিউলি তো আছে। দুজনে খুব আড্ডা দিস।

শিউলি কমলার বন্ধু, পাশাপাশি বাড়ি। কমলার সঙ্গে ওর খুব ভাব। ঘনশ্যাম তাই কথাটা বলে।

কমলা বলে—ও আর ক'দিন সামনের মাঘ মাসে ওর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তখন ?

হাসে ঘনশ্যাম—দুঃখ হচ্ছে ? তোরও বিয়ে দেবে শুনলাম শিগগীর। তোর বাবা তো পাত্র দেখতেই কাকদ্বীপ গেইছিল রে। ছেলে নাকি কলকাতায় চাকরি করে। সহরে থাকবি গিয়ে।

কমলা কথাটা ভাবতে পারে না। ঘনশ্যামকে ছেড়ে—এই দ্বীপের পরিবেশ ছেড়ে ভিড়ে ঘিঞ্জির মধ্যে হারিয়ে যেতে পারবে না সে। ঘনশ্যামও একথাটা বোঝে না, হয়তো বুঝতেই চায় না। ওকে এড়িয়ে যেতে চায়।

কমলা বলে—তুমি তো আমাকে দেখতেই পারো না। তাই ভাবো আপদ বিদায় হলে বাঁচি। বেশ—তাই যাবো। একদিন দেখবে ওই গাং-এর তুফানেই কোথায় হারিয়ে যাবো।

কমলার দুচোখ বেয়ে জল নামে।

ঘনশ্যাম অবাক হয়ে চাইল ওর দিকে।

—এ্যাই! পাগলী! তবে যে আমাকে যেতে বলছিস ; শোন—

কাছে টেনে নেয় কমলাকে। ওই চকিত স্পর্শে চমকে ওঠে কমলা। তার সারা দেহে বিদ্যুৎস্পর্শ জাগে।

চুপ করে সরে এল কমলা। বলে সে—আমি যাই।

চলে গেল কমলা ওর হাত ছাড়িয়ে। ঘনশ্যাম এসব কিছু বুঝতে পারে না। তার কাছে কমলা ক্রমশঃ যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণে পরিণত হয়েছে।

তারও মনে হয় এই দ্বীপ ছেড়ে—কমলাকে ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে পারবে না। এখানের মাটিতেই তাকে থাকতে হবে।

ভুবন মাইতি কথাটা ভেবেছে।

আজ নিজে বুঝতে পারে স্ত্রী চলে যাবার পর তার দেহ ভেঙে পড়েছে। মনেও সেই জোর নেই। নইলে মহেশ ওর জমি দখল করতে পারতো না এভাবে।

পারঘাটাই এখন সম্বল। এর থেকেই তাকে রোজকার করতে হবে। সামনে আসছে গঙ্গাসাগর মেলার মরশুম। বছরের কটা মাস এই দ্বীপ ঘুমিয়ে থাকে। তার ঘুম ভাঙে ওই মেলার প্রস্তুতির সময় থেকেই মাস খানেক ধরে।

আর টাকা তাকে রোজগার করতে হবে।

ঘনশ্যাম পাশ করেছে। পড়তে গেলে তাকে বাইরে যেতে হবে। এ সময় ঘনশ্যাম চলে গেলে তার পাশে কেউ থাকবে না। আর মাস মাস পড়ার খর্চাও আছে। সেই টাকাটা যোগাড় করতে হবে তাকে বাড়তি রোজগার করে।

গিরিবালা বলে—বৌ কতো বলতো দাদা, ঘনশ্যাম কলেজে পড়বে। মানুষ হবে। তুমি বাপু ওকে পাঠাও। শহরে গে পড়াশোনা করুক, মানুষ হবে।

হাসে ভুবন, বিষণ্ণ মলিন হাসি।

কিছু দিন থেকে সর্দি-কাশি শুরু হয়েছে। গাং-এর ধারে নোনা ভিজে বাতাসে বসে বসে শরীরটায় যেন নোনা ধরে গেছে। সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় দেখছে সাগরদ্বীপের নতুন পাকা বাড়িগুলোর গা থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে, লোহার ব্রিজ-এর গার্ডারগুলোতে মরচে ধরে যায়, মানুষের গতরেও সেই নোনা হাওয়া, শেষ বয়সে এমনি করেই যেন ক্ষয় আনে।

ভুবনকে তাই চ্যবনপ্রাশ খেতে বলেছে গদাধর কবরেজ।

ভুবন দুধ দিয়ে চ্যবনপ্রাশ মেশাতে মেশাতে বলে—দ্যাখ ঘনশ্যাম কি বলে। তবে বাপু মানুষ হবার কথা বলছিল তাহলে এদ্বীপে কি মানুষ হতে পারে না কেউ ?

গিরিবালা এই জবাবে খুশী হতে পারে না। বলে সে—কোন কথার কি জবাব দিচ্ছ ? আমি তাই বলেছি নাকি ?

—ঠিক আছে ঘনা কি বলে দ্যাখো।

টাকার কথাটা যে বাধা হতে পারে তা বলে না মাইতি। অবশ্য টাকা তার কিছু জমা আছে শহরের ব্যাঙ্কে, সেটাতে হাত দিতে চায় না নেহাত

বাধ্য না হয়ে। ঘনশ্যামই যেন ভুবন মাইতিকে এই দায় থেকে উদ্ধার করে। সে বলে—শহরে পড়ে আর কি হবে বাবা? শুধু একগাদা টাকার ছাদ্দ, পাশ করে যদি চাকরী পাই এই দ্বীপ ছেড়ে যেতে হবে কোন মুলুকে কে জানে। তোমার শরীরের এই অবস্থা—দেশছেড়ে চলে যাবো তবু এই বলছো তুমি?

কথাটা শুনে ভুবন মাইতি খুশি হয়। তবু বলে সে—পড়াশুনা না করলে কি করে চলবে?

কথাটা ভেবেছে ঘনশ্যাম। দ্বীপের লোকজন বেড়েছে—আরও বাড়ছে। আর মাছের কারবারও করা যেতে পারে, কিন্তু ডিঙ্গি দিয়ে হবে না। তার জন্য চাই লঞ্চ। ঘনশ্যামের অনেক দিনের ইচ্ছে লঞ্চই করবে একটা। সাগরমেলার মরসুমে বেশ কিছু টাকা উঠে যাবে। দ্বীপে সেই করবে লঞ্চের কারবার।

ঘনশ্যাম বলে—ভাবছি একটা লঞ্চই করবো বাবা। মালপত্র টেনে আনা যাবে। পারঘাটের ব্যাপারে ওটা থাকলে ভালো হবে।

মেলার মরসুমেও কিছু রোজকার আসবে।

কথাটা শুনে চাইল ভুবন।

গিরিবালা অবাক হয়—ওমা। এইসব করবি? বলি গাং তোকে ডাকে না কি রে? নাহলে ই বেবসায় কেউ যায়?

ঘনশ্যাম বলে,—একখানা লঞ্চ থেকে আরও লঞ্চ করবো পিসি। দেখেছো কাকদ্বীপের জানাদের? তিনখানা লঞ্চ চলে—কতো রোজকার হয়? মাছের কারবার করতে পারলে দেখো এই চাকরির তিনগুণ উঠে আসবে। তবু ঘরে থেকে সব দেখাশুনা করে ব্যবসা চলবে।

কথাটা ভাবছে ভুবন। তার মনে হয় ঘনশ্যাম অন্যায় কিছু বলেনি।

কিন্তু টাকার প্রশ্ন আছে। তাই শুধোয় সে—কত টাকা লাগবে রে? এযে অনেক টাকার কারবার।

ঘনশ্যাম সে খবরও নিয়েছে। কাকদ্বীপের জানাদের বাড়ির ছেলে তার বন্ধু। বাবার কথায় ঘনশ্যাম বলে—বেশী না। ব্যাঙ্ক লোন দেবে। নিজেদের ঘর থেকে লাগবে হাজার পনেরো-কুড়ি টাকা।

ভুবন মাইতি টাকার অঙ্কটা শুনে আশ্বস্ত হয়। আরও গভীরভাবে ভাবছে সে কথাটা। মহেশ যে ভাবে মাথা তুলছে তাতে মনে হয় ওর মতলব ভালো

নয়। ঘনশ্যাম তবু ব্যবসা করতে শুরু করলে কিছু আমদানি হবে। ভুবন মাইতি চায় মনে মনে ঘনশ্যাম এখানে থাকুক ওই সব কাজ নিয়ে। বলে সে—ঠিক আছে। তুই ভেবেচিন্তে ভাখ বাবু। যদি তোর মন চায়, কর লক্ষ।

গিরিবালা অবাক হয়। বলে সে—তোমাদের বাপ ব্যাটার মাথাই খারাপ হইল নির্ঘাস। নালি এমনি কাজ কেউ করে। ঘনারে গাং সাগরে পাঠাইবা তুমিই! যা করে মা গঙ্গা—আমার কথা তো কেউ নেবা না। যা ভালো বুঝ কর। করো গে।

ঘনশ্যাম খুশি হয়েছে। পিসির কথায় বলে,—এত ডরপোক কেন গো পিসি। দেখবে তোমার ঘনাকে ওই গাঙও ভয় পাবে।

কমলা সেই রাত্রির ঘটনার পর থেকে নিজেই যেন নিজেকে অন্য চোখে দেখে। নিজের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো পারা-ওঠা আয়নায় নিজেকে দেখছে। আগেকার সেই দুরন্ত পাতলা মেয়েটা কোথায় হারিয়ে গেছে, এখন যাকে দেখছে তাকে অচেনা মনে হয় কমলার।

দেহটা অনেক ভরাট, বুক, কাঁধ-হাতের ডৌল-এ এসেছে মাংসল পুরুষ্টতা। চোখের পাতায় বিচিত্র লজ্জা জড়ানো আবেশ। পাছা কোমর ভারি হয়ে উঠেছে। নিজের এই নতুন সত্বাকে দেখে চমকে উঠেছে আজকের কমলা। লজ্জা-কৌতূহল-নীরব চাঞ্চল্য জাগে সারা মনে।

সেই চঞ্চলা দুরন্ত বালিকা আর নেই, সারা দেহের গাং-এ যেন কোটালের বান ডেকেছে।

মায়ের গলা শুনে চমক ভাঙে কমলার।

বাসিনী হাঁক পাড়ে—কী এত করছিস লা ঘরের মধ্যে, রাজ্যির কাজ বাকি।

—যাই মা। কমলা অকারণেই বুকে কাপড়টা ঢেকে বের হয়ে এল। মা দেখেছে মেয়েকে। কমলা মায়ের চোখেও দেখেছে যেন নীরব কী ব্যাকুলতা। ওর চোখের আড়াল হবার জন্যই কমলা ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে বাইরের ঘরটা পরিষ্কার করতে চলে গেল।

মেয়েকে দেখেছে বসন্ত মাস্টারও।

বাসিনী বলে স্বামীকে—এবার বিয়ে থা'র চেষ্টা ভাখো, মেয়ের বাড় বলে কথা। তা কাকদ্বীপের ছেলেটির বাবার সঙ্গে কথা বলো?

বসন্তপণ্ডিত চেষ্টা করছে, কিন্তু কোন দিকে হালে পানি পাচ্ছে না।

টাকার দরকার। কিছু টাকা আশা করেছিল ভুবন মাইতির কাছে চাইবে। কিন্তু ইদানীং মাইতি কর্তার শরীর ভালো নেই আর ওর জমিটা হাতছাড়া হয়ে যাবার পর মাইতি কর্তাকেও কিছু বলতে পারেনি।

বসন্ত বলে স্ত্রীকে—দেখি চেষ্টা তো করছি কমলার মা, তবে কি জানো অনেক টাকার ব্যাপার। হুট করে এত টাকা পাই কোথায়?

বাসিনী মনে মনে কথাটা ভেবেছে। দেখেছে কমলা আর ঘনশ্যামের মেলামেশা, আর কমলাকে মাইতি কর্তাও ভালবাসেন। ঘনশ্যামের পিসীও ভালবাসে কমলাকে।

এখনও মাইতি কর্তার অবস্থা-নামডাক কম নয়। পাত্র হিসেবে ঘনশ্যাম সুপাত্রই। তাই বলে বাসিনী—একবার মাইতি কর্তার কাছে কথাটা পাড়ো না?

বসন্তও ভেবেছে কথাটা। তাই বলে সে—বলতে পারতাম তো, কিন্তু জমিগুলো বেদখল হয়ে গেল, মনমেজাজ ওর ভাল নেই। এখন টাকার কথা বলি কি করে?

বাসিনী স্বামীর দিকে চাইল।

মাস্টারি করে আর ছেলে পড়িয়ে লোকটার হুঁস বুদ্ধি যেন লোপ পেয়েছে। নাহয় চোখও নেই দেখার। বাসিনী বলে—টাকার কথা কেন বলবে।

—তবে? বসন্তপণ্ডিত একটু অবাক হয়ে চাইল স্ত্রীর দিকে।

বাসিনী বলে—মানে ঘনশ্যামের সঙ্গে কমলার বিয়ের কথাই বলো না? পালটি ঘর আর মাইতি কর্তাও ভালোবাসে কমলাকে। তুমি একটু বলে ত্যাখো না কথাটা।

বসন্তপণ্ডিত অবাক হয়! মাইতি কর্তার এখনও নামডাক আছে, বড় লোক। তার তুলনায় নিজে চুনোপুঁটি। তার মেয়ের ওই ঘরে বিয়ে দেবার সাধ্য নেই। বলে সে—বলছো কি কমলার মা! ওরা কি রাজী হবে?

কমলা ঘরে ঢুকবার মুখে থমকে দাঁড়িয়েছে। কথাটা তার কানেও গেছে। তার বিয়ের কথাই তুলেছে মা, ঘনশ্যামের নামটি শুনে চমকে উঠে কমলা। সারা মনে কি সাড়া জাগে। এ যেন তার কাছে একটা স্বপ্নই। বিচিত্র একটি স্বপ্ন

কমলা শিউলিকে দেখে চাইল। এগিয়ে আসে শিউলি।

—কিরে।

শিউলির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সামনের মাসেই বিয়ে। শিউলি বলে—তোকে ডাকতে এলাম। বাবা শহর থেকে বিয়ের বাজার করে এনেছে, শাড়ি টাড়ি—সব। চল—দেখতে যাবি না।

কমলা অন্য সময় হলে খুশিতে নেচে উঠতো। আজ ঠিক খুশী হতে পারে না। শিউলি বিয়ের কথায় যেন দেমাকে ফুলে উঠেছে। বর তো কাজ করে চটকলে, তার গুমোর। কমলার মনে হয় সেও জানাবে তা'র বিয়ের কথাটা। ঘনশ্যামের সঙ্গেই বিয়ে হবে তার।

কিন্তু কী ভেবে এত বড় খবরটা চেপে গেল সে। ওকে নিরাশ করতে চায় না। বলে কমলা—চল। দেখে আসি।

কমলার কুমারীমনও আজ নতুন একটি স্বপ্ন দেখে।

ঘনশ্যামকে ক'দিন দেখেনি কমলা।

কী কাজে শহরে গেছে সে। মাইতি কর্তা শেষ অবধি ছেলের কথাতেই রাজী হয়েছে। লঞ্চের ব্যবস্থাই করেছে সে। তাই নিয়ে ব্যস্ত আছে ঘনশ্যাম।

কমলা খুঁজছে ঘনশ্যামকে।

তাদের দুজনের অগোচরে যে কমলার বাবা-মা একটা বিচিত্র কথা ভাবছে এটা জানাতে চায় কমলা, কিন্তু ঘনশ্যামের দেখা নেই।

এখানে বালুচরের বিস্তার নিয়ে খাড়িটা পড়ে আছে, দূরে দেখা যায় মহেশ মান্নার আড়তের টিনের ঘরগুলো, কিছু নৌকা ফিরছে দূর গাং থেকে, ঢেউ-এর মাথায় নাচছে ডিঙিগুলো—পাল তুলে ওরা তীরের সন্ধানে আসছে।

আসছে অনেক নৌকা—তবু ঘনশ্যামের দেখা নেই।

পারঘাটার বড় বড় নৌকা থেকে কতলোক নামছে, কিন্তু ঘনশ্যাম ফেরেনি। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ঘনশ্যাম। কে জানে হয়তো কলেজেই পড়তে চলে গেছে ঘনশ্যাম তাকে না জানিয়ে। কী নীরব অভিমানে মন ভরে ওঠে কমলার।

—এখানে কি করছো কমলা?

হঠাৎ কার ডাক শুনে চাইল কমলা। মহেশ মান্না তার মাছের আড়তে যাচ্ছিল এই পথ দিয়ে, কমলাকে দেখে বালিয়াড়ি ঝাউবনের এদিকে এগিয়ে আসে মহেশ।

সমুদ্রের ঢেউগুলো ভাঙছে বালুচরে, ঝাউবন গজিয়েছে তটভূমিতে,

হাওয়ায় শন্‌ শন্‌ সুর ওঠে, দূরে দেখা যায় বাঁধের ওপাশে জেলে বসতির ঝুপড়িগুলো। জাল শুকুচ্ছে—নাইলনের জালগুলো।

মহেশ মান্না এখানে আসবে ভাবতে পারেনি কমলা। মহেশ বলে—একা একা এখানে কাকে খুঁজছো নাকি?

মহেশ জানে মেয়েটা কাকে খুঁজছে। কমলা বলে—না। এমনই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

মহেশ আর কী যেন বলতে যাবে, কিন্তু কমলা দাঁড়ায় না। এগিয়ে চলে জেলেবসতির দিকে, একটু জোরে জোরেই চলছে সে। ভয় ভয় করে লোকটাকে।

মহেশ কী ভেবে আর এগোল না। দেখছে মেয়েটিকে। বাতাসে উড়ছে ওর আঁচল, বুকের কাপড় অগোছালো—নিটোল ঘাড—পিঠের সুঠাম ভাবটা—ওর চলার ছন্দ যেন ঝড় তুলেছে মহেশের মনে।

মেয়েদের চোখ বোধহয় পিছনেও থাকে, না হয় পুরুষের লোভী দৃষ্টির জ্বালাটা তাদের গায়ে বাজে, জ্বালা বোধ করে। তাই কমলার মনে হয় লোকটা তার দিকে চেয়ে রয়েছে তখনও। ঝাউবনের আড়ালে সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চায় সে এই বিরক্তিকর অনুভূতি থেকে।

—কিগো মান্নাবাবু! মাছের আড়ত ওদিকে না ইদিকে গ? হাসছে কদম।

যৌবনউত্তাল দেহে সাড়া জাগে। কদমের ডাকে চাইল মহেশ, যেন তখনও দেখা যাচ্ছে কমলাকে, ঝাউবনের ভিতর চলে যাচ্ছে মেয়েটা।

কদমের ডাকে চাইল মহেশ। কদমও দেখেছে ব্যাপারটা।

মহেশ মান্নাকে চিনতে বাকী নেই কদমের। অনেক জ্বালায়, অনেক দুঃখের আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে কদম। অনেকের কামনার আগুন ওর মনকে জ্বালিয়েছে। মহেশ মান্নাকে তাই চেনে সে।

জেলে পাড়ার অনেকের ঘরেই রাতের অন্ধকারে হানা দেয় মহেশের লোকজন, কেউ প্রতিবাদ করে। কেউ অন্ধকারে চেয়ে থাকে ওর লোকের দিকে।

এখানের জেলে বাওয়ালিদের ঘরের মেয়েদের জীবন-যৌবন ওদের কাছে বিকিকিনির বস্তু, আঁধারের হাটে ওরা তার খদ্দের। জলে যায় এদের মরদরা, তুফান-ওঠা গাং-এ ওদের নৌকাগুলো মাতাল হয়ে ফেরে। কোন দিন ফেরে বিপর্যস্ত হয়ে, কোন দিন স্থির সমুদ্রের খাড়িতে নৌকাগুলো

সমুদ্রের রূপালী ফসল নিয়ে ফেরে। ওদের পালের মাস্তুলে ওড়ে পতাকাগুলো। জেলেপাড়ার মেয়েছেলেরা সানকিতে পান্তা-নুন-পিঁয়াজ মাটির কলসীতে মিঠে জল নিয়ে বালুচরে এসে নামে। কলরব ওঠে।

উজাড় করে দেয় মাছগুলো। ভেটকি-পমফ্রেট-ইলিশ-পারসে-রূপাপেটিয়া-ভোলা-ভেটকি বর্ণবিচিত্র বাগদা চিংড়ির পশরা। মহেশ মান্না খুশী হয়।

জেলের দল পায় সামান্য কিছু, আর সিংহভাগ যায় মহেশের আড়তেই। তবু জেলেদের জালে যেতে হয়, ঝড় তুফানে একদিন আর ফেরে না। সমুদ্র তাদের গ্রাস করে নেয়। তবুও বাওয়ালীরা যায় বাদাবনে, সুন্দরবনের কাঠ-মধুর নেশায়। সেখানের জলে কুমির, কামট, বনে বাঘ, সাপ। বাওয়ালীরাও বনে পড়ে থাকে কাঠ কাটতে। কেউ যায় বাঘের পেটে—কেউ ওই গহন গাং-এ হারিয়ে যায়।

জেলে বাওয়ালীর বউ তাই, স্বামী জালে না হয় বাদাবনে গেলে তেল দেয় না মাথায়, আউড চুলে ঘোরে, সাঁঝ পিদীম জেলে বনবিবি বাবা দখিনরায়ের থানে মাথা ঠোকে—ঘরের মানুষটেরে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরিয়ে দাও।

কেউ ফেরে—কেউ ফেরে না।

আকাশে মেঘ, ঝড় উঠলে জেলে বৌ—মেয়েরা সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে, নীল গাং সাদা ফেণার শাসানিতে ফুঁসে ওঠে। কোথায় নৌকাগুলো টাল-মাটালে পড়েছে কে জানে।

তারপর ঝড় থামে, দু' একটা করে নৌকা ফেরে শূন্য হাতে, মাছ ধরার জাল ফেঁসে গেছে, হাল ভেঙেছে, কারোও পাল ছিঁড়েছে। দু' একটা নৌকা লোকজন সমেত তলিয়ে গেছে।

মহেশ মান্না গজরায়—সমস্ত লোকসান করে দিলি; কত টাকার মাল বরবাদ হ'ল জানিস নিশা?

নিশাকর সর্দার রাতভোর গাং-এর নোনা পানির সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, ক্লান্ত দেহ, চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। মাথার চুলগুলো নোনা ভাব, খড়ি ফুটেছে গায়ে মাথায়। চোখে তখনও অকূল গাং-এর মাতাল রূপটার ছবি মিলোয় নি। মনে পড়ে কয়া ঢেউগুলো ফাটছে—উঁচু কালো ফুলে ফেঁপে ওঠা ছন্দছুট ঢেউটা ভেঙে পড়লো ললিত-সজনীদের নৌকার উপর।

একটা আর্ত চিৎকার অসমাপ্ত থেকে গেল, হারিয়ে গেল ওরা নৌকা সমেত। তিনটে নৌকা মারা গেছে। মারা গেছে ছ'টা তরতাজা জোয়ান। ভেসে গেল তাদের পরিবার পরিজন।

জেলেপাড়ায় ওঠে কান্নায় আর্তরোল। সেই চিৎকার কানে আসে।

নিশাকরের আপনজন তারা। বুক চাপড়ে কাঁদছে কদমও। তার মানুষটাও ফেরেনি।

নিশাকরদের চোখের জল যেন শুকিয়ে গেছে।

গর্জে ওঠে নিশাকর—এতগুলো মানুষ মরি গেল তার জন্মে শোক, দুঃখ নাই মহাজন, তুমি ভাবছো জালির কতা, নৌকার কতা। গাং-এ বুড়ে আছে তোমার জাল—লা, যাও খুঁজি আনো গে।

মহেশ মান্না বলে—রাগ করলি নিশাকর! বল—লোকসান হইনি?

কদম জানে ওদের কাছে তাদের মানুষগুলোর দাম কানাকড়ি। আবার রাতের আঁধারে ওরাই আসে। কত মিষ্টি কথা শোনায়, টাকা দেয়, কাপড় দেয়। ওই মহেশ মান্নার মত মানুষ তাদের ইজ্জৎ কিনতে।

কদম আজ মহেশ মান্নাকে কমলার দিকে ওইভাবে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখে বলে।

—কি গ মান্নামশাই আবার উদিকে কেনে? আমাদের দিকে নজর কি চলি গেল, না আমাদের গা গতর পান্‌সি ঠেকছে।

মহেশ মান্না চতুর লোক। গভীর জলের মাছ। সহজে ধরা দিতে চায় না। বলে সে—কী যে বলিস কদম! তোর যতো আন্‌-সান্‌ কথা। তা মাছ বিচতে যাবি গঞ্জে?

কদমের ঘরের মানুষটা গাং-এ চলে যাবার পর থেকে বাবার বেহাতে কদমকেই ওই মাছ বেচাব কাজে নামতে হয়েছে। বলে কদম।

—না গেলে খাতি দেবে কে গ। যাই আড়তে—গজু যদি মাছ টাছ দেয় কিছু। আর বাপু—সেটাও মহা বদ। তার কতা বলি মহাভারত হই যাবে।

—কেনে রে?

কদম বলে ওঠে চোখ মটকে—যেমন গুরু তেমনি চ্যালা গ। উ শালাও তেমনি।

মহেশ মান্না হাসছে।

জানে সে, গজেনও জেলেপাড়ায় ঘোরে রাতের অন্ধকারে। দুজনেই যেন শেয়ালের জাত। সবাই শিকারের সন্ধানে ঘোরে বুভুক্ষু দৃষ্টি নিয়ে।

কদম বলে—যা করছো করো, তা বাপু গেরস্ত ঘরের বৌ ঝিদের দিকে নজর দিও না। মাস্টারের মেয়েটা কি দোষ করলো?

মহেশ মাল্লা এড়িয়ে যায়—কী যে বলিস।

গাঙ-এর বুক থেকে মেছো নৌকাগুলো ফিরছে আড়তে। এ সময় কারবার জমে ওঠে, মহেশ চলে গেল আড়তের দিকে। কথাটা তার মনের অতলে পাক দেয়।

মেয়েটাকে দেখেছে আজ নতুন কি চোখে। ধীরে ধীরে এগোতে হবে তাকে।

হঠাৎ চিলের তীক্ষ্ণ চীৎকারে চাইল। বালিয়াড়িতে ছায়া পড়েছে, ধাবমান উড়ন্ত চিলের ছায়া, বালির বুক থেকে একটা লাল কাঁকড়া নধর দেহ নিয়ে বের হয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল। মাটির নিচেকার ঠাণ্ডা থেকে রোদে এসে উত্তাপটুকু গায়ে মাখছিল কাঁকড়াটা।

ছায়াটা ছোঁ দিয়ে নামছে—ধারাল নখ ঠোঁট বের করে, তুলে নিয়ে যাবে শিকারকে, কিন্তু কাঁকড়াটাও টের পেয়ে তার পাগুলো বের করে দৌড়চ্ছে বালির উপর দিয়ে। ছায়াটা নেমে আসছে।

থমকে দাঁড়ালো মহেশ।

প্রকৃতির মাঝে খাদ্য-খাদকের এই লড়াই দেখেছে সে। ছায়াটা মাটি ছুঁয়েছে—সেই মুহূর্তেই কাঁকড়াটাও একটা গর্তে সেঁদিয়ে গেছে। ব্যর্থ নিষ্ফল সোনালী চিলটার তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে ওঠে।

টাঁা—টাঁা।

মহেশ হেসে ফেলে—ধ্যাৎ শালা অকম্মা।

কমলা ঝাউবনের নিভৃতে এসে দাঁড়ালো।

তখনও তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মহেশ মাল্লার গোল মত মুখখানা। দুটো চোখের সেই লুব্ধ চাহনিতে ভয় পেয়েছিল সে। ঝাউবনে হাওয়া কাঁপে, সমুদ্র ফুঁসে চলেছে সমানে।

মনে হয় এত বড় সীমাহীন পৃথিবীতে সে নিঃসঙ্গ, একা। তার সব কিছু হারিয়ে গেছে। ঘনশ্যামও নেই। তাকে না বলেই চলে গেছে সেও।

কূলহারা সমুদ্রের তীরে সে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। দু'চোখ জলে ভরে আসে।

শিউলি তার চেয়ে অনেক ভাগ্যবতী, তার বিয়ে হবে—একটি তরুণ আসবে তাকে নিতে, আর কমলার জীবনে কেউ নেই।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ আকাশ কাঁপানো শব্দে চমকে ওঠে কমলা।

লঞ্চের হর্ণ বাজছে। নীল জলে ঢেউ-এর মাথায় এগিয়ে আসছে সুন্দর সাদা লঞ্চটা। রোদে ঝক ঝক করে। গলুই-এর মাথায় দোতলার সারেং-এর

ঘরের সামনে আশপাশে গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে সাজানো।

নতুন লঞ্চটা রাজহাঁসের মত ঢেউ কাটিয়ে ছুটে আসছে হর্ণ বাজিয়ে। বালিয়াড়ির উপর মহেশ মান্নার আড়তে জমা মেছো ডিঙি থেকে কারা হাত নাড়ছে—মাথার গামছাগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে লঞ্চটাকে।

কমলার বোধ হয় মহেশ মান্নার লঞ্চ!

সরে আসছে সে, হর্ণটা বেজে ওঠে। লঞ্চের তুখানি ঘর থেকে হাঁক পাড়ছে ঘনশ্যাম—হেই-ই—কমলা—হেই-ই—

চমকে ওঠে কমলা। লঞ্চের ইঞ্জিনের গুরু গুরু শব্দ ছাপিয়ে ওই ডাকটা কানে আসে। ঘনশ্যাম নিজে ষ্টিয়ারিং ধরে চালাচ্ছে লঞ্চটা।

—ঘনশ্যামদা!

ঘনশ্যামকে দেখবে ওখানে ভাবেনি কমলা। অবাক হয়েছে সে। পরক্ষণেই ঝাউবন থেকে বের হয়ে বালিয়াড়ি থেকে নেমে সেও দৌড়চ্ছে ঘাটের দিকে।

নিশাকর সর্দার-রতন-যতীন-গুপী-কদম-জেলেদের অনেকেই এসে জুটেছে। হাজির হয়েছে জেলেপাড়ার আধ-নেংটো ছেলের দল। কৌতূহলী চোখে ওরা দেখছে লঞ্চটাকে। ঝকঝক করছে রোদে।

ঘনশ্যামের সঙ্গী মটরা আর পটল রয়েছে লঞ্চে। ওদের পরনে নতুন কেনা প্যাণ্ট, গেঞ্জি। ঘনশ্যাম-এর রূপও বদলে গেছে। প্যাণ্ট গেঞ্জি পরা, কপালে সিন্দুর লাগানো চেহারার দিকে চেয়ে কমলা অবাক হয়। দৌড়ে গিয়ে দেখছে সে, লঞ্চটা তীরে এসে ভিড়ছে। বলে কমলা—এ-কী সেজেছো? কাদের লঞ্চ?

ঘনশ্যাম চীৎকার করে—মটরা পাটা লাগা!

এর মধ্যে মটরা গলুই-এর মাথা থেকে মজবুত বিট লাগানো তক্তাটা বালিতে আড় করে লঞ্চ থেকে মাটিতে নামিয়ে হাতের লগিটা পুঁতে বলে—উঠে এসো গ দিদি! অ সর্দার—রতনদা! ধরো লগিখান্ ধরো শক্ত করি, সিদানে পা দিই ওঠো।

কমলা উঠে যায় লগি ধরে। নিশাকর-রতনরাও উঠেছে। দেখছে ওরা লঞ্চটাকে। বেশ বড় মজবুত লঞ্চ। নতুন রং-এর গন্ধ ওঠে। বিচিত্র ঝাঁঝালো গন্ধ।

কমলা নিচে ঝকঝকে বড় ইঞ্জিনটার দিকে চেয়ে থাকে, একটা যন্ত্রদানব যেন বন্দী হয়ে আছে কি বিপুল শক্তি নিয়ে।

নিশাকর দেখে শুনে বলে—জব্বর লঞ্চ বানিয়েছো গো ছোটবাবু। ঝড় তুফানেও কাবু হবেনি। মাছ-এর নৌকাগুলানের সাথি যদি পেতাম সাগর উজাড় কত্তাম গো।

হাসছে ঘনশ্যাম। বলে সে—কার জন্যে সাগর উজোড় করে মাছ ধরবে সর্দার। সবতো যাবে রাঘব বোয়াল শ্লা মহেশ মান্নার গব্বে। নিজেরা যদি কিছু করতি পারো—ভেবে দেখো।

কথাটা ওরাও ভেবেছে। দেখেছে তাদের আনা রাশি রাশি মাছ বেচে তারা কি পায়? দিনরাত গাং-এ ঘুরে—জল-ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ হাতে নিয়ে, মাছ ধরে আনে।

আর মহেশ মান্না যা দাম দেয় তার থেকে জাল ভাড়া, দাদনের টাকা, খোরাকী এসব বাদ দিয়ে ধুতে বাছতে ওই আঁশটুকুই পড়ে থাকে। নিজেরা অন্য আড়তে মাছ নিয়ে যেতে পারে না। কারণ ওদের টিকি বাঁধা আছে মহেশ মান্নার কাছে ঋণের দায়ে। সে ঋণ কোনদিনই শোধ হবে না।

নিশাকর বলে—করতে তো চাই ছোটবাবু, তা পারি কই।

—কেন?

রতনও ভেবেছে কথাটা।

নিশাকর বলে—সন্ঝাবেলায় আসবো বাড়িতে, ইথন উকথা হবে নি। যাই, মাছের হিসেব নিকেশ করতে হবে।

ওরা চলে যেতে কমলা এবার শুধোয়—তোমার লঞ্চ নাকি? হ্যাঁ গো—

ঘনশ্যাম-এর দু'চোখে খুশীর আভাস জাগে। বলে সে—কেন হতে নাই? এর জন্যেই তো দশ বারো দিন শহরের ঘাটে পড়ে ছিলাম রে। বানিয়ে নিজে চালিয়ে নে এলাম। ক্যামন হয়েছে বল দেখি?

—খাসা হয়েছে। কমলা কলকলিয়ে ওঠে খুশীতে।

ঘনশ্যাম তাহলে যাবে না এখান থেকে। খুশী ভরে কমলা শোনায় —গাং-এ আসছে একেবারে রাজহাঁসের মতন, যেন ঢেউগুলো এর নিচে এসে ভেঙ্গে পড়ছে।

ঘনশ্যাম বলে—তাই পড়বে।

কাচের ঘরটায় বসে গোলমত পিতলের স্থখানিটা দেখছে কমলা, চাকার মত ঘুরছে ওটা। হাতের কাছে একটা হর্ণ—কৌতূহল ভরে টিপতে বিকট আওয়াজ করে নিস্তব্ধ গাং-ঝাউবনের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

ঘনশ্যাম হাতের কাছে দড়িটায় টান দিতে নিচে টং টং করে ঘণ্টা বেজে ওঠে। পরক্ষণেই সারা লঞ্চ কাঁপিয়ে বিকট গর্জন করে ইঞ্জিনটা সচল হয়ে ওঠে।

ঘনশ্যাম লঞ্চটা ব্যাক্ করিয়ে গাং-এর দিকে নিয়ে চলেছে। পিছনে শান্ত গাং-এর জলে আলোড়ন জাগে। ঢেউ-এর মাথায় লাফ দিয়ে ছুটে চলেছে লঞ্চটা। তীরের গাছগুলো যেন ছুটছে।

কমলার চোখে মুখে বিচিত্র হাসি জাগে।

লঞ্চটা চলেছে নীল গাং-এর জল কাটিয়ে।

মহেশ মান্না আড়ত থেকে সব ব্যাপারটাই দেখেছে। দেখেছে কমলা তাকে দেখে দাঁড়ায়নি, কি যেন অবজ্ঞা ভরেই তার সামনে থেকে চলে গেছলো। তাকে এড়িয়ে গেছলো।

সেই মেয়েটা ঘনশ্যাম আর তার লঞ্চটা দেখে মত্ত খুশীর আবেগে দৌড়ে এসেছিল, তার দেহে মনে লজ্জার জড়তা নেই, নিটোল দেহটা ছন্দে ছন্দে দুলছে, কাঁপছে ওর উদ্ধত বুক। খুশির খেয়ালে শাড়িটা হাঁটুর উপর তুলে ফর্সা পায়ের ডিম বের করে লঞ্চে উঠেছিল।

হাসছে মেয়েটা আর ঘনশ্যাম।

নিশাকর অন্য জেলেরাও গেছলো লঞ্চ দেখতে। তারা নেমে আসার পর ঘনশ্যাম আর কমলা দু'জনে লঞ্চে করে নীল গাং-এর বুকে সাড়া তুলে চলেছে। তখনও দেখা যায় কমলাকে।

সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ছে ওর এলোমেলো চুল-শাড়ির আঁচল। বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তবু খেয়াল নেই। মহেশ মান্নাকে যেন ওরা চেনে না। আমলই দেয় না।

মহেশ মান্নার বাহন গজেন বলে,—ঘনশ্যাম তাহলে লঞ্চ কিনলো? তা বাবু—লঞ্চটা ভালোই কিনেছে শোনলাম, নিশাকর বলছিল।

কথাটা মহেশ মান্নার পছন্দ হয় না। সে ধমকে ওঠে—ওদিকে মাছ ওজন হচ্ছে—এদিকে তুই লঞ্চ দেখতে এলি? এ্যাঁ এই তোর কাজ!

গজেন দেখছে মালিককে। মালিক খুশী হয় নি তা বুঝেছে গজেন। তাই বলে সে—মাছ ওজন শেষ হই গেল। হিসেব করছে ওরা, তাই ডাকতি এলাম আপনাকে।

—চল!

মহেশ মান্নার খেয়াল হয় কথাটা। হিসাবের ব্যাপারে কারচুপি করতে

হবে তাকেই। ওই আনন্দে এখনকার জ্বালাটাকে ভুলতে চায় সে। আর একটা কাজে হাত দিয়েছে সে—সেটাকে এবার তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে কয়েকজন বশংবদ ছেলেকেও কাজ দিতে পারবে।

বসন্ত পণ্ডিত পাঠশালায় পড়াচ্ছিল ছেলেদের। আবাদের বেশ কিছু ছেলেমেয়েরা আসে। লম্বা একটা চালাঘরের দু'তিনটে ঘরে এক এক শ্রেণী, মাস্টার বলতে সে একাই।

শুনেছে সরকার এবার স্কুলে সাহায্য করবে।

তার পাঠশালার দৈন্যদশা ঘুচবে।

ঘরটাকে সারাতে হবে। আবাদের চাষী, গঞ্জের ব্যবসায়ীদের কাছে কিছু খড়-টাকাকড়ি চেয়ে নিয়ে এতাবৎ কোনরকমে টিকিয়ে রেখেছে মাটির ঘরটাকে।

এবার ওপাশে নতুন ইস্কুলের ঘর উঠছে।

বসন্ত পণ্ডিতের মনের অতলে একটা তৃপ্তি জাগে। তার হাতে গড়া পাঠশালায় ফি বছর বেশ কিছু ছেলেমেয়ে বৃত্তি পেয়েছে। কমলাও বৃত্তি পেয়েছিল। কিন্তু বাইরে রেখে পড়াবার সাধ্য তার নেই। তাই কমলার আর পড়া হয়নি।

এবারও কিছু ছেলেমেয়ে বৃত্তি পাবে।

সেবার এক ইনসপেক্টার বলেছিলেন—এই আবাদে আপনিই বিদ্যার দীপশিখা জ্বেলেছেন পণ্ডিতমশাই।

....পাঠশালা বড় হবে, 'বসন্ত বিদ্যামন্দির' নাম হবে তার।

হঠাৎ কলরব শুনে চাইল।

গবু শির পড়ুয়াদের অন্যতম। সেই-ই খবরটা আনে।

—পোন্‌শাই, ঘনাবাবু গো—কি বাহারের লঞ্চ কিনি আনছে, ঘাট আলা করি আছে। ইয়া লঞ্চ—একেবারে সাহেবদের লঞ্চের মতন।

ছেলেদেরও কৌতূহল জাগে।

বসন্ত পণ্ডিত খুশি হয় ঘনশ্যামের সুখবরে।

তাই ছুটি হয়ে গেল আজ পাঠশালার। দৌড়ালো ছেলেদের দল ভেড়ি ধরে পারঘাটার পানে। বসন্ত পণ্ডিতও চলেছে।

দূরে ঘাটে নৌকা-ডিঙি-মালটানা ঢাউস চৌধুরী নৌকার ভিড—তার ওদিকে লঞ্চটা রাজহাঁসের মত দাঁড়িয়ে আছে ঘাট আলো করে।

ভুবন মাইতিও দেখছে লঞ্চটা।

অঘোর সরকার বলে—তা জিনিসখান্ মন্দ হয় নি গ কত্তামশায়।

—হুঁ।

ভুবন মাইতি টাকার হিসাব করছে। অনেক টাকা নিয়েছে ঘনশ্যাম, তাছাড়া ব্যাঙ্ক লোনও আছে। ঘনশ্যাম বলে—ওর জন্য ভেবো না বাবা। সব টাকা শোধ দিয়ে দেব। মাল বইতে বইতে সময় পাবো না। কত কাজ দেখবা।

বসন্ত পণ্ডিতও এসে পড়েছে। লঞ্চটা দেখে সে খুশি হয়েছে। বলে সে—তা সাগরদ্বীপে তবু তুমি লঞ্চ করলে ঘনশ্যাম। এ জিনিস তো কারো নাই এখানে।

ভুবন মাইতি বলে,—এবার মন দিয়ে কাজকর্ম কর বাপু। এত টাকার দায় ঘাড়ে নিলি!

নরহরি ভটচাযও এসে জুটেছে। শীর্ণ লিকলিকে ভটচায একা আসেনি, সঙ্গে করে এনেছে পাথর বাটিতে লাল শালুর টুকরো ঢাকা দিয়ে শালগ্রাম শিলাকেও।

নরহরি ভটচাযের হাতিয়ার অনেক। ওই শালগ্রাম শিলা আর গঙ্গাসাগর মেলার সময় তার বাহন হয় বাড়ির এঁড়ে বাছুরগুলো। তার ন্যাজ ধরিয়ে যাত্রীদের বৈতরণী পার করায় কিছু কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে।

আজ শালগ্রাম শিলা এনে নরহরি হাঁক পাড়ে—মা গঙ্গা কি জয়। জয় বাবা কপিলমুনি। তোমার লঞ্চ এসেছে শুনে চলে এলাম বাবাজী। একবার পুজো নিবেদন করে দিই, লঞ্চে নারায়ণের পাদস্পর্শ ঘটিয়ে নাও বাবাজী।

ঘনশ্যাম বলে—ওতো নুড়ি ঠাকুরমশাই। হাত পা কই যে পাদস্পর্শ ঘটাবে।

চমকে ওঠে নরহরি! একথা বলতে নাই ঘন। শিলারূপী নারায়ণ! পুজো করতে হয়।

ভুবন শেষ রক্ষা করে বলে—তাই করে এসো ভটচায। শুভ কাজে বাধা দিতে নেই ঘনা! যাও হে ভটচায।

তবু কিছু দক্ষিণার ব্যবস্থা হ'ল! না হলে নরহরি ওই ঘনশ্যামের নাস্তিকের মত কথায় চটে উঠেছিল। সত্যিই পাষণ্ড ওটা। নরহরি ভটচায মনের রাগ চেপে লঞ্চে ওঠে পুজো করতে।

গিরিবালা-কমলাও এসেছে পুজোর আয়োজন নিয়ে। সবদিক থেকে অনুষ্ঠান মোটামুটি উৎরে যায়।

বসন্তপণ্ডিত এবার একটু ভরসা পায় মনে মনে।

সে চায় ভুবন মাইতি একটু থিতু হোক, ঘনশ্যামও কারবার চালু করুক, সে এবার বিয়ের কথাটা বলতে পারবে।

দ্বীপের মানুষগুলোর বসতি বাড়ছে, জমি এতদিন অনেক ছিল। নতুন মানুষজন এসে এখানে ওখানে বসতি করেছে, সেদিককার কিছু জমিকে বন কেটে জঙ্গলমুক্ত করে, ভেড়ি বাঁধ দিয়ে জমি হাসিল করেছে। তখন জমি থেকেই ভরণপোষণ-এর ব্যাপার চালিয়েছে। সে আজ বেশ কয়েক বৎসর আগেকার কথা।

ক্রমশঃ জমির মাত্রা প্রায় শেষ হয়েছে, আর বেশ কিছু হাসিল জমি দ্বীপের দু' চারজন মাত্র লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে। তাই একটা গোষ্ঠীও গড়ে উঠেছে। নতুন জোতদার গোষ্ঠী।

প্রতাপপুরের ভূধর জানা, কচুবেড়িয়ার কন্দর্প মাহাতো। রুদ্রনগরের গদাই রায় আরও দু' একজন। এদের মধ্যমণি হয়ে উঠেছে মহেশ মান্না।

আর তাদের আশেপাশে কিছু ছেলেও জুটেছে। নটবর লেখাপড়া শিখে বেকারই রয়ে গেছে। বেশ কয়েকশো ছেলে বিভিন্ন গঞ্জে ছিটিয়ে আছে। কেউ হাটে দোকান করার চেষ্টা করে—এটা সেটা করে। আর সেই সঙ্গে দ্বীপে এসে অনুপ্রবেশ করেছে রাজনীতির বিষাক্ত পরিবেশ। মানুষের অভাব-সমস্যাগুলো বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, বেকারত্ব ঘটার সঙ্গেই এটার নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

তাই শান্ত সাগরদ্বীপের মানুষও এবার এই পথেই তাদের সুরাহার আশ্বাস খুঁজছে।

নটবর তাই আসে মহেশ মান্নার কাছে।

মহেশ মান্নাও দেখেছে বিভিন্ন জায়গার হাটতলায়—গঞ্জের মাঠে মিছিল জমায়েত হচ্ছে, আর নটবর সেখানে তেজস্বিনী ভাষায় লেকচার দেয়।

নটবর, প্রতাপপুরের মদন আরও দু' একজন এইসব ব্যাপারে এগিয়ে আসে। মাঝে মাঝে বি-ডি-ও অফিসেও যায় তারা শোভাযাত্রা নিয়ে। এর মধ্যে হাটতলাতেও লোক জমায়েত করে তারস্বরে বক্তৃতা দেয়।

—সাধারণ মানুষের কথা ভাবতে হবে। এই দ্বীপের মাটি ফল-ফসলে তাদের বাঁচার অধিকার আছে। সেই অধিকার দিতে হবে।

সেবার চাষের মরশুমে প্রতাপপুরের ক্ষেতমজুরদের নিয়ে হাটতলায় সভা করে নটবর। বলে—খোরাকির ধান আগাম না দিলে চাষের কাজে তারা নামবে না।

আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে।

বর্ষাকালে এই দ্বীপের আকাশ ছেয়ে যায় মেঘে মেঘে, এক নাগাড়ে বৃষ্টি নামে, ঝড়ো হাওয়ার মাতন জাগে, উথাল পাথাল সেই ঝড়। মাঠের বীজ ধানগুলো বড় হয়ে উঠেছে। ক্ষেতে চাষ দেওয়া হয়েছে, এখন জল জমেছে। লাঙল দিয়ে কাদা করে এবার সেখানে ধান রোপণ করলেই মাঠ ছেয়ে ধান চারাগুলো জেগে উঠবে সবুজের স্বপ্ন নিয়ে।

কিন্তু মাঠে মজুররা নামছে না, খবরটা ছড়িয়ে পড়ে রুদ্রনগর-কচুবেড়িয়ায় মহেশ মান্নার কাছে। অনেকেই এবার ধুয়ো তুলছে মজুরীর ধান বাড়াতে হবে। তাই নিয়ে দখিনের মাঠে মহেশ মান্নার অনুচর গজেনের সঙ্গে দেগাঁয়ের বিষ্টু-হরিহরদের হাতাহাতি হয়ে যায়।

ঘনশ্যাম এসব ব্যাপারে থাকে না।

সে ইদানীং লঞ্চ নিয়ে এখন মালপত্র বইছে, মাছের নৌকাওয়ালাদের মাছ নিয়ে যাচ্ছে ডায়মণ্ডহারবারে। সেই ঘনশ্যাম হঠাৎ সেদিন নিজেদের মাঠের কাজ দেখতে গেছে।

ভুবন মাইতি বলে—চাষ লেগেছে, এসময় মাঠে লোকজন খাটছে, তুই দু'একবার যা, দেখে শুনে আয়। এই জল কাদা ঠেলে আমার যাবার সাধ্যি আর নাই।

তাই মাঠে গেছে ঘনশ্যাম।

আর ওদিকে গজেনকে ওই হরিহর-বিষ্টুদের মারতে দেখে এগিয়ে যায়। বিষ্টু বলে—কাজ যদি না করি হে।

—তোর বাপ্ করবে। গজেন গর্জে ওঠে ওকে থাপ্পড় লাগায়। গজেনের সঙ্গেও দু' একজন এসেছে। গুপী মালো বর্ষার মুখে আর গাং-এ মাছ ধরতে যায়নি। গজেনের সে অনুগত। সেও হাঁক পাড়ে—দোব শালাদের মাথা ফাটিয়ে। কাজ করবে না—নাম শালারা মাঠে। তোদের বাপকে খাটাতি হবে।

ঘনশ্যামও এগিয়ে যায়। বিষ্টু জলে কাদায় পড়ে আছে। লাঠি তুলেছে তার ওপর নিতাই সর্দার। গজেন চীৎকার করে—মার শালাকে।

—খবরদার। খবরদার মারবে না ওকে।

গজেন দেখে ঘনশ্যাম এগিয়ে আসছে। তার পিছনেও দু' চারজন মজুর রয়েছে। পাশে রয়েছে লঞ্চের লস্কর রেঞ্চ হাতে ওর লঞ্চের দু'খানি মটরা। যাঞ্ঝারকুটে গুণ্ডা।

বিষ্টু আর্তনাদ করে—দেখুন ঘনাবাবু, খামোখাই মারতি লাগলো উরা।

গজেন তবু ধমকায়—মারবে না?

—না। ওকে মারবে না। ঘনশ্যাম শোনায়—জোর করে কাজ করাবে কেন? ওকে মারলে আমিও তোমাকে ছেড়ে দেব না গজেন। কাদার মধ্যে পুঁতে দেব।

গজেনের মান সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় পেছু হঠলে তার প্রতিপত্তি থাকবে না এই মহলে। তাই গজেন জানায়—তুমি এর মধ্যে আসবে না ঘনাবাবু। এলে ভালো হবে না। নিতে—টেনে নামা শালাদের।

নিতাই এগিয়ে আসতে ঘনশ্যামের একটা লাথি খেয়ে ভেড়ির ওপর থেকে কর্দমাক্ত জমিতে এসে জলে কাদায় ছিটকে পড়েছে।

ঘনশ্যাম বলে—যে আসবে তাকেই ওইখানে ফেলে দেব।

গজেন থেমে গেল।

ঘটনাটা তখন ডালাপালা গজিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম গঞ্জে। প্রতাপপুরের নটবরও শুনেছে। সাগরদ্বীপের সাধারণ মানুষও মনে মনে খুশী হয়।

কথাটা নানা মহলে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

মালো জেলে ক্ষেতমজুরদের মহলে একটা সাড়া আনে, গজেন বেশ রেগে মেগেই মাঠ থেকে ফিরছে, আহত নিতাই আর লোকজনদের নিয়ে। কদম দেখেছে গজেনকে।

কদম বলে—কী গো গজেন, শোনলাম মাঠে কী গোলমাল করেছো, ছোটবাবু নাকি তোমাকে কাদায় ঠেঁসে ধরতি গেছলো। খুব অন্যায় বাপু।

গজেন শোনায়—আমার কী করতে পারে, ওর দেখিয়ে দেব। ওই সর্দারি করা ছুটিয়ে দেব। মাইতিকত্তার মুখ চেয়ে আজ ওকে কিছু বলিনি। নাহলে শেষ করে দিতাম। গজেনকে চেনে না ও।

কদম সায় দেয়—ত সত্যি গো। ঘনাবাবু অমনিই এঁড়ে মরদ।

—মর্দানির শেষ করবো—হ্যাঁ।

হন হন করে মহেশ মান্নার বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে যায় তারা। ওটাকে গ্রামের লোক বলে—কুঞ্জবন।

ভুবন মাইতিও খবরটা পেয়েছে বাড়িতে।

অঘোর সরকার ঘাট থেকে লোকের মুখে খবরটা শুনে জানায় কর্তাকে। ভুবন মাইতি বেশ কিছুদিন ধরে ভুগছে সর্দি, শ্লেষ্মায়। বুড়ো মানুষটা আজ ঘনশ্যামের ওই কাজের কথা শুনে একটু চটে ওঠে। ভুবন মাইতি ছেলেকে

ফিরতে দেখে বলে—তোর এসবে দরকার কী? কে মজুরি কম বেশী দিল তা নিয়ে তোর মাথা-ব্যথা কেন? ওসব হুজুক নিয়ে যারা থাকে থাকুক, তোর ওই মারধোর করা কেন গজেনদের।

ঘনশ্যাম ভাবেনি যে কথাটা এত তাড়াতাড়ি হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। সে ওই গোলমালে থাকতে চায় না। কিন্তু দেখেছে কিছু লোভী মানুষের কালো হাত সর্বত্র এগিয়ে আসছে, সেই অন্যায়টাকে সে সহ্য করতে পারে না।

বলে ঘনশ্যাম—যা ইচ্ছে করুক গে, তাই বলে মারধোর করবে ওই ভাবে এটা সইতে পারবো না।

অঘোর সরকার দেখছে তেজী ছেলেটাকে।

সেও খেটেখাওয়া মানুষের দলে, তাই তেজী ছেলেটাকে শুধু মানবিক কারণেই ওই গরীবদের হয়ে কথা বলতে দেখে, তাদের হয়ে লড়তে দেখে ভালো লাগে তার।

ভুবন মাইতি কিন্তু খুশী হতে পারে না।

সে নিরীহ শান্ত প্রকৃতির মানুষ। জানে এই মজুরদের ব্যাপার নিয়ে দ্বীপের অনেক বসতিতে অসন্তোষ জাগছে। মহাজন, জোতদারদের অনেকে খুশী নয় এতে, আর মহেশ মান্না সেই জোতদারদের দলপতি। ঘনশ্যাম না জেনেই একটা ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতে চলেছে।

ভুবন মাইতি বলে—ওসব নেতাগিরি ছাড়, নিজের এত টাকার লঞ্চ কিনেছিস, ব্যবসাপত্র কর। টাকা শোধ দিতে হবে।

ঘনশ্যাম বলে,—যেভাবে হোক লঞ্চের টাকা ঠিক দিয়ে যাচ্ছি, ওসব টাকা মিটিয়ে দেবে। তবে অন্যায় করলে সইতে পারবো না। ব্যবসার ক্ষেত্রে আপোষ করতে হবে, করবেও। কিন্তু এখানে আপোষ করতে কষ্ট হবে বাবা। তবে জেনে রেখো অন্যায় আমি করবো না।

ভুবন মাইতি ভাবনায় পড়েছে ছেলেকে নিয়ে। মনে হয় মহেশ মান্নার তাদের ওই জমি দখল করার জ্বালাটাকে সে সইবার চেষ্টা করলেও, ঘনশ্যাম তা সইতে পারেনি। তাই এ বিক্ষোভ।

মহেশ মান্নার কুঞ্জবনে আজ অন্য আসর বসেছে। মহেশ মান্নার এখানে অনেক রকম কাণ্ডই ঘটে। রাতের অন্ধকারে এখানে দ্বীপের সবকিছুরই কর্মনীতি নির্ধারিত হয়ে যায়। পৌষ সংক্রান্তির সাগরমেলার কমিটি মিটিংও বসে এখানে। জোতদার মহাজন যে ক'জন আছে তারাও আসে। আর

কোন কোন রাত্রির অন্ধকারে এখানে আবাদের কোন বাউলিয়া জেলে-মেয়ের জীবনে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়ে যায়।

আজ সেখানে এসেছে নবীন রায়, ভূধর জানা—কন্দর্প মাহাতো আরও দু' চারজন খুদে জোতদার। নবীন রায় বলে—ওরা দল পাকাচ্ছে মহেশ। মজুরি চাই এটা চাই-ওটা চাই।

ভূধর জানা বলে—লীডার ওই নটবর। পড়াশোনা করে চাকরী-বাকরী পায়নি, যেন আমাদেরই দোষ। তাই আমাদের পিছনে লেগেছে কিছু চ্যালাচামুণ্ডা নে।

মহেশ মান্না বলে—ধান চুরি চার্জ দিয়ে, অন্য চুরিদায়ে দু' একটা কেস ডাইরী করো থানায়।

নবীন রায় বলে—তা না হয় করলাম, আমি বলি বাপু, একদিন ধরে বেদম পিটিয়ে দিই বাদাবনের ধারে।

ওরা নানা কথা ভাবছে, এমন সময় গজেন আইন নিতাই আরও দু' একজনকে নিয়ে ঢুকলো কুঞ্জবনে। ওরা অবাক হয়ে শোনে ব্যাপারটা।

এইবার ওদের চমক ভাঙে।

নবীন রায় বলে—তাহলে তোমাদের মাইতি কত্তার ছেলেও আছে দলে। তাই ভাবি নটবর—এত জোর পায় কোত্থেকে।

মহেশও ভাবছে কথাটা।

এবার তাকে নতুন করে সমাধানের পথ ভাবতে হচ্ছে। কন্দর্প মাহাতোর এখানে অনেক জমি। কন্দর্প বলে,—ঘনশ্যাম-এর রাগ তোমার ওপর আছে মহেশ, ধবলাটের ওদের জমিটার দখল নিলে, এবার তাই সেও দল পাকাচ্ছে নটবরকে সামনে রেখে।

মহেশ পথ পেয়েছে।

সে সাবধানী লোক। এতদিন একটা পরিকল্পনা করেছিল, এবার সেটাকে কাজে পরিণত করতেই হবে।

গজেন বলে—ঘনশ্যামকে দেখে নোব কত্তা! নেতাগিরি করা ছুটিয়ে দিতি পারি আজই।

মহেশ এই জোতদারদের সামনে সাধু সাজতে চায়।

বিনম্র কণ্ঠে বলে মহেশ—ও নিয়ে কিছু ভাবিসনি গজু। মাথা গরম করতি নাই। তুই বরং একবার রুদ্রনগরে গিই নটবর কয়ালকে ডাকি আন।

নবীন রায় অবাক হয়ে শুধোয়—ওকে আবার ডাকাডাকি কেন?

মহেশ হাসলো।

ওর হাসিটা বেশ অর্থবহ। ওই হাসির অর্থ জানে গজেন, সাপের হাঁচি বেদের চেনে।

মহেশ বলে—একটু দরকার আছে রায় মশাই। আর নটবরদের ব্যবস্থা করতি হবে তো, দমটা জানা ভালো। তাই ডাকাচ্ছি ওকে।

কন্দর্প বলে—গ্যাখো কী করতে পারো। নাহলে ঘনশ্যাম যদি লীডার হয়ে যায় বিপদ বাড়বে ভায়া।

ব্যবস্থাটা যে এত শীঘ্র হয়ে যাবে তা ভাবেনি ওরা।

মহেশ মান্না পরদিনই নটবর আর তার দু' তিনজন সাকরেদকে ডাকিয়ে এনে বেশ উদার মনোভাব নিয়ে কথাটা পাড়ে। সমাজসেবা—শিক্ষাব্রতের কথা। তার সামর্থ্য আছে—স্কুল করবে সে। সদরে লোকজন আছে স্কুলের এ্যাফিলিয়েশনও হয়ে যাবে। শুধু তাদের সহযোগিতা দরকার। শিক্ষার প্রসার করতে হবে এখানের এই আবাদে। মানুষ করতে হবে এই অসহায় বুভুক্ষু প্রাণীদের।

মহেশ মান্নার কথাগুলো শুনছে নটবর।

এর মধ্যে গঞ্জের দোকান থেকে প্লেট ভরতি গরম সিঙ্গাড়া-নিমকি আর ইয়া বড় সাইজের রাজভোগও এসেছে। এত খাবার দেখে, আপ্যায়নের বহর দেখে নটবররা একটু ঘাবড়ে গেছে। স্বয়ং মহেশ মান্না বলে—খাও হে নটবর! খাও—হ্যাঁ। তাহলে কথাটা ভেবে দেখো। আর বাপু ওই শিক্ষাব্রতের কথা বলছি, ওর জন্য অবশ্য মাইনেপত্র কিছু পাবে। তাহলে লেগে পড়ো তোমরাও। স্কুলের জায়গা—বাড়ি তৈরীর কিছু খরচা অবশ্য আমি দেব।

কয়েকদিনের মধ্যেই নোতুন স্কুল বাড়ি তৈরী হয়ে যায়, আর নটবর ত তিনজন সহচর নিয়ে এবার শিক্ষাদান ব্রতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেই ক্ষেতমজু আন্দোলন করার সময় তাদের নেই, তার চেয়ে অনেক বড় আন্দোলনে ত আত্মনিয়োগ করেছে।

স্কুল বাড়িটাকে রঙ্গীন কাগজের শিকল ফুল-পাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে। সদর থেকে কর্তারা—বেশ কিছু অপিসার এসেছেন, স্বয়ং এস-ডি-ও সাহেবও হাজির হয়েছেন। আর এর মধ্যে আবাদের বিভিন্ন বসতির শ'কয়েক ছেলে-মেয়েও এসে গেছে ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রী হয়ে।

বার বাড়িতে ডিয়েন বসেছে।

লুচি-আলুর দম আর বোঁদে—সবাইকে বসিয়ে খাওয়ানো হবে। বিরাট কাণ্ড করে চলেছে মহেশ মান্না। নটবর দলবল নিয়ে তদারক করছে।

ভুবন মাইতিকেও নেমন্তন্ন করা হয়েছে।

ঘনশ্যাম বলে—যাবে যাও। তবে মহেশ ইস্কুল বসিয়েছে কি মতলবে সেটা বুঝেছি বাবা। নাহলে নটবরদেরই ওখানে নেবে কেন?

নিশাকর সর্দার—গঞ্জের চাষী মজুররা এটা ঠিক বোঝে না। তাদের কাছে এই উৎসব দ্বীপেরই উৎসব। তারাও এসেছে অনেকে। ভুবন মাইতি ওই মিটিং-এ একবার গেছে।

মহেশ তখন সাহেবদের নিয়ে ব্যস্ত। ভুবন মাইতিকে দেখে একটু অবাক হয়েছে। ভেবেছিল সে আসবে না। তবু আসতে দেখে নেহাৎ কর্তব্য করার মতই বলে—আসুন ভুবনদা! বসুন ওদিকে।

অর্থাৎ সাহেবদের—ওই জোতদারদের চত্বরে নয়, ওর জন্য জায়গা ঠিক করা হয়েছে এই ইত্যাদিজনের মধ্যেই। সতরঞ্চি পেতে বসেছে অনেকে। নরহরি ভটচায একবার চাইল মাত্র।

সেও আজ ভুবন মাইতিকে যেন করুণা করে।

নরহরি জেনেছে এবার তাকে আশ্রয় করতে হবে মহেশ মান্নাকেই। মহেশ এখন উঠতি। নরহরি টিকিতে বিবর্ণ ফুল বেঁধে—নামাবলী গায়ে বিদ্যামন্দিরের উদ্বোধনী সভায় পুঁথি থেকে টুকে এনেছে স্বস্তি বাচন মন্ত্র।

বসন্ত পণ্ডিতও এসেছে। শুষ্ক বিবর্ণ মুখে এসে ঢোকে মণ্ডপে!

এই আবাদের পত্তনের পর থেকে বসন্ত পণ্ডিতই এখানে পাঠশালা করেছিল। সেদিন ছাত্রছাত্রী তেমন ছিল না, দু'চারজন আসতো। তারও ঠিক ছিল না। বুভুক্ষু আধনেংটা ছেলেগুলোর পেটে খিদে, মাঠের কাজ পেলে, মাছ ধরার কাজ পেলে পালাতো তারা। শুধু বসন্ত পণ্ডিত হাল ছাড়েনি।

ওই নটবর, কালীচরণ অনেকেই তার পাঠশালার ছাত্র, নটবর আজ তাকে চিনতেই পারে না। সামনের সতরঞ্চিতে বসে চীৎকার কলরব করছে কিছু ছেলেমেয়ে, গঞ্জের কিছু হরিজনও বসে আছে লুচি বোঁদের লোভে। বসন্ত পণ্ডিত এগিয়ে আসছে মঞ্চের এদিকে, চেয়ারে বসে আছে নবীন রায়, কন্দর্প অশেষ মোড়ল, ইসুফ শেখ আরও অনেকে। সাহেবরাও রয়েছেন এদিকে। বসন্তকে আসতে দেখে গজেন বলে—এখানে কেন! ওই সতরঞ্চিতে গে বসো মাষ্টার! ইখানে নেমন্তন্নে আসার বাবুদের ঠাঁই!

বসন্ত পণ্ডিত থমকে দাঁড়ালো। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উৎসবে তার নিমন্ত্রণ নেই। সরে যেতে হবে তাকে।

বের হয়ে এল বসন্ত পণ্ডিত!

আজ মনে হয় একটি নতুন দিন আসছে। সেখানে তারা অপরিচিত অনাহুতই থেকে যাবে। হয় ওদের দলের সামিল হতে হবে, না হলে ঠাঁই থাকবে না তার।

তখন মহেশ মান্না শিক্ষার প্রসার-এর ব্রতের সম্বন্ধে ভাষণ দিচ্ছে। অবশ্য নটবর এসে বই দেখে ওটা লিখে দিয়েছিল তাকে। হাততালির শব্দ ওঠে। মহেশ মান্না গলায় গাঁদা ফুলের মালা চাপিয়ে হেঁড়ে গলায় ভাষণ দিচ্ছে।

ভুবন মাইতি বের হয়ে আসছে, দেখেছে সেটা মহেশ মান্না। আর দেখেও কিছু বলেনি। তার পিছনে বের হয়ে গেল বসন্ত পণ্ডিতও। মহেশ মান্না আজ দ্বীপের মধ্যে যেন প্রথম আর প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠেছে।

ভুবন মাইতি ফিরে এসে পারঘাটায় বসেছে, ঘনশ্যাম চাইল বাবার দিকে। বৃদ্ধের মুখে চোখে দেখেছে সে বিষণ্ণতার ছায়া।

লঞ্চের কাজ করাচ্ছিল। হাতে তেলকালি মাখা কটনওয়েজ।

ঘনশ্যাম বাবাকে বলে—কেন যাও বাবু ওখানে! শরীর খারাপ—হাঁটাহাঁটি না করলেই নয়? ওই ভূতের কেত্তনে যাওয়া কেন মান খোয়াতে!

ভুবন মাইতি জবাব দিল না।

এই অপমানের কথাটা জানাতে চায় না। তবু যেন ঘনশ্যামের নজর এড়ায়নি।

মাইতি কত্তা বাড়ির দিকে চলে গেল।

খবরটা আনে পটলা।

সে গিয়েছিল লুচি বোঁদের লোভে। শালপাতার ঠোঙায় করে লুচি-আলুরদম বোঁদে নিয়ে আসছে খেতে খেতে। কৌশলে দুবার ম্যানেজ করেছে খাবারটা সে।

ঘনশ্যামকে দেখে বলে—শালোরা এন্তার দিচ্ছেগো লুচিটুচি। দুবার নে এলাম। তা মাইতি কত্তা গেছেন—উ মহেশবাবু যেন কতাই কইল না ওর সাথে। বলে—ওদিকে চেয়ারে লয় ছালার ওপর বসেন গে। শান কত্তা!

ঘনশ্যাম গর্জে ওঠে—এ্যাঁ! বাবাকে এই কথা বলে?

—হি। গ। পটলা আলুর দম মুখে পুরে জানায়—তা বাবু খাসা রেঁধেছে। লিবা আলুর দম একটু?

ঘনশ্যামের পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে উঠেছে ওই খবর শুনে। তার বাবাকে যেন ইচ্ছে করেই নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে পাঁচজনের সামনে আজ অপমান করেছে মহেশ মান্না। বাবা সেই কথাটা না বল্লেও ঘনশ্যাম বুঝেছে কিছুটা।

এমন সময় পটলাকে ওদের দেওয়া লুচি বোঁদের ঠোঙাটা তার দিকে এগিয়ে দিতে দেখে ঘনশ্যাম লাথি মেরে সেগুলোকে ছিটিয়ে দিয়ে গর্জে ওঠে পটলাকে,—খেতে পাস না যে ভিখ চাইতে যাবি। দোব পোঁদে লাথি মেরে দূর করে। পটলা অবাক হয়। হাত থেকে স্বাদু তরকারীটা পড়ে যেতে বলে।

—কি হ'ল গ!

—কিছু হয় নি! যা কাজ করগা—নালে ভাগ এখান থেকে!

পটলা চুপ করে গিয়ে ইঞ্জিন মুছতে থাকে। গজরাচ্ছে ঘনশ্যাম!

—বড়লোকি ছুটিয়ে দেব মহেশ মান্নার! শালা আমাকে চেননি। কি ভাবছে সে।

নিশাকর সর্দার আর রতনকে আসতে দেখে চাইল ঘনশ্যাম। নিশাকর সর্দার ভেবেছে কথাটা। জেলেপাড়ার সকলে মিলে শলা-পরামর্শ করেছে এ নিয়ে। আজ এসেছে ওরা।

নিশাকর বলে—একটা কথা ছিল ঘনাবাবু। সকলে একত্তো হয়ি শলা করি তোমার কাছে আর্জি নে এলাম! একটুন দয়া করতি হবে।

ঘনশ্যামের রাগটা তখনও পড়েনি; তবু ওদের কথা শুনে চাইল।

—কি করতে হবে সর্দার?

নিশাকর বলে—মাছ মারতি যাই দূর গাং! গোণে বেগোণে যাত্তি সময় লাগে। দেরী হয় হপ্তাহে তিন চার দিন মাছ আনতি পারি! বাকী তিন দিনতো যাত্তি আসতি সময় কাটি যাই। তাই ভাবছিলাম লঞ্চ নে চল জালে আমাদের সাথি। আমরা ভরসা পাই, আর বাড়তি তিন দিনের মাছ মারি যা পাবো সবই তুমার।

কথাটা ভাবছে ঘনশ্যাম।

তিনদিনের ওদের কোন রোজগার নাই, আর লঞ্চ-এ টেনে আনলে সেই তিনদিনও ওরা মাছ মারতে পারবে। সময় বাঁচবে তিনদিনের রোজগারও কম হবে না। কয়েক হাজার টাকা।

ঘনশ্যাম বলে—মহেশ মান্না কিছু বলবে না তোদের?

নিশাকর শোনায়—উকি বলবে? ওর মাল তো দিবই।

তবু ভাবছে নিশাকর কথাটা। ঘনশ্যাম বলে—ওর কোন ব্যাপারে আমি যাবোনা রে। তার চেয়ে বরং আমাকে মাছের একটা ভাগ দিবি রোজ, বাকী মাল দিবি মহেশকে। তোদের তো টিঁকি বাঁধা আছে ওর কাছে।

কথাটা ভাবছে রতনও।

একেবারে মিথ্যে কথা নয় এটা। মহেশ মান্না তাদের দাদনের টাকা যা দিয়েছে তা শোধ হচ্ছে না এত দিনেও। তার উপর জাল ভাড়া—নৌকা ভাড়া—খোরাকি—আড়তদারি বাবদও টাকা কাটে। দিনরাত গাং-এর বিপদে থেকে শীতে গ্রীষ্মে খেটে যা রোজগার করে তাতে ভরপেট খাবারও জোটে না।

বলে রতন—ও গলা কাটে গো। ঘনাবাবু, হাঙরের মত গিলে রেখেছে আমাদিকে। উর হাত থেকে ছাড়ান কাটান করতি পারো আমাদের?

ঘনশ্যাম ভাবছে কথাটা।

দেখেছে ওই জেলেপাড়ার মানুষগুলোর জীবন। তাজা জোয়ান মানুষগুলো ঝড়ে তুফানে হারিয়ে যায়। যারা বেঁচে থাকে তারাও আধমরা হয়ে আছে। আর আড়তে দেখেছে ঘনশ্যাম মহেশ মান্নার বোল বোলাও।

ঘনশ্যাম বলে—তোরা পারবি সরে আসতে?

নিশাকর সর্দার বলে—তুমি যদি ভরসা দাও তাই তোমার কাছেই এলাম। গঞ্জে—সাগরদ্বীপে আর তো কাউকে দেখি না ত্যামন মানুষ গো।

ঘনশ্যাম ভাবছে কথাটা।

বলে সে—ঠিক আছে। চল দেখা যাক কি করা যায়।

ভুবন মাইতি কোনরকমে পারঘাটায় আসে, অবশ্য কাজ কর্ম দেখা শোনা করে অঘোর সরকারই। ভুবন মাইতি দেখছে এই গঞ্জের নতুন রূপ।

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর প্রায় কেটে গেছে। এই কতগুলো বছরের ছবিটা তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সাক্ষী হয়ে আছে ঘাটের ধারে বুড়ো কেওড়াগাছটা অতীতের সুন্দরবনের স্মৃতি নিয়ে। ওটাকে কাটেনি তখন ভুবন মাইতিই।

বিরল সবুজ হলুদ পাতা মেলে বাতাসে ডালপাতা নেড়ে খুশিতে ঝলমল করে। সর্বাঙ্গে ওর বয়সের ছাপ, খোঁদল হয়ে গেছে কালো গুড়িটা—তবু অরণ্যের স্মৃতি নিয়ে ও বেঁচে আছে। এই ঘাটের পথে শতাব্দী ধরে এসেছে তীর্থযাত্রীর দল।

সেই দিনের ও সাক্ষী।

সেদিন ঘন গেও-গরান-কসাড় বন কেটে গড়ে তুলেছিল এই আবাদ। কত তুফান এসে হানা দিয়েছে, ক্ষেপে উঠেছে সমুদ্র। সারা দ্বীপে এসেছিল প্লাবন। সামান্য ক্ষেতের বহু কষ্টে রোয়া ধান জলে গিয়েছে।

তবু এসেছিল মানুষ, বহু ঠাঁই থেকে এসেছিল শূন্য হাতে এই আবাদে। আজ ওই বনের চিহ্ন মুছে গড়ে উঠেছে রাস্তা, খোয়া ঢাকা রাস্তা—ওদিকে গড়ে উঠেছে বাজার, দোকান পশার।

দূরে শেষ বালিচর টিলায় তিন দিকের সমুদ্র ঠেলে জেগে আছে কপিলমুনির সাদা মন্দিরটা। নীল সমুদ্রের মাঝে সাদা বালিচরে ওই মন্দির মানুষের কোন অতীত ঐতিহ্যের স্মারক বিন্দু ভাস্বর হয়ে আছে।

তাই দূর-দূরান্তর থেকে মানুষ আসে এখানে বৎসরান্তে—মহাসমুদ্র বেলায় পুণ্যস্নান করতে।

আর সেই দ্বীপেই আজ বাস করছে মানুষ। সেই সঙ্গে দীর্ঘদিনের জমা লোভ-লালসাগুলোও ঠেলে উঠেছে। সামান্য ভালো যা আছে তার অস্তিত্ব ঠেকেছে ওমনি একটি কিছু কিছু উজ্জ্বল বিন্দুর পরিধিতে। তার ব্যাপ্তি খুবই সীমিত—ত্রস্ত।

বাকীটায় এদেরই দখলদারী শুরু হয়েছে। সাগরদ্বীপের শান্ত জীবনযাত্রায় আসছে একটা দুর্যোগের পূর্বাভাস, সেটা বুঝেছে বৃদ্ধ ভুবন মাইতি। মানুষজন বাড়ছে—বাইরের জোয়ার এসে ঢুকছে, আর সেই সঙ্গে এই দ্বীপের মানুষগুলোর জীবনে আসছে জটিলতা, নানা সমস্যা। সেই সঙ্গে কিছু মানুষের লোভী হাত এখানের জীবনে, এখানের মাটিতে কামড়ে বসছে। তার দাবী অনেক বেশী।

মহেশ মান্নার সেই লোভী হাতটাকে দেখেছে আজ ভুবন মাইতি। তার বয়স হয়েছে। করার কিছু নেই। ঘনশ্যামও মন দিয়ে বিষয়-আশয় দেখলো না। তাই ধবলাটের এত জমি হাতছাড়া হয়ে গেল। টিকে আছে এই কচুবেড়িয়া আবাদের কিছু খাস জমি আর এই পারঘাটাটুকু। ভুবন মাইতি সম্পদের লোভ করেনি। তাহলে সাগরদ্বীপের আধখানা জমি সে গ্রাস করতে পারতো।

তা না করে বহু ভেসে আসা বাইরের মানুষকে সে এখানের বসতে ঠাঁই দিয়েছিল। জমি জায়াত দিয়ে বেঁচে থাকার পথ করেছিল, মায় ওই মহেশ মান্নাকেও।

সেদিন বুঝতে পারেনি ভুবন মাইতি, যে বিষবৃক্ষ রোপন করছে

সে। আজ সেই বিষবৃক্ষ মহীরুহে পরিণত হয়ে উঠে সারা দ্বীপের শান্তি নষ্ট করতে চায় নিজের অপরিসীম লালসা দিয়ে।

তাকেই চরম আঘাত করেছে।

সকালে এখন শীতের আমেজ আসছে। বর্ষার মেঘছায়া—দুর্যোগের দিন চলে গিয়ে শরৎ আসে। কয়েক দিনের জন্য সেই শরতের স্থায়িত্ব। মেঘগুলো মুছে যায়। আকাশ নীল। সমুদ্র নীল। ঢেউগুলো আর মাতাল হয় না। নীল আকাশে সাদা গাং চিলের দল কলরব করে। কেওড়া গরান গাছগুলোর পাতায় দিনের রোদ সোনালী হলুদ হয়ে ওঠে।

কুয়াশা পড়তে শুরু হয় সন্ধ্যার একটু পর থেকেই। গাং-এর বুকে হালকা চাদর মুড়ি দিয়ে কুয়াশা নামে। বাতাসের গতি বদলায়। মাতন আনা দখিণে বাতাস বদলে উত্তুরের হিম হিম সাড়া জাগে। গাং-এর বুকে বিগত মাতাল যৌবনের স্থিরতা নামে।

অনেকগুলো বছর এইভাবে কেটে গেছে ভুবন মাইতির চোখের উপর। সে দিনগুলো ছিল অনেক সুন্দর। দুঃখ কষ্ট ছিল তবু আশা ছিল। তার সংসারে ছিল স্ত্রী। আজ সব যেন হারিয়ে যাবার পালাই এসেছে।

দু'চারজন যাত্রী—আসছে—যাচ্ছে।

ওদিকে পুরানো নৌকা দু'একটা বালিচরে কাৎ করে ফেলে আলকাতরা তুলে—নতুন করে পিচ, পাট-এর পুডিং দেওয়া হচ্ছে। মেলার মরসুমের আগেই এসব করাতে হয়। বাতাসে পিচ পোড়ার চিমসে গন্ধ ওঠে। নীল আকাশে কালো ধোঁয়া উঠছে।

—কত্তাবাবু!

ভুবন মাইতি বসন্ত পণ্ডিতের ডাক শুনে চাইল। ক্রমশ তার অতীতের চিন্তা ভাবনায় বাধা পড়ে—আবার বর্তমানে ফিরে আসে ভুবন। বসন্তের দিকে চাইল।

ক'দিনেই বসন্ত পণ্ডিতের দেহমনের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। এমন একটা ঘটনা ঘটবে তা ভাবেনি বসন্ত। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে সে এখানে এসে পাঠশালা খুলেছিল। সামান্য কিছু ধানজমির আয় তাতে সংসার চলে না। তার পাঠশালা থেকে মাসে কিছু আসতো। তাছাড়া মাছ আনাজপত্র, পূজার সময় দু'চারখানা কাপড় ইত্যাদি যা পেতো স্কুল চালিয়ে তাতেই চলে যেতো। আর নিজের মনেও একটা তৃপ্তি থাকতো—

স্কুলের কাজে ও ব্যস্ত থাকতো। তাই মহেশ মান্না নতুন স্কুল-এর পত্তন করতে ভেবেছিল তার ঠাঁই হবে সেখানে। কারণ এই আবাদের

মধ্যে সেইই প্রথম পাঠশালা করেছে।

কিন্তু মহেশ মান্না এ নিয়ে কোন কথাই বলেনি। সেদিন স্কুলের উদ্বোধনের সময় ওদের ব্যবস্থা দেখে কিছুটা হতাশই হয়েছিল বসন্ত পণ্ডিত। তাকে আজ ওরা কেউ চেনে না। চ্যাংড়া নটবর—মদন—তপনের দলের হাতেই সব ব্যবস্থাভার তুলে দিয়েছে মহেশ। তবু ভেবেছিল পরে ডাকবে মহেশ মান্না।

কিন্তু ডাকেওনি। অথচ ওদের স্কুল চালু হয়েছে। কোন মাইনেপত্র লাগে না ছাত্রদের। বইও নাকি দিচ্ছে। আরও মস্ত আকর্ষণ রয়েছে সেখানে। মেন ল্যাণ্ড থেকে সদর অফিস ওদের স্কুলে ছেলেদের জন্য দুপুরের খাবার ব্যবস্থাও করেছে। মহেশ মান্নাও তার গুদাম ঝেটোনো কিছু চাল খুদ ইত্যাদি দেয়। হাটতলা থেকে সব্জীও কিছু মেলে। সব মিলিয়ে একটা লাপসীর মত সেদ্ধ করা হয়। দুপুরে তাই দেওয়া হয় ছেলেদের।

ফলে পড়ার চেয়ে খেতে পাবার লোভেই অনেকে ভিড় করে সেখানে। আর বসন্ত পণ্ডিতের পাঠশালে কেউ যায় না। মাটির লম্বা চালা ঘরখানা এতদিন ধরে টিকে ছিল। সামনের মাঠে দুটো কৃষ্ণচূড়া গাছ লাগিয়েছিল বসন্ত শখ করে। সেগুলো কয়েক বৎসরে বড় হয়ে উঠেছে। বকুল গাছও একটা করেছে। ভেবেছিল ফুলের বাগান করবে তার পাঠশালার চারিপাশে। গাঁদা ফুলও অনেক লাগায় ছেলেদের দিয়ে।

এবার সে সব পড়ে আছে।

ছেলেরাই যায় না সেখানে। আর ভাবনায় পড়েছে বসন্ত। তার সংসার চালাবার ভাবনাও বেড়েছে।

মাইতিমশায় চাইল ওর দিকে।

বসন্ত বলে চলেছে তার দুঃখ আর পরাজয়ের কাহিনীটা। বলে সে—এবার কি হবে মাইতিমশায়? মহেশবাবু তো ইস্কুল চালু করে আমার এতদিনের পাঠশালাকে তুলে দিল। ভেবেছিলাম—তবু ওখানেই কাজ পাবো। কিন্তু তেমন কথাও তো শুনছি না।

ভুবন মাইতি বলে,—তাই নাকি! তুমি কিছু বলেছিলে ওকে?

বসন্ত পণ্ডিত কিছুটা অনুমান করেছিল, মহেশ মান্নার সঙ্গে ভুবন মাইতির সম্পর্কটা ভালো নয়। বাইরে তার কোন প্রকাশ না থাকলেও ভিতরে চাপা বিদ্বেষ একটা আছে। বসন্তের সঙ্গে এদের পারিবারিক একটা যোগাযোগও আছে। বসন্তের মেয়ে কমলাও মাইতি মশায়ের বাড়িতে আসে। পিসী গিরিবালাও ভালোবাসে কমলাকে, মাইতিমশায়ও স্নেহ করেন।

সব মিলিয়ে বসন্ত তাই মহেশ মান্নার ওখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যেতে পারেনি নিজের অভাবের কথা বলতে।

এতকাল ধরে ভুবন মাইতির সাহায্যেই কিছু নিয়েছে। বাধেনি বসন্ত পণ্ডিতের সেটুকু নিতে। কিন্তু ভুইফোঁড় ওই মহেশ মান্নার কাছে আজ তাই যেতে পারেনি।

বসন্ত বলে—যাইনি। ভাবলাম আপনার কাছেই কথাটা বলি। যদি কোন প্রতিকার হয়।

হাসে ভুবন মাইতি। মলিন বিষণ্ণ সেই হাসি। বলে সে,—আর প্রতিকার করার সাধ্যি আমার নেই বসন্ত। এখন নিজের উপর এতবড় অন্যায় অবিচারের কোন প্রতিকার করতে পারলাম না। আজ মনে হয় আমার করার কিছুই নাই।

বসন্ত পণ্ডিত মুখ বুজে বসে থাকে।

সেও কঠিন বাস্তবটাকে চিনেছে। আজ বুঝেছে সে এই দ্বীপে বাস করতে গেলে তাকেও মহেশ মান্নার স্মরণ নিতেই হবে। ভুবন মাইতি বলে—ভেবেছিলাম ঘনশ্যাম লেখাপড়া শিখবে। ব্যবসাপত্র করতে পারবে। না হয় একটা ভালো চাকরীই পাবে। কিন্তু তাও হল না। লঞ্চ কিনে মালপত্র বইবার ব্যবস্থা কর, তাও করলো না। মাছের কারবারে নামলো—যার কিছুই আমি বুঝি না। এতগুলো টাকা দেনার দায়ে পড়ে রইলাম।

বসন্তও শুনছে কথাগুলো।

এখানে যে আর কিছু সাহায্য সে পাবে না তা বুঝেছে।

বাঁচার চেষ্টা তাকে নিজেকেই করতে হবে। বসন্ত চুপ করে থেকে বলে—তাহলে আজ আসি মাইতিমশায়।

ভুবন মাইতি কী ভাবছিল। ওর কথায় সেই খেইটা হারিয়ে যায়। বলে সে,—ও আসবে? তা এসো।

উঠে চলে গেল বসন্ত ভেড়ির দিকে।

অঘোর সরকার পুরানো লোক। সে একমনে খাতা লিখছিল—নরহরি ভটচাযকে অং বং করতে দেখে চাইল। নরহরি ভটচায অনেকদিন থেকে এই ঘাটের টাটে গণেশ পুজো করে আসছে।

সেও এসে বসন্তকে এখানে ওইসব কথা নিবেদন করতে শুনেছে, শুনেছে মাইতি কত্তার হতাশভরা কথাগুলো। লোকটার কান একটু বেশী খাড়া, আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টা বেশী সজাগ। সে তাই এসব ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তটা করে নিয়েছে।

কোনরকমে টাটের গণেশের উদ্দেশ্যে দুটো টগর ফুল কয়েকদানা আতপ আর দুটো বাতাসা গুঁড়ে দিয়ে কর্তব্য সমর্পণ করে।

অঘোর সরকার বলে—বসন্ত মাষ্টার সত্যি বিপদে পড়েছে কত্তাবাবু। ভুবন মাইতি জানায়—বিপদ তো আমারও। কি করি বলো অঘোর। দিন কাল যে বদলে গেল। মানুষও বদলাবে এবার।

বাসিনী দেখেছে সংসারের অবস্থাটা, দিনদিন যেন এবার সংসার অচল হয়ে উঠছে। তারপর আরও ভাবনা বাড়ছে ওই মেয়েকে নিয়ে। গরীবের ঘরে মেয়ের রূপ যৌবন যদি হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ার মত এসে পড়ে তাতে গেরস্থর বিপদই বাড়ে। এখনও মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারল না।

দু'এক জায়গায় সম্বন্ধ দেখেছিল, কিন্তু ছেলে পছন্দ হয়নি বাসিনীরই। এখন মনে হয় স্কুল উঠে যাবার আগে যে কোন ভাবে হোক মেয়েকে বিয়ে দিতে পারলে আজ এতখানি বিপদে পড়তো না তারা।

কমল ফিরছে জেলে পাড়ার ওদিক থেকে।

—কোথায় গিইছিলি?

কমলা মায়ের দিকে চাইল। ওর কথায় আজ বেসুর বাজে। কমলা সমুদ্রের ধারে গেছলো ঘনশ্যামের সঙ্গে, আজ মাছের ডিঙিগুলোকে পিছনে বেঁধে নিয়ে সমুদ্রে চলেছে ঘনশ্যাম।

কমলার মনে হয় সেও ওমনি দূর সমুদ্রে কোথাও উধাও হয়ে যাবে। ঝাউবনে হাওয়া কাঁপে। ঘনার বলিষ্ঠ দেহের পানে চেয়ে থাকে। মাথার চুলগুলো ওর উড়ছে।

বলে সে—কি কমলা, যাবি দূর গাং-এ—

দিগন্তে সূর্যের আলো ভরা গাং-এর অচিন সীমানায় যেন হারিয়ে যায় কমলা। বলে সে—আজ যাবো কি করে? ওই সব নৌকা নে চলেছো—

হাসছে ঘনশ্যাম। বলে সে—ঠিক আছে। একদিন দুজনে ওই দূর গাং পাড়ি দে আসবো।

মহেশ মান্না আড়ত থেকে দেখছে ওদের।

ব্যাপারটা তার মোটেই ভালো ঠেকেনি। নিশাকর সর্দারকে বলে—বেশ তোমরা নিজেরাই মাছ ধরছিলে, আবার ওটাকে নিলে কেন হে?

রতন ডিঙিতে জাল তুলছিল আরও দু' তিনজনকে নিয়ে। বাঁশের মধ্যে পাক দেওয়া সাগর জলে ওগুলো দুলতে দুলতে বলে—নেলাম মান্নাবাবু

আমরা। তবু মাছ চাট্টি বেশী ধরতি পারবো। গোণে যেগোণের পথে আর দেরী হবেনি।

—অ! মহেশ মান্না ঢোঁক গেলে মাত্র।

নিশাকর সর্দার বুঝেছে কত্তা খুশী হয়নি, মুখে না বললেও সেটা প্রকাশ পায়।

ডিঙিগুলো চলেছে লঞ্চের টানে—ক্রমশ গতিবেগে ওরা ছুটছে। রতন বলে,—দেখলা কাকা, ক্যামন কল। ইবার মাছের ঝাঁক খুঁজি লই জাল ঘেরবো।

তখনও তীরভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে কমলা।

সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়ায় কাঁপছে ওর এলোচুল, উতলা আঁচল।

মহেশ মান্না এগিয়ে আসছে।

ওর চোখে কি নেশা জাগে, নিজের ঘরে রুগ্না শীর্ণা স্ত্রী যশোমতীর কুশ্রী সিটকে দেহটাকে মনে পড়ে। ভগবান ওকে কিছুই দেয়নি। আজ রাতের অন্ধকারে তাই মহেশ অতৃপ্ত লালসা নিয়ে ফেরে। তার কুঞ্জবনে আগমন ঘটে জেলেপাড়ার বাওয়ালিপাড়ার বৌ ঝিদের।

কচি সদ্যযৌবনবতী মেয়েটার দিকে চেয়ে থাকে মহেশ। কমলার খেয়াল নেই। শাড়িটা গা থেকে খসে গেছে, তার সুন্দর দেহের রেখাটা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আর একটা লোভী মানুষ তার ওই দেহের দিকে চেয়ে আছে লুব্ধ চাহনি মেলে।

কমলার দু'চোখ রয়েছে নীল গাং-এর দিকে।

ঘনশ্যামও লঞ্চ থেকে দেখছে কমলাকে। হঠাৎ চোখে পড়ে তার মহেশ মান্নার মূর্তিটা। বালিয়াড়ির উপর থেকে চেয়ে আছে সে কমলার ঝড়ো হাওয়ায় মাতন তোলা দেহটার দিকে।

....ওর হাতটা নিমিষের জন্য পিতলের গোলাকার শুখানিতে চেপে বসে। ওই মানুষটাকে সে সহ্য করতে পারে না। মনে হয় লঞ্চ তীরে ভিড়িয়ে—এক লাফে নেমে গিয়ে ওই চোরটাকে ধরে ফেলে বালিতে মুখ গুঁজে দেয়।

কিন্তু কোনমতে চুপ করেই লঞ্চটাকে চালু রেখেছে, মহেশ মান্না তখনও বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে কী ভাবছে।

নীলসমুদ্র—ঝলমলে আলোর মাতন—ঝড়ে কাঁপা ঝাউবন—ওই কমলার দেহটা সব মিলিয়ে কী যেন স্বপ্ন দেখছে সে।

সরে গেল মহেশ মান্না।

কদম মাছ-এর সন্ধানে এসেছিল। গজেন ওকে আজ হঠাৎ কী খুশির ধমকে কিছু ভালো মাছই দিয়ে ফেলেছে। আদর করতে আসে তাকে।

কদম তেড়ে ওঠে—মরণ। মাছ বিচবো না তোমার আদর দেখবো গো? এ্যা—সাঁঝবেলায় এসো ঘরে কতা হবে।

কদম গজগজ করতে করতে চলেছে গঞ্জের দিকে।

হঠাৎ নজরে পড়ে তার ওই বালিয়াড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মহেশ মান্নার দিকে। সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে কমলার দিকে।

কদম মাছের ঝুড়ি সামলাচ্ছে, একটা চিলের ধাবমান ছায়া নেমে আসছে। মাছের গন্ধ পেয়ে চিলগুলো কেমন হিংস্র হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে চিৎকার করে ওই লোভী পাখীটা নখ-ঠোঁট মেলে এগিয়ে আসছে।

একটা ঝাউ ডাল নেড়ে তাড়াবার চেষ্টা করে কদম।

হঠাৎ নজরে পড়ে। মাছ নয়। চিলটার লক্ষ্য লাল বোল কাঁকড়ার দিকে।

বালির গর্ত থেকে কাঁকড়াটা বের হয়ে চলেছিল জলের দিকে, চিলটাও নজর করে ধেয়ে আসছে তার দিকে। ধাবমান ছায়াটা পড়েছে বালিতে—এগিয়ে আসছে।

কাঁকড়াটাও সেটা টের পেয়ে প্রাণ ভয়ে দৌড়চ্ছে তার আশ্রয়ের দিকে। একটি মুহুর্ত—ধারাল নখের চাপে কিছুটা বালি খুবলে নিয়ে উঠে গেল চিলটা। কাঁকড়াটা গর্তে সেঁদিয়ে গেছে।

--মরণ। হাসছে কদম।

মনে হয় ওই চিলের চোখ দুটো যেন মহেশ মান্নার মতই।

চোখ তুলে দেখতে গিয়ে আর দেখা যায় না তাকে। ওই বালিয়াড়ির উপর থেকে ঝাউবনের মধ্যে চলে গেছে লোকটা।

—অ দিদি! কদমের ডাকে কমলা চাইল।

কদম বলে—বাড়ি যাবে না গ? ইথানে দাঁইড়েই থাকবে নাকি!

—যাই।

তখনও মনে পড়ে ঘনশ্যামের কথা। ফিরছে কমল বাড়ির দিকে। তখনও মনে ঘনশ্যামের আর তার লঞ্চের ছবিটা ভাসছে।

কদম বলে—চলো।

ওকে ডেকে নিয়ে এল কদম। আজ ওই চিলটার কথা মনে পড়ে বারবার। কমলাকে কিছু বলে না কদম এ নিয়ে।

কমল বাড়িতে পা দিয়ে মায়ের কথা শুনে অবাক হয়। বলে—ঘাটে

গেছলাম মা। ঘনাদা লঞ্চ নে গেল গাং—

বাসিনী বেশ চড়া স্বরে বলে,—ওই দেখলেই হবে, না? এতবড় মেয়ে এখনও ওইভাবে ঘুরবি এখান ওখানে! কাজ-কম্মো কে করবে? পারবো না আমি!

মায়ের কথার স্বরে আজ অন্য সুর খুঁজে পায় কমল। মুখ বুজে ওদিকের ঘরটা সাফ করতে থাকে। বাবাকে ঢুকতে দেখে চাইল কমলা। ঝড়ো কাকের মত চেহারা হয়েছে বসন্ত পণ্ডিতের কয়েকদিনের মধ্যে! কমলাও দেখেছে এই সংসারের কিছুটা কালো ছায়াকে—সেটা যেন ঘিরে আসছে কালো মেঘের মত।

স্কুলের চালাটা কিছুদিন ধরে পড়ে আছে। বাইরের গাঁদা ফুলের গাছগুলোয় ছেলেরাই জল দিতো, বাথান থেকে গোবর কুড়িয়ে এনে সার হিসেবে দিত, ওদের যত্নে গাছগুলোয় ফুল ফুটতো—ক'দিন আর ছেলেদের দেখা নেই। দু' একজন আসতো তবু পণ্ডিতের কাছে।

শূন্য ঘরে বসন্ত পণ্ডিত ওদের আসতে দেখে একদিন বলে—তোরাও নতুন ইস্কুলে যা দেবু, এখানে ইস্কুল আর হবে না।

এতদিনের ইস্কুলও বন্ধ হয়ে গেল!

লোকটা শুধু চুপচাপ বসে থাকে ওই চালাঘরে।

আজ বাবাকে তেতে পুড়ে ঢুকতে দেখে চাইল ওর দিকে।

বসন্ত পণ্ডিত শুনেছে মেয়ের কথা। সেও আজ সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছে। রোদের তাপে ঘামছে। মেজাজটাও ভালো নেই। আজ সামনে তার একটাই প্রশ্ন। টিকে থাকার প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছে।

দেখেছে আজ বসন্ত ভুবন মাইতিকে ভর করে বাঁচার কোন পথই সে পাবে না। তাই ওর নামে বিরক্ত হয়ে ওঠে সে। বসন্ত বলে মেয়েকে—দিন রাত বেরুবি না। আর কি এমন ব্যাপার যে ঘনশ্যামের সঙ্গে যেতে হবে এখানে ওখানে? যা কাজে যা।

এরপর বসন্ত আজ বাসিনীকেই বেশ চড়া স্বরে বলে,—তুমি কি করো? দেখতে পারো না!

বাসিনী এমনিতে একটু ঠাণ্ডা প্রকৃতির মেয়ে। জীবনে অভাবটাকেই দেখেছে, তবু মানিয়ে নিয়ে চলবার চেষ্টা করে এসেছে মুখ বুজে। কিন্তু ক্রমশ যেন অধৈর্য হয়ে উঠেছে সে। আজ দেখেছে স্বামীকে ওই মেয়েটাকেও কড়া কথা বলতে।

বাসিনী বলে—ওকে ধমকে কি হবে? নিজেই তো পারোনি মেয়ের একটা

গতি করতে। পাঠশাল নিয়েই পড়ে ছিলে। এখন? সব তো গেল। তবু যদি মাইতি কত্তা কিছু করতে পারে—তাই যেতে বল্লাম। তা গেছলে সেখানে?

মাইতি কত্তার নাম শুনে খিঁচিয়ে ওঠে বসন্ত—ওই বুড়ো আর কি করবে? জমি জায়গা সব কেড়ে নিয়েছে ওই মহেশ মান্না। আর মাইতি কত্তাকেই কে দেখে তার ঠিক নাই। আর ঘনাও হয়েছে তেমনি। একটা বাঁদর বখাটে। বাপের সর্বস্ব ঘুচিয়ে লঞ্চ কিনে জেলে মালোদের সঙ্গে ঘুরছে। বুঝলে ওদের দিন ফুরিয়েছে। বোঝা গেছে ওদের মুরোদ।

বাসিনী এসব কথা শুনতে চায় নি!

ঘনশ্যামকে সেও ছেলেবেলা থেকে দেখেছে। তেমন কিছু খারাপও দেখেনি। তাই ঘনশ্যামের নামে স্বামীর মুখে এসব কথা শুনে বলে সে—ঘনশ্যাম তেমন ছেলে নয়।

খিঁচিয়ে ওঠে বসন্ত—হ্যাঁ। খুব ভালো ছেলে। তুমি এই ভেবেই রয়েছ—আর তোমার মেয়েও তাই ভাবে। দুটোই সমান তোমরা।

বসন্ত বেশ বীরদর্পে বলে,—আমি বলে দিচ্ছি তোমার মেয়েকে সাবধান করে দিও আর যেন ওখানে না যায়। আর ঘনার সঙ্গে ঢলাঢলি যেন না করে। খুব হয়েছে—এইবার নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখুক।

বাসিনী স্বামীর দিকে চাইল।

বসন্ত কথাটা ভেবেছিল, পথে আসতে আসতে মহেশ মান্নার স্কুল—কুঞ্জ—বনের দিকে চেয়ে মনে হয়েছে তার এখানে বাঁচতে গেলে এবার তাকেও বুঝে চলতে হবে। অন্যপথ নিতে হবে।

—কোথায় যাচ্ছো এ সময়? এই তেতে পুড়ে এলে—

বাসিনীর কথায় বসন্ত বলে—মরারও সময় নাই, একটু আসছি।

বের হয়ে গেল সে।

মহেশ মান্না সকালে মাছের আড়ত, তারপর গঞ্জের নিজের টাট বাট-এর কাজ দেখে, সামনে গঙ্গাসাগরের মেলা আসছে। বিরাট ব্যাপার ঘটে তখন। নানা ঠিকাদারীর কাজ শুরু হয় আগে থেকেই। মহেশ মান্নার হাতে বেশ কয়েকটা কাজের ঠিকাদারী থাকে। কর্তাদের আগমন হয়।

তারই প্রস্তুতি চালান এবার।

মহেশ মান্না টাটে বসে এসব কাজ সেরে বাড়ি ফেরার মুখে একবার

কন্দর্প—আরও দু-একজন জোতদার আসে। বি-ডি-ও সাহেবও আসেন। আসেন থানার বড়বাবুও। তাছাড়া নরহরি ভট্টাচার্য্য, শ্রীমন্ত সাধুর্খা, আরও দুএকজন আসে। ইদানীং মহেশ মান্নার আর একটা কাজও বেড়েছে। ইস্কু'লও যায়। মদন নটবর-এর দলকে ওই আন্দোলন থেকে সরিয়ে এনেছে টাকার গন্ধ দিয়ে।

মহেশ মান্না খুশী হয় নটবরকে কুঞ্জবনে আসতে দেখে। শুধায়—ইস্কুল কেমন চলছে মাষ্টার?

নটবর বলে—ভালোই চলছে স্যার।

মহেশ শোনায়—এবার কিন্তু বৃত্তি পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাতে হবে নটবর। আর মদন-ভূষণকেও বলো, বৃত্তি আনতে পারলে, নতুন চাদর দেব একটা করে। যাও—

নটবর চলে গেল।

কন্দর্প বলে—মন্দ ক'ল করোনি ভায়া। নটবর এখন নেতাগিরি ছেড়ে দিয়েছে।

হাসে মহেশ মান্না—ওসবের দৌড় বুঝি কন্দর্প, শুধু জেনে নেবে কী চাই ওদের। সেইটুকু দাও—দেখবে ল্যাজ নাড়বে। মহেশ মান্নাকে চেনেনি ওরা।

নরহরি চা খাচ্ছিল। এবার চায়ে চুমুক দিয়ে বলে সে—তা আর বলতে। ভুবন মাইতি ছিল দ্বীপের মাথা। লোকে বলতো ভুবন মাইতির আবাদ। সেই ভুবনকেই মান্নাবাবু কাবু করে দিলেন। তবে বাপু—ওই ঘনাটাকে সিধে করতে হবে কত্তা। বলেনা বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। ওটা তাই।

শ্রীমন্ত বলে—ও হয়ে যাবে।

মহেশ মান্না ভাবছে কথাটা। উদ্ধত ছেলেটা যেন মাথা তুলছে, তাকেও ছাড়িয়ে যেতে চায় এবার।

নরহরি বলে—ওর বাপ ভুবন চুপসে গেছে, ছেলেটাও যাবে। বুঝলেন মান্নাবাবু, বসন্ত পণ্ডিত আজ এসেছিল মাইতির কাছে চাকরীর ধান্দায়—মহেশ মান্না বসন্তের নাম শুনে চাইল।

ওর মেয়ে কমলার কথা মনে পড়ে। আজ সকালেই দেখেছিল মেয়েটাকে। বসন্ত এখন বেশ বিপদেই পড়েছে ইস্কুল তুলে দিয়ে। আর সেটা ঘটে যেতে এখন মান্নাবাবুও যেন তাকে জালে ফেলবার কথা ভাবছে।

ঘনশ্যামকে একটা আঘাত দিতে গেলে বসন্ত পণ্ডিতকে তার চাই। দাবা খেলার চালগুলো মহেশ ভালোই দিতে পারে। তাই অবসর সময়ে মহেশ

দাবার ছক নিয়ে বসে। ওতে নাকি বুদ্ধিতে বালিশান পড়ে।

কন্দর্প বলে—ওসব বদ নেশা হে।

তবুও কন্দর্প রায়ও আসে এসময়। দাবার ছকও পাতা হয়।

মহেশ মান্না দাবার ঘুটিটা নাড়তে যেন চোখের সামনে দেখতে পায় বড়ের একটা চালে সে ঘনশ্যামের মত দুরন্ত একটা ছেলেকেও কাত করে দিয়েছে।

নরহরির কথায় বলে ওঠে মহেশ মান্না—তা বসন্ত তাহলে এবার ইস্কুল তুলে দিয়ে ভুবন মাইতির পারঘাটায় বহাল হ'ল। তার চেয়ে বলো গে—বৈতরণীর ঘাটেই বসে যাক কড়ি আদায় করতে। মাইতির ওখানে চাকরী নিল—

নরহরি বলে—আজ্ঞে সে গুড়ে বালি। মাইতি কত্তা বলে—আমার অবস্থাই এখন খারাপ হে। চাকরী আর দেব কোত্থেকে। বেচারা পণ্ডিতকে পথে বসিয়ে দিল বুড়ো ভাম।

শ্রীমন্ত খাঁ বলে—এ্যাঁ। বলো কি হে? শুনি দুজনের খুব ভাব। ছেলের সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে-থা দেবে শুনি—তা হবু বেহাইকে খেদিয়ে দিল? শোন কত্তা।

হঠাৎ সামনের গেট পার হয়ে সেই বহু আলোচিত বসন্ত পণ্ডিতকেই আসতে দেখে ওরা একটু অবাক হয়। শ্রান্ত ক্লান্ত বসন্ত এইদিকে মান্নাবাবুকে দেখে এগিয়ে এল।

নরহরিও অবাক হয়।

মান্নাবাবু মনে মনে এমনি একটা ব্যাপার ঘটবে আঁচ করেছিল। ও জানে লোককে চাপ দিলে হয় সে মাথা তুলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ করে সোচ্চার কণ্ঠে। নাহলে হেরে গিয়ে পরাজিত হয়ে এসে তার পায়ের নীচেই লুটিয়ে পড়বে।

আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখেছে মানুষ বেশীর ভাগই ওই হার মেনে এসে মাথা নোয়ানোর দলেই। ওই স্বীকৃতি পেলে খুশী হয় মান্নাবাবু। নিজের মনে একটা আত্মতৃপ্তি জাগে। মহেশ মান্না অবশ্য মনের কোন ভাবকেই মুখে ফুটিয়ে তোলে না। এটা নিরাপদ। তাই সহজ ভাবে উত্তাপহীন গলায় বলে মহেশ—আসুন পণ্ডিত মশায়। তারপর—হঠাৎ এদিকে?

বসন্ত পণ্ডিত বলে—একটু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

কথা আছে তা জানে মহেশ। কি কথা তাও অনুমান করে সে। বুঝতে পারে এতলোকের সামনে নিজের প্রার্থনাটা জানাতে দ্বিধা করছে বসন্ত পণ্ডিত। অর্থাৎ আত্মসম্মানজ্ঞান নামক তুচ্ছ বস্তুটা এখনও এত বিপদে

পড়েও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি পণ্ডিত। সেটাকে এখুনি এখানেই মুছে দিতে চায় মহেশ। এতলোকের সামনে প্রকাশ্যে ওর মাথা না নোয়ালে সে খুশী হবে না।

মহেশ বলে,—বেশ তো বলুন না কি বলবেন। যদি তেমন উপায় থাকে সে কথা রাখার চেষ্টা করবো। তবু বসন্ত ইতি উতি করে দেখে বলে মহেশ —এত লজ্জা কিসের। সবাই আপনজন। বলুন—

কথাটা জানাতে যেন লজ্জা আসে বসন্ত পণ্ডিতের, নিজের অভাবের কথা এভাবে কোথাও জানায়নি। জানাতে হয়নি। আজ মহেশের কাছে না জানিয়ে উপায় নেই। তাই বলে পণ্ডিত—একটা কাজকম্মো দাও বাবা। নতুন স্কুল করলে—এতকাল শিক্ষকতা করেছি। ওখানে যদি কাজ পাই তবু ছেলেদের নিয়েই থাকতে পারবো।

মহেশ ভাবছে কথাটা। বলে সে—ইস্কুলে তো কাজ হওয়া মুস্কিল। ওসব ইন্‌সপেক্টরের মনোনীত করা। জানেন তো—সরকারী এডেড ইস্কুল। এতে এখন কোন সুযোগ হবে না।

চুপসে যায় পণ্ডিত। কোথাও কোন ঠাঁই তার জন্য নেই। বলে সে—তবে কি বাবা এতকাল এখানে থেকে এবার চলে যেতে হবে অন্যত্র। কি করে বাঁচবো—কোন পথই তো নেই। এদিকে সংসারের দায় তো আছে, এখন তুমিই ভরসা বাবা—

মহেশ খুশী হয়। দেখছে আর একটা লোককে এনে তার পায়ের নীচে ফেলেছে। ধাপে ধাপে এগোবে সে। বলে মহেশ—না না। এতকাল আছেন এখানে, অন্যত্র কেন যাবেন। কাল আসুন কিছু করতেই হবে। তবে কী করা যায় ভেবে দেখছি। মনে হয় একটা পথ হবেই। ততদিন সামনে গঙ্গাসাগর মেলা—আমার ঠিকেদারীর কাজের হিসাবপত্র রাখতে হবে—তাতেই লেগে যাবেন। তার মধ্যে একটা অন্য কাজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বসন্ত পণ্ডিতের জীর্ণ মুখে হাসির আভাষ ফুটে ওঠে। বলে সে—জানতাম একটা পথ হবেই। নিশ্চিন্ত করলে বাবাজী।

মহেশ মায়া বলে—না না। কি এমন করেছি। ঠিক আছে—কাল আসবেন। তখন সব কথা হবে।

কৃতার্থ হয়ে ফিরছে বসন্ত। আজ মনে হয় এতকাল এখানে না এসে ভুলই করেছিল। আগে এলে আরও ভালো হতো তার। দেখা যাক কি হয়। তবু মনের বোঝাটা তার অনেক হাল্‌কা হয়ে গেছে। খুশি মনে সে

ফিরছে বাড়ির দিকে।

গিন্নীকেও সুখবরটা দিতে হবে।

এককথায় তার এমন সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা ভাবেনি সে। মহেশ মান্নাকে আজ নতুন চোখে দেখছে সে। শ্রদ্ধাই করে, আর তাই মনে হয় ভুবন মাইতি অক্ষম, ওর ছেলেটা ততবড় অপদার্থ।

রোদের তাপ আর তত বেশী তীব্র বোধ হয় না বসন্ত পণ্ডিতের কাছে। মনের উত্তাপটা কমে গেছে, সেই হতাশার জ্বালাও আর নেই, তাই খুশি মনে ফিরছে বাড়ির দিকে লোকটা।

ঝিকিমিক করে দিনের ঝলমলে রোদ গাং-এর বুকে। ঢেউগুলো ছন্দবদ্ধ ভাবে উঠছে—জাল ফেলেছে নিশাকরের দল বেড় দিয়ে। নৌকাগুলো জাল টানছে। নোনা জলে ভিজে জালটা উঠছে। এসময় ঘনশ্যামের কাজ নেই। লঞ্চটার ইঞ্জিন বন্ধ করে বসে আছে ডেকে। ঢেউ-এ মৃদু মৃদু দুলছে লঞ্চটা।

ওদের জালে রূপালী মাছগুলো উঠছে। ঝকঝকে পারশে—তাজা বড় বড় ভেটকি—পমফ্রেটের ঝাঁক—দুচারটে বড় বড় চিংড়ি—না হয় সাদা খোলের উপর আলতা পাটি দাগ আঁকা বাগদা চিংড়ি উঠছে। লঞ্চের খোলে ঝুড়ি ঝুড়ি সমুদ্রের ফসল তুলছে তারা। মটরা বরফ ভাঙছে—চাপা দিচ্ছে মাছের উপর।

বলে সে—আর কতো ধরবে গো—নিয্যস তিনশো মন হই যাবে। আজ চলো—নালি হাট ধরতি পারবা নাই।

রতন ধমকে ওঠে—তিনশো মন হবে, বলিস কিরে?

ওদের কাছে এতমাছ কোনদিন ধরা পড়েনি।

ঘনশ্যাম যেন জলের পোকা। কিছুদিনের মধ্যেই ঘনশ্যাম জলের রং দেখে—দূরে গাং-এর জলে দু'একটা মাছের চাওলা দেখে বুঝতে পারে মাছের ঝাঁক চলেছে। ও লঞ্চ-এর স্পিড বাড়িয়ে ঝাঁক-এর মাথায় এনে বলে।
—জাল ছেড়ে দে। ঘের পুরো ঝাঁককে।

ওরা কয়েক দিনেই বুঝেছে মাছ তারা অনেকই ধরছে। কিন্তু কোথায় একটা ফাঁক রয়ে গেছে। সেদিন পুরো ইলিশের একটা ঝাঁককে ঘিরে জালবন্দী করেছিল মাতলা নদীর মোহানার মুখে। অকুল গাং—ওখানে নৌকা নিয়ে কোনদিন যেতে পারেনি তারা। ঘনশ্যাম লঞ্চ-এ বেঁধে নিয়ে যায় তাদের। আর ওসব জায়গা মাছের ডিপো।

পুরা ইলিশ ঝাঁকটা ঢুকছে নদীর মুখে উজানে।

নীল জল মাতিয়ে চলেছে রুপালী ইলিশের ঝাঁক। দূর থেকে দেখেছে ঘনশ্যাম।

—মটরা পুরো ইঞ্জিন চালু রাখ। সর্দার—সামনে বিরাট ঝাঁক। লাগাও সাগর জাল—ঘেরো শালাদের। চকিতের মধ্যে ওরাও তৈরী হয়ে ওঠে। লঞ্চের পিছনে বাঁধা পাঁচ ছ'খানা বাছাড়ি নৌকা থেকে জাল পড়ছে, এক একটা নৌকা ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছে লঞ্চ থেকে, ঘনশ্যাম লঞ্চ থেকে নৌকাগুলো রেখে রেখে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলে ঝাঁকটাকে।

…দাপাচ্ছে জল।

লম্বা বাছাড়ি নৌকাগুলো মোহানার মুখে টলমল করছে জালের ভারে। টানছে জালটাকে। ক্রমশ গোলাকার করে জালের ফাঁদটাকে ছোট করে আনে। মধ্যেকার নীল জল তখন রুপালী ইলিশের ভিড়ে সাদা হয়ে আসে। ঝাঁকবন্দী ইলিশ মাছ তুলছে তারা।

নিশাকর হাঁক পাড়ে—হুসিয়ারী তুলবি হাত বাঁইচে! ইলিশের তলপেটটা ক্ষুরের মত ধারালো। নোনা জলে হাত নরম হয়ে থাকে। লাগলে কেটে ফালা হয়ে যাবে।

সেদিন এক খেয়াতেই তারা মাছ তুলেছিল প্রায় খোল বোঝাই। আন্দাজ আড়াই শো তিন শো মণ।

অন্য নৌকার জেলেরা, কাকদ্বীপ-মনসাতলার জেলেরাও বলে—তোমাদের লাগ কে নিতি পারে সর্দার। ঘনাবাবুর মত লোককে পাই গেলা—আর লঞ্চখানাও তেমনি মজবুত। গাং ছেঁকে তোলবা।

এটা তারাও বুঝেছে!

নিশাকর সর্দারদের খাটুনি বেঁচেছে। গোণে বেগোণে আর দাঁড় বাইতে হয় না। সময়ও বাঁচে—ধরে সেরা মাছ। আর ভোরেই আড়তে মাছ দে, খেয়ে দেয়ে আবার বৈকালের আগেই নৌকা নিয়ে চলে আসে, সন্ধ্যার মুখে জাল পাতে।

…কিন্তু একটা কথা তাদের মনে জেগেছে বার বার।

লঞ্চের খোল-এ সরকারী মাপ মত মাল-এর যা ওজন হওয়ার কথা তা হয় না। অবশ্য রোজগার কিছু বেশী হচ্ছে তাদের। আর সে টাকা ঘনশ্যাম ওদের নিতে দেয় না। বলে—দাদনের খাতে শোধ করে দে। হাতে নিলিই খর্চা করে ফেলবি।

তাই করে ওরা। তবু ওজনের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না।

ওরা ফিরছে শেষ রাতে আড়তের দিকে। ঝকঝকে তারাজলা রাত।

কুয়াসাও নেই। স্থির জলে ঝকমক করে তারাগুলো। ওরা ঝিমুচ্ছে নৌকায়। জেগে আছে ঘনশ্যাম—আর মটরা। ইঞ্জিনের একটানা ঝক্‌ঝক্‌ শব্দ ওঠে।

অন্ধকারে দু'একটা নৌকায় টেমি জলছে—মাছ ধরার নৌকাগুলো ছিটিয়ে থাকে গাং-এর বুকে। শান্ত নিথর রাত্রি। ঘনশ্যামের মনে পড়ে কমলার কথা।

তার বাবারও বয়স হয়েছে, মানুষটা জীর্ণ হয়ে গেছে। মনে হয় ঘনশ্যামের ওই জমিগুলো চলে যাবার দুঃখ ভুলতে পারেনি লোকটা।

বাবা প্রায় বলে—রাত বিরেতে গাং-এ না ঘুরে ঠিকাদারীর কাজই নে; তবু চোখের সামনে থাকবি।

কথাটা ভেবেছে ঘনশ্যামও। কমলাও বলে—দিনরাত গাং-এ পড়ে থাকো।

হাসে ঘনশ্যাম। ইদানীং কমলাও কি ভাবছে। বসন্ত কাকাও আর আসে না মাইতি কর্তার কাছে। ইদানীং সে নাকি মহেশ মান্নার ওখানেই কাজ নিয়েছে।

একা একা বাবা চুপচাপ বসে থাকে। রমণ ডাক্তার বলে—ঘনশ্যাম; বাবার কাছেই থাকো। ওর শরীর মন ভালো নেই। কমলাও অনুযোগ করে। পিসী বলে, ওই একই কথা।

সব মুখগুলো ছাপিয়ে কমলার মুখটা যেন নদীর জলে ভেসে-ওঠা তারার মত জল জল করছে। দূরে দেখা যায় নৌকা দু' একটা। সার্চ লাইটের এক ঝলক আলোয় নদীর বুক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কাদের চিৎকার শোনা যায়। আর্ত চিৎকার ইঞ্জিনের একটানা শব্দ ছাপিয়ে কানে আসে।

নিশাকর সর্দারের চটকা ভেঙে যায়।

লাফ দিয়ে ওঠে রতনও। গাং-এ ডাকাতি প্রায়ই হয় মাছের নৌকার উপর। কিছু লোক রাতের অন্ধকারে ছিপ নিয়ে ঘোরে। গরীব অসহায় জেলেরা গহন গাং-এ এসে পড়ে থাকে নৌকায়, তাদের উপরই হানা দিয়ে মাছ কেড়ে নিয়ে যায়, মাছ—তাদের খোরাকী চাল খাবার-টাকাপয়সাও নিয়ে যায়। বাধা দিলে ডাকাতের দল ওদের মেরে গাং-এ ফেলে দেয়।

নিশাচর ডাকাতের দলের উৎপাতে এরা তটস্থ হয়ে থাকে।

কোন নৌকায় ডাকাত পড়েছে বোধ হয়।

ঘনশ্যামের লঞ্চের আলোটা গাং-এর বুক চিরে ঘুরছে জোরালো আভায়; সন্ধানী দৃষ্টির সামনে দেখা যায় কয়েকটা নৌকা থেকে চিৎকার করছে ভীত

ত্রস্ত কয়েকটা মুখ।

—সব নে গেল বাবু!

দূরে দেখা যায় একটা ছিপ—বেশ কয়েকখানা বৈঠা ফেলে জলকেটে ছুটে চলেছে।

নিশাকর বলে—ওই যাত্তিছে শালারা। রতনা—সড়কী নে তৈরী থাক, আম্মা রামদা নিতেছি—কুপাই শেষ করি দিব শালাদের। ছুটবাবু—চালান লঞ্চ!

ঘনশ্যাম দেখছে ওই ছিপটাকে। ইঞ্জিনে পুরো স্পিড তুলে এবার ছুটে চলেছে লঞ্চটা। হাঁকছে সে—থামা—নাহলি লঞ্চ ছিপের উপর তুলি ডাব করি দেবানি হেই শালারা!

এমন বিপদে পড়েনি এর আগে ডাকাতের দল। তারা এ গাং-এ একছত্র আধিপত্য করতো। তাদের কাছে প্রণামী না দিয়ে জেলেরা এ সব দিকে মাছ মারতে আসার কথাই ভাবতো না। যে না দিতো, তাদের উপর এই অত্যাচার হতো।

ঘনশ্যামের নাম শুনেছে তারা। কিন্তু ওই ডাকাতদল যে এ-ভাবে তার সামনে পড়ে যাবে তা ভাবেনি।

একজন বন্দুক ছোঁড়ে—অন্ধকার গাং-এ বন্দুকের গুলিটা শূন্যে উঠে যায় আলোকবিন্দুর মত। টলছে ছিপটা গতিবেগে। লক্ষ্য ঠিক রাখা সম্ভব নয়। তাই এলোপাথাড়ি গুলি বের হচ্ছে।

নিশাকর চমকে ওঠে—গুলি চালাই পালাবার মতলব ছোটবাবু!

ঘনশ্যামের সারা দেহে যেন মাতন জেগেছে। সে শুনেছে ডাকাত দলের কথা। আজ তাদের হাতে পেয়ে সে ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

বেশ বুঝেছে বন্দুক ওদের একটাই আছে। ঘনশ্যাম হিসাব করে নেয় মনসাতলির গাং-এর কাছে এসেছে তারা। এখনও বেশী পথ বাকী, আর গাং এখানে অনেক চওড়া। ওরা ছিপ নিয়ে সহজে পার্টতি দিতে পারবে না।

ওদিকে বেশ কয়েকটা মাছধরা নৌকায় জেলেরাও এবার লঞ্চের ভরসা পেয়ে এগিয়ে আসছে। তারাও সড়কি—ল্যাজা নিয়ে তৈরী। কলরব ওঠে।

—ডাকাতগুলোকে ঘিরে ফেল! গর্জায় ঘনশ্যাম।

দু চারটে গুলি করার পর থেমে গেছে ডাকাতগুলো। কিন্তু পালাবার পথ নেই। সার্চ লাইটের চোখ ধাঁধানো আলোয় ওদের মুখগুলো ঝলসে ওঠে।

ওদিক থেকে এগিয়ে আসছে জেলেডিঙির ওরা—একটা সড়কী উড়ে আসে অন্ধকারে। কাঁচের শার্সিতে লেগে ঝন্ ঝন্ করে কাঁচটা ভেঙ্গে যায়—গর্জে

ওঠে ঘনশ্যাম।

এবার চোখবুজে সে লঞ্চটাকে টপস্পিডে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর্তনাদ—চিৎকার ওঠে। লঞ্চ-এর শক্ত গলুইটা কিসের উপর আছড়ে পড়ে—ছিপ নৌকাটা একেবারে দু' টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে—ভাসছে আহত ডাকাতগুলো।

জেলেনৌকার ওরা ভাসমান মানুষগুলোকে বৈঠার ঘায়ে এবার কায়দা করে ফেলেছে।

ঘনশ্যাম গর্জায়—তোল ব্যাটাদের। সবকটাকে জাল দিয়ে। ডাকাতি করার সাধ মিটিয়ে দেব এবার।

জেলের দলও যেন খ্যাপলাজাল ফেলে মাছ ধরার মত জালবন্দী করে ওদের তুলছে। কারোও হাত ভেঙেছে—মাথা কেটেছে, কাতরাচ্ছে নোনা জলে।

ঘনশ্যাম এই শীতের হিমে ঘামছে। তবু খুশি হয়েছে সে।

নিশাকর বলে—শালারা বোলতাশি, মানসাতলির লোক রে। ওতো বোলতলির হারু—

কাতরাচ্ছে হারু—জানে মারি ফেলো কত্তা, পুলিশে দিবা না—

সকাল বেলায় রতনরা মাছ নিয়ে ফিরছে। আর ঘনশ্যামের লঞ্চ ওই ডাকাতদের নিয়ে গেছে বোলতলির থানায়। সারা এলাকায় খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। জেলেপাড়ার লোকজন নিশ্চিন্ত হয়েছে। সারা এলাকায় ত্রাস। হারু রায়ের দলকে ঘনশ্যাম জালবন্দী করে এনেছে বোলতলি থানায়।

হারু রায়-এর নামে ওয়ারেন্ট আছে আগে থেকেই। কয়েকটা ডাকাতি খুন-এর মামলার আসামী সে। তার দলের আরও দু' চারজনকে খুঁজছে পুলিশ। আজ ওদের হাতে পেয়েছে।

খবরটা সাগর দ্বীপেও ভেসে আসে।

মহেশ মান্নার আড়তে দিনের কাজ সুরু হয় ভোর থেকেই। নিশাকর সর্দারের দলের মাছ এখন প্রচুর আসে। এছাড়া আরও অনেক জেলেনৌকার মাছ জমা হয় এখানের আড়তে। ভোর থেকেই মাছ ওজন সুরু হয়। নৌকাগুলো ফেরে শেষ রাতে—শুকতারা তখনও জ্বল জ্বল করে। ঝাউবনে পাখীর কাকলি জাগে। পুব দিকের আকাশে তখন রং-এর খেলা সুরু হয়—সেই আবীর রং-এর আবেশ জাগে দিগন্তপ্রসারী গাং-এর বুকে।

জেলেপাড়ার বৌ ঝিদের চোখে ঘুম নেই।

গাং ঠাণ্ডা থাকলে তবু কিছুটা স্বস্তি জাগে। নিশাকর সর্দারের বৌ দীর্ঘকাল ধরেই দেখছে এই জীবনকে। বুড়ি হয়ে গেছে; ছেলেটাকে নিয়ে হয়েছে জ্বালা। গুপীনাথ বাবু গোছের। ইদানীং মহেশ মান্নার আড়তে মাছ-এর ঝুড়ি নামা ওঠানো করে। ফুট ফরমাস খাটে—আর সন্ধ্যাবেলায় বাবরী চুলে নেবুতেল মেখে গলায় রুমাল বেঁধে গঞ্জের যাত্রার আখড়ায় গিয়ে সোনা ভানের কেচ্ছা—নাহয়, বনবিবির পালায় গান গায় গুপীনাথ। নিশাকর ওকে বলেও পারেনি। গর্জায় নিশাকর—জেলের বাচ্চা হরি গাং দেখলি না?

নিশাকরের বৌ বলে তুমি যাতিছ যাও গাং-এর বেত্তান্ত আর শেকাত্তি হবেনি। উ—আড়তেই কাজ করবে।

গুপীনাথও মায়ের সমর্থন পেয়ে আড়তেই কাজ নিয়েছে। আয়েসের কাজ। সকালের দিকে কিছুক্ষণ কাজ করে আড়তে। মাছের ঝামেলা চুকলে তারপর মহেশ মান্নার কুঞ্জবনে গিয়ে ফুট ফরমাস খাটে। আর সন্ধ্যার দিকে বাবুদের ওখানে বিশেষ অতিথি এলে সেদিন ভাটিখানায় বসে যায়।

গুপীনাথ মদের নেশাটাও ধরেছে।

আর সেই সুবাদেই তিপ্‌লির সঙ্গে পরিচয়টা ঘটে যায়। মধু নস্করের মেয়ে তিপ্‌লি, বাবার সঙ্গে হাত লাগায় বাবার মদ চোলাই-এর কারবারে।

মেয়েটার সারা দেহে মাতাল করা, নেশাআনা যৌবন। আর তেমনি মুখরা। গুপীনাথ বলে—তোর গতর দেখতি চাইনি দেখলি নেশা লাগি যায়। তা তোর কথাতেই নেশাও ছোটে মাইরী!

তিপ্‌লি বলে—তোর মুয়ে ঝ্যাটা মারি নিশা ছুটাই দিব।

হাসছে গুপীনাথ। কী রঙীন স্বপ্ন দেখে সে। যাত্রার আসরে তিপ্‌লিকে না দেখলে ওর যেন গান আসে না। তিপ্‌লিও সেটা বুঝে এবার চাপ দেয়।

—নোতুন শাড়ি না পরি যাই কুথায় বল?

গুপীনাথ সেদিনই মাইনে থেকে গঞ্জের বাজারে নতুন শাড়ি কিনতে যায়। সেটা হাতে পড়ে ওর মা লক্ষ্মীবালার। মাও দেখেছে ছেলের মতিগতি বদলে গেছে। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে। কিছু বলতে গেলে মাকে গর্জায়—যা খুশী করবো। নিজের রোজকারে করি, কারোও বাপের খাই না বুইলি?

লক্ষ্মীবালা ফুঁসে ওঠে—আপদ! বুড়ো বাপ এখনও গাং-এ এই শীতে ডাউরিতে ঘুরছে নৌকায়, আর তুই আয়েস করে মদ গিলে ফুর্তি করবি? যমডরা কোথাকার? শাড়ি দিয়ে পীরিত করবি ওই মাতালটার বেবুশ্যে

মেয়েটার সাথে ?

—বেশ করবো। তিপলির নামে যাতা বলবি না মা।

লক্ষ্মী বলে—বলবে না? বেবুশ্যে কনারী মদবেচা ছুঁড়ি তোর মাথা খেয়েছে। মাথা খেয়েছে ওই মান্নাবাবুর ওখানে চাকরী। ঝাটা মারি এমন চাকরীর মুখে, কাল থেকে জালে যাবি। না হলে বাড়ি ঢুকবি না।

—কভি নেহি! তোকেই বাড়ি থেকে দূর করে তিপ্‌লিকেই ঘরে আনবো।

…নিশাকর ফিরছে ক্লান্ত দেহ নিয়ে। সারাদিন মাছ ধরেছে। রাতে ওই ডাকাত দলের সঙ্গে লড়াই করে সে ক্লান্ত। কপালে হাতে চোটও পেয়েছে। শীতে কালিয়ে গেছে সারা গা। একটু কবোষ্ণ পরিবেশ—শান্তির বিশ্রামের জন্য ঘরে ফিরছে সে কাকডাকা সকালে।

আর সাত সকালে এই কাণ্ড দেখে তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। গুপীনাথ-এর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে। মদ খেয়ে লুচ্চামি করে তাও জেনেছে। আজ মদ গিলে তার মাকে এই সব কথা বলতে দেখে আর তিপ্‌লির মত একটা বাজে মেয়ের সঙ্গে এতটা ঢলাঢলির কথা শুনে নিশাকর এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার টুঁটি টিপে ধরে গর্জায়—এত বড় বাড় হইছে তোর।

গুপীনাথ-এর নেশা ছুটে যায় মারের চোটে। গর্জাচ্ছে সে—আমার যা খুশী করবো। থাকবো নাই ইথানে—কারোও খাই না।

নিশাকর গর্জে ওঠে—তাই যা। লুচ্চা—বাঁদর কুলাকার। ওই নরকেই যা। মহেশ মান্নাই তুদের মাথা খেয়েছে।

কোন রকমে ওর হাত থেকে ছেলেটাকে ছাড়ায় লক্ষ্মীবালা। সে ভাবেনি নিশাকর এখনই ফিরে এসে এমনি কাণ্ড বাধাবে।

নিশাকর গর্জায়—এখানে থাকবি নাই তু। জানবো ছেলা আমার নাই।

গুপীনাথও জানে তার যাবার ঠাঁই আছে। তিপলিকে বিয়ে করেই সেখানে থাকবে। মাসে মাসে সেও রোজগার করে কিছু টাকা।

তাই গুপীনাথ গর্জায়—তাই যাবো। ইথানের ভাত খাবো নাই। লক্ষ্মীবালা আটকাবার চেষ্টা করে। মায়ের মন। একটা মাত্র ছেলেকে এভাবে চলে যেতে দেবে না সে।

কিন্তু গুপীনাথ গর্জায়—থাকবো নাই। কুন শালার ভাত আমি খাই না —খেটে খাই। কেন থাকবো ইথানে? তুই যেতে দে—খবরদার আটকাবি আমাকে। ই শালো গুপীনাথও মরদ বটে—সিটাই দিখাই দিব।

গুপীনাথ চলে গেল।

লক্ষ্মীবালা কেঁদে ওঠে—ই কি করলা তুমি ?

নিশাকর ভেবেছিল এমনি একটা কাণ্ডই ঘটাবে কোনদিন। এই দ্বীপের জীবনে একটা ঝড় এনেছে মহেশ মান্না। এখানের ভালো মানুষগুলোর মন ভেঙে দেবে, যা যার আছে সামান্য শান্তির ঠাঁই—সেগুলোকে বিষিয়ে দেবে।

গুপীনাথও মদের নেশায়—ওই তিপ্‌লির নেশায় মজেছে. মহেশ মান্নার আড়তে কাজ করতে গিয়েই। নিশাকর বলে ক্লান্ত স্বরে,—যেতে দে বৌ। ও একদিন যেতোই। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্যি গোয়াল ভালো। চুপ যা তুই—

সব শুনে গুপীনাথকে মদত দেয় মান্নাবাবুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ গজেন। বলে সে—বেশ করেছিস গুপে। থাক এই বাগানের ওদিকের চালায়। মান্নাবাবুকে বলে দেব।

গুপীনাথ খুশি হয়। বলে সে তখন রাগের ঘোরে,—তিপ্‌লিকে বলে বেবুশ্যে ?

গজেন মনে মনে হাসে। মেয়েটার ঘরে অনেকেই যায়। গজেনও তার খদ্দের। তবু গজেন বলে—খুব অন্যায় কথা।

দ্যাখো দিনি! গুপীনাথ শোনায়—উদের কথায় নাই। বুঝলা গজেনদা, ওই জেলেপাড়ার মানুষের কাছে ঘনাবাবুই দ্যাবতা। সে শালোর কীর্তি জানতে বাকী নাই। পণ্ডিতের মেয়েটাকে নে কত কত্তা, আর মাছমারা লা নিই যা—শোনলাম মান্নাবাবুর দেনা মিটিয়ে ওরা আর ইখানে মাছ দেবে না। নিজেরাই কাকদ্বীপে মোহান্তের আড়তে—

মহেশ মান্না ঢুকছিল বৈঠকখানায়, তার মাথায় একটা মতলব এসেছে। সামনে গঙ্গাসাগরের মেলার কাজ চুকে গেলে এবার চৈত মাসের মুখেই কাজটা গোপনে সেরে নেবে। তাহলেই ভুবন মাইতিকে চরম আঘাত দিতে পারবে। কাজটা করবে কিনা ভাবছে—কোথায় তার বিবেকেও বাধে, অবশ্য মহেশ এই বিবেক, বিবেচনা-দয়া এগুলোকে এতটুকু পাত্তা দিতে চায় না। এতে গোলমালই বাধে।

আজ হঠাৎ বৈঠকখানায় ঢুকে গুপীনাথের কথা শুনে দাঁড়ালো মহেশ। সেও এমনি একটা ব্যাপারই আঁচ করেছিল। ঘনশ্যাম ওদের দাদনের টাকা অনেক জমা করিয়ে দিয়েছে। অবশ্য মহেশের খাতায় হিসাবগুলোও বাচ্চা পাড়ে। তার খাতায় একবার যার নাম বসে না-মরা অবধি সেই নাম মুছে যায় না।

তবু ভয় হয় মহেশের। আজ নিশাকর সর্দারের ছেলের মুখে খবরটা শুনে মহেশ অনুমান করে জেলেপাড়ায় এসব আলোচনাই হয়।

মহেশ কথাটা শুনে চলে যায় ভিতরে।

গজেনও দেখছে তাকে। ভিতর থেকে কত্তার ডাক শুনে গজেন বলে,—যাই কত্তা।

গুপীনাথকে বলে—তুই থাক। আমি আসছি, কত্তা ডাকছে।

গুপীনাথ পুরোপুরিই মহেশ মান্নার হাতেই নিজেকে সঁপে দিল এইবার।

মহেশ মান্নাও শুনেছে খবরটা। মনসাতলির গাং-এ ডাকাত দলকে তছনছ করে দিয়েছে ঘনশ্যাম। কন্দর্প মাহাতোর এলাকা ওটা। রাতের অন্ধকারে কন্দর্প আর নিতাই নস্করের বেশ কিছু অনুগত লোকজন বাড়তি রোজগার কিছু করে থাকে।

ওই দিকের গাং-এ মাছ ধরতে গেলে ওদের প্রণামী কিছু দিতে হয়, কিন্তু বেশ কিছু মহাজন-এর নৌকা সে সব দেয় না। তাই কন্দর্প রায়ও ব্যবস্থা করেছিল ওদের জেলেদের কিছু শিক্ষা দেবার জন্য। আর লুট করে আনা মাছগুলো আসতো অন্য নৌকায় মহেশ মান্নার আড়তে। সেগুলোও কম নয়। তার থেকে মহেশ মান্নাও বেশ কিছু লাভ পেতো বিনা পরিশ্রমে।

কন্দর্প ভোর বেলাতেই খবরটা পাঠায় মহেশের কাছে।

—ওই ঘনশ্যামই দলবল নিয়ে ওদের চোট করে থানায় দিয়েছে। মালও কিছু পায়নি। এরপর আর গাং-এ ওদের কাজও বন্ধ হয়ে যাবে মান্নাবাবু। ঘনা এবার ভাতে হাত দেবে নাকি?

মহেশ খবরটা শুনে একটু অবাক হয়।

—তাই নাকি। এত কাণ্ড ঘটে গেল?

ভাবনায় পড়েছে ওরা। ঘনশ্যামের শক্ত হাতটা যেন ওই রাতের অন্ধকারের লোভী মানুষগুলোর উপর আঘাত হানতে চলেছে।

গজেন ভিতরে ঢুকে কত্তাকে গুম হয়ে কি ভাবতে দেখে দাঁড়ালো।

মহেশ বলে—আড়তের ওদের হিসাবপত্তর সব যেন ঠিকঠাক থাকে। জেলেদের তাগাদা দে টাকার জন্যে—আর ওদের মাছ-এর ওজনেও যেন হুশিয়ারী করা হয়।

এ কথার মানে জানে গজেন। অর্থাৎ সবগুলো বিষয়েই কারচুপিটা যেন ভালো করেই চলে। মান্নাবাবু মাঝে মাঝে উল্টো ভাষায় কথা বলে রেগে গেলে।

গজেন অবশ্য ওজনের ব্যাপারে নিজেরও কিছু রাখে। কর্তারও থাকে।

সে বলে—ওসব ঠিক আছে কত্তাবাবু।

—হ্যাঁ।

গজেন বলে—গুপীটা ইথানের চালায় থাকবে, ওটাকে রাখবো? বাড়ি ছেড়ে এসেছে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে।

মহেশ বলে ওঠে—ঠিক আছে, থাকুক। তবে যেন বেইমানী না করে।

গজেন হাসে—আজ্ঞে তা করবে নাই।

মাম্না বলে—তুই একবার বসন্তকে ডেকে আন। বলবি—আমি ডাকছি।

ভুবন মাইতিও শুনেছে গাং ডাকাত ধরার কথাটা। এতদিন এই দ্বীপে বাস করছে সে। চেনে কিছু লোককে। আর এই ডাকাত দলকে কোন কোন মহাজন মদত দেয় নিজেদের স্বার্থে তাও জানে।

রমণ ডাক্তার বলে—রাইট। ঠিক করেছে ঘনশ্যাম।

নরহরি ভটচায প্রাত্যহিক পুজো সারতে এসেছিল। সে বলে—তা যা বলেছেন, ওদের ভয়ে রাত বিরোতে গাং পাড়ি দিতে ভয় করে। ঘনশ্যাম একটা কাজের মত কাজ করেছে।

কথাটা কিন্তু ভুবন মাইতির ভালো লাগে না। যদিও দেখেছে সে নৌকার মাঝিরা—বাওয়ালির দল খুব খুশী হয়েছে এই কাজে। তাই চুপ করে থাকে ভুবন মাইতি।

ঘনশ্যাম ফিরেছে ঘাটে। গাং-এর বুকে শীতের রোদ হলুদ থেকে অভ্র রং ধরেছে। নদীর ধারে ভাটার টানে কাদ্‌চে পলি চকচক্ করে, বকের দল কাদায় পড়ে থাকা ত্যাড়া-ভোলামাছের বাচ্চা-লাল কাঁকড়াগুলোকে ধরবার চেষ্টা করে লম্বা পা ফেলে ফেলে চলেছে। ঘনশ্যাম দেখেছে আজ ওর ওই ডাকাতদলকে ধরে নিয়ে যাবার সময় বোলতলি থানার দারোগার মুখখানা বোদা হয়ে ওঠে। খুশি হয়নি সে। বলে—মাছ ধরছো ধরগে, এসব করা কেন? কোনদিন বিপদে ফেলবে তোমাকেই।

ঘনশ্যাম অবাক হয়ে বলে—তাহলে আপনারা কি করতে আছেন? নিজেরা আসামীকে ধরে আনতে পারেন না, আমরা ধরলাম তাতেও জ্বালা। তা এদের নেবেন—না বলুন ছেড়ে দিই।

দারোগাবাবু নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে দেখছে। বলিষ্ঠ একটি যুবক একদল ডাকাতকে ধরেছে।

বলেন তিনি—ঠিক আছে। থাকুক ওরা।

কাকে ডেকে বলেন তিনি—এদের লক আপে রাখো।

ঘনশ্যাম সই সাবুদ করে বের হয়ে আসবে, দারোগাবাবুর কথায় চাইল।

বলেন তিনি—ঘরের খেয়ে বনের মোষ আর তাড়াবে না। বুঝলে? যাও।

অবাক হয়ে বের হয়ে আসে ঘনশ্যাম।

ঘাটে লঞ্চ থেকে নেমে চলেছে বাড়ির দিকে। এসময় লোকজন বিশেষ নেই। ঘাটে নির্জনতা নেমেছে দুপুরের রোদে। বাবার ডাকে চাইল ঘনশ্যাম।

ঘনশ্যাম বলে—শরীর খারাপ, এখনও বাড়ি যাওনি বাবা?

ভুবন মাইতি ওর দিকে চাইল। মনে হয় ঘনশ্যাম যদি তার কথাটা বুঝতো তাহলে বৃদ্ধ বয়সে ভুবনকে এখন তীর্থকাকের মত বৈতরণীর তীরে বসে যাত্রীদের পারাণির কাড়ি কুড়োতে হতো না।

ভুবন বলে—কি করবো বলো, সবই বরাত। তোমাকেও বলে পারলাম না। এদিকে শুনলাম ডাকাত ধরেছ। এসব ঝামেলায় কেন যাও?

ঘনশ্যাম বাবার কথায় যেন দারোবাবুর কথারই প্রতিধ্বনি শুনেছে। এরা সবাই হয়তো জানে ওই ডাকাতি করানোর মূলে অন্য একটা চক্র আছে, সেই চক্রটাকে ঘাঁটাতে কেউ চায় না। তাই সমাজের বুকে অন্যায়গুলো ঘটতেই থাকে। কমে না।

ভুবন মাইতি বলে—ভীমরুলের চাকে ঘা দিতে নেই। তাই বলছিলাম ওসব মাছ ধরার কাজে না থেকে সাগরমেলা আসছে, নিজের লঞ্চ রয়েছে কিছু ঠিকের কাজ পাও তো ছাখো। তারপর মালপত্তর বইতে থাকো। তাতে ঘাটের কাজও দেখা হবে, আর সামনেই থাকবে। দূর গাং-এর বিপদের মাঝে যাওয়া কেন?

ঘনশ্যাম-এর ভালো লাগে না এই মাল টানার কাজ। কোন প্রাণ নেই। গাদাবোট—না হয় ঢাউস মাল বোঝাই নৌকা টেনে ওপার থেকে এপারে আনা মাত্র কাজ।

তার তুলনায় দূর উত্তাল গাং যেন তাকে ডাকে। সেও ভালোবাসে ওই ঊর্মিমুখর গাং-এ ঢেউ-এর মাথায় লাফ দিয়ে যেতে, মাছের ঝাঁক-এর সঙ্গে লঞ্চ ছুটিয়ে ঢেউ-এর সঙ্গে লড়াই করে মাছ-এর দলকে বন্দী করার আনন্দ তাকে মাতিয়ে তোলে। রাত নির্জনে ঢেউ ভাঙা সমুদ্রের খাড়ি বিস্তারে তারাফুল ছড়িয়ে পড়ে—রাতের শুকতারা দেখে মুখানি ধরে নিস্তব্ধ গাং তার সরব অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করার তৃপ্তির স্বাদ জানে না ভুবন মাইতি।

তবু বাবার কথায় কোন মতে বলে ঘনশ্যাম—মেলার ঠিকেদারীর কাজ বলছো দেখছি যদি পাওয়া যায়।

ভুবন আর সে ফিরছে বাড়ির দিকে। ভুবন বলে—তাই ছাখো।

হঠাৎ ওপাশের ক্রশ ভেড়ির রাস্তা দিয়ে বসন্ত পণ্ডিতকে গজেনের সঙ্গে যেতে দেখে চাইল ঘনশ্যাম। অন্য সময় দেখেছে বসন্ত পণ্ডিত এগিয়ে এসে ভুবন মাইতির কুশল সংবাদ নেয়। হাসিমুখে কথা বলে ঘনশ্যামের সঙ্গে।

আজ বসন্ত তাদের দুজনকে যেন দেখেও দেখে না। আর ঘনশ্যাম হঠাৎ গজেনের সঙ্গে বেশ হেসে বসন্ত পণ্ডিতকে কথা বলতে বলতে এদের এড়িয়ে চলে যেতে দেখে চাইল বাবার দিকে।

ভুবন মাইতিও দেখেছে সেটা। ঘনশ্যাম শুধোয়—পণ্ডিতকে দেখলাম গজেনের সঙ্গে যেতে!

ভুবন মাইতি শুনেছে কথাটা। অবশ্য নরহরিই বলেছিল সেদিন। বসন্ত নাকি চাকরী করবে মহেশবাবুর ওখানে। বলে ভুবন মাইতি—ওর এখন মহেশকেই বেশী দরকার ঘনশ্যাম। আমি তো ফৌত—চাকরীও দিতি পারি না। আমাকে আর চিনবে কেন?

বাবার কথাগুলোর মধ্যে একটা জ্বালা আর হতাশার সুরই খুঁজে পায় ঘনশ্যাম, চুপ করে থাকে। বিস্মিত হয়েছে বসন্ত পণ্ডিতের এই পরিবর্তনে। বাবার কথার কোন জবাব দিল না সে, মুখবুজে বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো।

ভুবন মাইতি তেতে পুড়ে ঘরে ঢুকে এবার চাপা রাগটাকে আর সামলাতে পারে না। বলে সে ছেলেকে—ওই সব গাং চষে বেড়ানো ছেড়ে দিয়ে এবার লঙ্ক নিয়ে ঘাটেই থাক। শত্রু বাড়িয়ে লাভ কি? এদিকে মহেশেরও ভালো লাগছে না ওই জেলেদের সঙ্গে তোর মাছের কারবারে নামা।

কারণটা জানে এখন ঘনশ্যাম। সে বলে—একাই লুটে পুটে খাবে ও—তাহলে আমাদের কি হবে? মাছ-এর ব্যবসা একা ওই্ই করবে এদের ঠাকিয়ে?

ভুবন মাইতি ছেলের কথায় বলে—আমার যা বলার বল্লাম এখন যা ভালো বোঝো করো। আমারও শরীর গতিক ভালো নয়। তাই বলছি এবার সাবধানে কাজ কর্ম কর। ঝামেলায় যাস্‌নে।

কমলা এসেছে গিরিবালার কাছে। ওদের গাছে পেঁপে আর কাঁচকলা ফলেছে। ভুবন মাইতির পথ্য এখন শিঙি মাছের ঝোলের সঙ্গে কাঁচকলা আর পেঁপে। তাই গাছের কলা আর পেঁপে দিতে এসেছে।

ইদানীং দেখেছে কমলার বাবাও চায় না সে এখানে আসুক। এতকাল দুই পরিবারের মধ্যে একটা প্রীতির নিবিড় বন্ধনই ছিল। কমলার মাও আসতো এখানে।

কিন্তু ইদানীং কমলা দেখে বাবা মহেশ মান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। মা কাল এখানে আসার কথা বলতে বসন্ত পণ্ডিত খিঁচিয়ে ওঠে—ওখানে আর কেন? ঢের হয়েছে। মাইতি কত্তার এখন নামেই তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। বুঝলে? ওই মেয়েকেও বলো আর যেন বেশী যাতায়াত করে না ওখানে। মহেশবাবুর বাড়িতে বরং যেতে আসতে বলো। ওর গিন্নী তবু খুশী হবে। বাসিনী কেন কমলাও শুনেছে কথাটা। বাসিনী শান্তিপ্রিয় তাই অশান্তির ভয়ে কাল আর সে বের হয়নি। তাজা পেঁপে কলাগুলো পড়ে আছে। কমলাই বলে মাকে—আমি দিয়ে আসছি মা। কাকাবাবু পেঁপে খেতে খুব ভালোবাসে। বাসিনী মনে মনে খুশি হয়।

এসময় বসন্ত পণ্ডিতও ঘরে নেই। মহেশবাবুর ডাকে বের হয়ে গেছে গজেনের সঙ্গে। বাসিনী বলে—যাবি?

কমলা শোনায়—কেন? মহেশবাবু কি আমাদের মাথা কিনে নিইছে যে যেতে পারবো না ওখানে? শোন কথা! যাবো আর আসবো।

কমলা এসেছে জোর করেই। ওই ডাকাত ধরার খবর সেও শুনেছে।

গিরিবালা ওকে ওসব আনতে দেখে বলে—ওমা। কতো পেঁপে এনেছিসরে? ক'দিন দেখা নাই তোর!

কমলা বলে—আসতি পারিনি পিসী! কাকা ভালো আছে তো?

—ওই আছে!

কমলা আর একজনকে খুঁজছে। ঘনশ্যামের দেখা পায়নি দুতিন দিন।

গিরিবালা বলে—ঘনশ্যামকে নে হয়েছে বেপদ। বাবার কথা যদি একটা শোনে ছেলে। লঞ্চ নে কোথায় সমুদ্রে যায়—ভয় ডর নাই।

হঠাৎ ওদের আসতে দেখে চাইল কমলা।

বাইরের ঘরে বাপ ছেলের কথাগুলো শুনেছে সে। কমলারও মনে হয় ঘনশ্যাম যেন আরও বেশী বেপরোয়া, কেমন বেয়াড়া হয়ে উঠছে। ভুবন মাইতিকে উত্তেজিত অবস্থায় দেখে এগিয়ে যায় কমলা—কাকাবাবু! থামকাই কেন বকাবকি করছেন—

ভুবন চাইল কমলার দিকে। শান্ত মেয়েটির ওই ডাকে একটু সান্ত্বনা পায় বৃদ্ধ। বলে—ওসব নিয়ে বকাবকি আর করবো না। যে যা ভালো বোঝে করুক। আমি আর ক'দিন!

কমলা ওর হতাশভরা কণ্ঠস্বরে নিজেই বেদনা বোধ করে। ঘনশ্যামের দিকে চাইল। মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে ঘনশ্যাম। ওদিকের ঘরে গিয়ে

ঢুকলো। কমলা বলে—জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করে নিন। বেলা হয়ে গেছে। তেল মাখিয়ে দেব?

ভুবন মাইতির সংসারে একটা শূন্যতা রয়ে গেছে। মনে হয় ভুবনের তার একটা মেয়ে থাকলে তবু কিছুটা দেখতো তাকে। কমলা যেন সেই ঠাঁই পূর্ণ করেছে। তার ছোটখাটো শাসনটুকুও তাই ভালো লাগে।

কমলা ওর পিঠে তেল মাখাচ্ছে। ভুবন রোদ পিঠ করে বসেছে। ওর শীর্ণ শরীরের কোষে কোষে শীতের সূর্যের কবোষ্ণ উত্তাপ যেন প্রাণের সাড়া আনে।

ভুবন বলে—তোর বাবা আর এখানে আসে না। আমাকে ও ভুল বুঝে গেল রে?

কমলা জানে কারণটা। কিন্তু চাকরী দিতে পারেনি তাই বলে এতদিনের প্রীতিটুকুকে মুছে ফেলতে হবে এটার কারণ সে জানে না।

বলে কমলা—ওর কথা যেতে দেন কাকা। মহেশবাবু নাকি ওকে কাজ দেবে—তাই ওখানেই যাতায়াত করছে খুব।

জবাব দিল না ভুবন। কি ভাবছে সে।

ঘনশ্যাম কি ভাবছে। বাবাকে আঘাত দিতে সে চায় না। কিন্তু দেখেছে ঘনশ্যাম এই দ্বীপের কিছু মানুষ সাধারণ মানুষকে শান্তিতে বাঁচতে দিতে নারাজ। তাদের লোভী হাতের থাবা সর্বত্র ছড়ানো আছে। প্রতিবাদ করতে গেলে অন্ধকারে সেই জীবগুলো অন্যমূর্তি ধরে প্রতিশোধ নিতে চায়। প্রতিকার এখানে করা যেন স্বপ্নই।

—কিরে।

ঘনশ্যাম কমলাকে দেখে চাইল। কমলা এগিয়ে আসে।

খামার বাড়িটায় এককালে বেশ কয়েকটা ধানের গোলা—বড় বড় খড়ের গাদুই ছিল। লম্বা গোয়ালে থাকতো কয়েকজোড়া হালের বলদ দুধেল গাই। এখন কয়েকটায় এসে ঠেকেছে।

এখানেও ভুবন মাইতির জীবনের শূন্যতার বেদনাময় ছবিটা ফুটে উঠেছে।

কমলা বলে—বাবার কথা না শুনে ওকে দুঃখ আর কত দেবে?

ঘনশ্যাম চাইল ওর দিকে।

ছোট্ট মেয়েটা আজ তার চোখের সামনে বড় হয়ে উঠেছে। মুখে চোখে যৌবনের উজ্জ্বলতা, সেই পূর্ণতা এসেছে ওর পুরন্ত দেহে। ঘনশ্যাম কি স্বপ্ন দেখছে।

কমলা বলে—কাল কোথায় ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছো। এদিকে শুনি জেলেদের নিয়ে দল পাকাচ্ছো।

ঘনশ্যামের কাজের কৈফিয়ৎ চাইছে কমলা। ঘনশ্যাম চটে ওঠে। বলে সে—সব দোষই আমার, না রে? ঠিক আছে বাবা যা বলছে করবো। তবে বাবাকেও বলে দিস্ কমলা কারোও পা চেটে দালালী করে তাদের দয়া কুড়িয়ে বাঁচতে পারবে না ঘনশ্যাম। সে মানুষের মতই মাথা উঁচু করে বাঁচবে।

কমলা দেখছে এই নতুন তেজস্বী ছেলেটিকে।

এ মাটির মতই কঠিন—এই গাং-এর মতই দুর্বার সে। কমলা চুপ করে শুনছে ওর কথাগুলো। তারও মনে হয় কথাগুলো সত্যিই। কিছু মানুষ আছে তারা সবকিছুই কেড়ে নিতে চায় অপরের, মায় সুন্দরভাবে বাঁচার অধিকারটুকুও। তার বাবাকেও যেন কিনে নিয়েছে মহেশ মান্না।

বসন্ত পণ্ডিতকে আসতে দেখে মহেশ হঠাৎ জাবেদা খাতার মধ্যে ডুবে যায়। নান কাজ তার। অনেক রকম ব্যবসা। সামনে গঙ্গাসাগর মেলায় রাজ্যের বাঁশ—মুলিবাঁশের বেড়া—হোগলাপাতা ইত্যাদির দরকার। তাও কুড়ো পঞ্চাশ হাজার টাকার মামলা। ঠিকেদারী করে সে আরও নানা কাজের। এই এলাকার সব নৌকা-ডিঙি কিছুদিনের জন্য ভাড়া নিয়ে মাল চলাচল করাতে হয়। তার হিসেব-নিকেশ—টাকা মিটোনোর ব্যাপার আছে। লোকের দরকার। আর বসন্তকে তার চাই কারণ ভুবন মাইতি মায় ঘনশ্যামকে অবধি কিছুটা অসুবিধায় ফেলতে পারবে বসন্তকে হাতে পেলে।

মহেশ মান্না কিন্তু সেটা মুখে প্রকাশ করে না।

বসন্তকে আসতে দেখেও গুরুত্ব দেয় না ইচ্ছে করেই। কোন আগ্রহও দেখায় না।

বসন্ত পণ্ডিত আজ প্রার্থী হয়ে এসেছে। প্রার্থীকে মাথা হেঁট করতেই হবে। স্বয়ং ভগবানও বলী রাজার দ্বারে যখন প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন তাঁকেও বামন রূপ ধারণ করতে হয়েছিল। বসন্ত পণ্ডিত ত তুচ্ছ ব্যক্তি।

বসন্ত বলে—ডেকেছিলেন মহেশবাবু?

মহেশের এবার যেন চমক ভাঙে। ওর দিকে চেয়ে বলে—ও এসেছেন পণ্ডিত। বসুন—কাজটা সেরে নিয়ে কথা বলছি।

বসন্ত তীর্থকাকের মত প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকে।

এতদিন পর পথ পেয়েছে এবার বসন্ত পণ্ডিত।

সদাশয় মহেশ মান্না তাকে সাগর মেলার ঠিকাদারীর কাজে সরকার করে নিয়েছে। টাকাকড়ি মিটোতে হবে লোকজনের। হিসাবপত্তর রাখতে হবে। মহেশ মান্না বলে—দু'চার দিন কাজ করলেই রপ্ত হয়ে যাবে: গজেনও থাকবে সঙ্গে। আর নবীন রায়ও অর্ধেকের অংশীদার। সেও থাকবে। তাহলে কাল থেকেই লেগে যান!

বসন্ত পণ্ডিত কি ভাবছে।

মহেশ মান্না বুঝেছে ওর মনের ভাবটা। বলে সে—পণ্ডিতি করে যা পেতেন তার তিন গুণ পাবেন পণ্ডিত মশাই। টাকার দরকার তো!

বসন্ত পণ্ডিত এবার যেন রূপ বদলাচ্ছে। বলে সে—না! না। ঠিক আছে। কাজ করতেই হবে যখন তখন এসব আর ভাবি না।

হাসে মহেশ—ভালো বলেছেন। আগাম শ' খানেক টাকা রাখুন।

টাকাটা হাত পেতে নেয় বসন্ত পণ্ডিত। এতগুলো টাকা একত্রে অনেক দিন দেখেনি। ওই টাকাগুলো পকেটে পুরে হাল্কা মনে ফিরছে সে।

দুপুরের রোদ অভ্র রং হয়ে ধান ক্ষেতে লুটিয়ে পড়েছে। সোনালী ধান ক্ষেতে বুলবুলি, বনটিয়ার দল কলরব করে, শান্ত নির্জন নদীতীরের বালুচরে ঝাউবনে সবুজ হলুদ পাতা জাগে—সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়ায় কাঁপছে ঝাউবন।

ওদিকে ঘনশ্যামের লঞ্চটা গেরাপি করা হয়েছে। সাদা রাজহাঁসের মত লঞ্চটা দুলছে বাতাসে। মহেশবাবুও ঘনশ্যামের ওই লঞ্চটা কেনায় খুশি হয়নি তা জানে বসন্ত।

হঠাৎ বালুচরে কমলা আর ঘনশ্যামকে দেখে একটু অবাক হয় বসন্ত। কমলার মাকেও বলেছে কালই ঘনশ্যামদের সঙ্গে মেলামেশা কম করতে।

আজ মহেশ মান্নার টাকাটা হাতে নিয়ে বসন্ত বদলে গেছে। তার মনের অসহায় ভাবটাও আর নেই। নিজে টাকা রোজগার করতে পারে—এই ধারণাটা হয়েছে। তাই মেয়েকে শাসন করার অধিকারও আছে তার। এই ব্যাপারে এবার সাবধান হতে হবে বসন্তকে।

বাড়ির দিকে চলছে বসন্ত।

কমলা আর ঘনশ্যামকে আর দেখা যায় না—ওরা ফিরছে গঞ্জের দিকে ভিজে বালুচরে পা ফেলে ফেলে।

বাসিনী টাকাটা পেয়ে একটু অবাক হয়। শুধায় সে স্বামীকে—কোথায় পেলে টাকা? মাইতি কত্তা দিলেন নাকি গ।

বসন্ত পণ্ডিত মুখ খিঁচিয়ে ওঠে। কেন ও ছাড়া কি এখানে টাকা দেবার

মানুষ কেউ নাই? চাকরী নিলাম মহেশবাবুর ওখানে। মাসে দুশো টাকা মাইনে। দুশো। বুঝলে? আর সরকারী চাকরী—দেখে শুনে করতে পারলে বাড়তিও কিছু মিলবে।

বাসিনী একটু অবাক হয় ওখানে চাকরী নেবার কথা শুনে। মহেশ মান্নার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে সে। জেলেপাড়ার কদমও বাড়িতে মাছ দিতে এসে দু'চার কথা শুনিয়েছে। তাছাড়া ওর কাণ্ডও অনেক। বাসিনী বলে—শেষকালে ওর ওখানে সরকারী চাকরি নেলে? ইস্কুলে পণ্ডিতির পদ পেলে না? এতকাল যা করেছো—

ধমকে ওঠে বসন্ত—আর পণ্ডিতি করে কাজ নাই। কী পাবো ওই ছেলে চরিয়ে? এতে তবু দুটো পয়সা আছে।

—অ! বাসিনী দেখছে মানুষটাকে।

একদিনেই মহেশমান্নার টাকার গন্ধ পেয়ে এতকালের স্বভাব—সেই বৃত্তিটাকেই ভুলে গেছে। বদলে গেছে মানুষটা। এ যেন অন্য মানুষ।

বলে বসন্ত—এবার সামলে চলো। সামনে মেলার ঝামেলা চুকে যাক—তারপর মেয়ের বিয়ে থা দেব ভাবছি। মেয়েকে পার করতি পারলে তখন ত্যাবা আর দেবী এই টাকায় দিব্যি চলে যাবে। আর—

ঢুকছে কমলা।

রোদে ওর ফর্সা মুখটা লালচে হয়ে গেছে। কমলা বাড়ি ঢোকার মুখে বাবার কথাগুলো শুনেছে। মায়ের হাতে ধরা টাকাগুলোর দিকে চাইল কমলা।

বাবা ওকে দেখে এবার গর্জে ওঠে—ফেরা হ'ল? এবার থেকে আর টো টো করে বনেবাদাড়ে গঞ্জের এখানে সেখানে ঘুরবি না। ওই মাইতিদের বাড়িতেও যাবি না।

কমলা জবাব দিল না। চুপ করে থাকে।

বসন্ত পণ্ডিত কঠিনস্বরে বলে স্ত্রীকে—মেয়েকে এবার সমঝে চলতে বলো। মহেশবাবুর ওখানে চাকরী করছি। মাইতিকত্তা আর ওই বখাটে ঘনশ্যামের সঙ্গে কোন মাখামাখি থাকুক এ আমি চাই না।

আর মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে তার স্বভাবচরিত্তির থেকে ওই সব বাঁদুরেপনা ঘুচিয়ে দিতে হবে। বুঝলা?

হ্যাঁ—টাকাটা ভালো করে রেখে দাও।

বসন্ত পণ্ডিতের কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্বে আজ একটা নতুন ভাব ফুটে উঠেছে। কমলাও অবাক হয়ে দেখছে তাকে।

ঘনশ্যাম বাবার কথাগুলো ভাবছে, অসহায় মানুষটাকে আঘাত দিয়েছে মহেশ মান্না ওই জমি কেড়ে নিয়ে। ভুবন মাইতি চায় না ঘনশ্যাম মহেশের সঙ্গে সংঘাত বাধাক। কমলার চোখেও দেখেছে নীরব মিনতি। মেলার ঠিকেদারী নেবার কথা ভাবছে।

কালই যাবে মহকুমা শহরে কর্তাদের কাছে।

নিশাকররা নৌকা নিয়ে গাং-এ জাল ফেলছে, থির গাং—ঘনশ্যাম গলুইএ বসে মুক্ত উদার গাং-এর দিকে চেয়ে আছে, জাল ঘিরছে ওরা। ওপাশে কয়েকটা জেলে নৌকাও মাছ ধরছে।

হঠাৎ শান্ত গাং-এ কলরব ওঠে—ওদিকের নৌকার জালটা ফেলে দিয়ে ওরা চিৎকার করে—হাঙর গো—বিরাট হাঙর।

এই গাং-এ মাঝে মাঝে সমুদ্র থেকে বুল শার্ক—হ্যামারহেড শার্ক—বিরাট খড়্গা মাছ এসে পড়ে। মায় হিংস্র টাইগার শার্ক অবধি।

কয়েক বছর আগেও একটা হাঙর খাঁড়িতে এসে বাসা নিয়েছিল নিশাকরদের ডিঙ্গিতে মাছ ধরাই বন্ধ হয়ে গেছল। ঘনশ্যাম সেবার একটাকে মেরেছিল।

হঠাৎ আজ ওদের চিৎকার আর ওই নাম শুনে চমকে ওঠে জেলের দল। ক'দিন আগে পায়রাতলির গাং-এ একটা নৌকা ডুবে গেছে। আজ মনে হয় হাঙরটাই চোট করেছিল তাদের।

নীল মাথিয়ে একবার ঠেলে উঠেছে হাঙরটা। নিশাকর চিৎকার করে—ওই! ওই যে ছোটবাবু!

ঘনশ্যামও দেখেছে সেটাকে। মাঝারি সাইজের জীবটা—তাদের উপস্থিতিতে এতটুকু ভয় না পেয়ে বিরাট পাখনা নেড়ে ভাসছে জলে। হাঁ-টা দেখা যায়—ঝক্ ঝক্ করছে ধারালো দাঁতগুলো করাতের মত।

ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে জাল ফেলে পালাচ্ছে জেলে ডিঙ্গিগুলো। ঘনশ্যাম এসব ব্যাপারে হিসেবী। তার লঞ্চে বাড়তি জিনিসপত্র কিছু থাকে। নাইলনের দড়িতে বাঁধা সড়কিও মজুত থাকে। বড় মাছ নামলাতে লাগে গুগুলো। আর ডাকাত দলের সঙ্গে সেদিন লড়াই-এর পর বাড়ির বন্দুকটাও রাখে লঞ্চে।

ঘনশ্যাম চিৎকার করে—জাল ছেড়ে দিবি না। সর্দার ডবল জাল দিয়ে ঘেরো ব্যাটাকে। মটরা ইঞ্জিন চালু কর। লাফ দিয়ে গিয়ে ঘনশ্যাম হুথানি ধরে লঞ্চটা নিয়ে চলেছে। হাঁকে—নিশাকর—সড়কি দে গাঁথো ব্যাটাকে। দুটো তিনটে সড়কি চালাও। গাঁথো—

ওরাও যেন মেতে উঠেছে।

রতন—নিশাকরের হাতের দড়ি বাঁধা ঝকঝকে সড়কিগুলো গিয়ে হাঙরটার নরম পিঠে গেঁথে গেছে। দো ফলা ওয়ালা সড়কি—গেঁথে গিয়ে মাংসের সঙ্গে গভীর ভাবে বসে যায়।

হাঙরটাও এবার টের পেয়েছে তার শত্রুর অস্তিত্ব।

বাড়তি জাল দুটোও ঘিরে ফেলেছে তাকে। হাঙরটা তলিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। বন্দী হাঙরটা ছটফট করছে।

রক্ত ঝরছে ক্ষত মুখ দিয়ে।

জালসমেত হাঙরটা সমুদ্রের দিকে পালাতে চায়। ফিরে যেতে চায় তার অবাধ মুক্তির জগতে। কিন্তু পারে না। ঘনশ্যাম ফুলস্পীড দিয়ে লঞ্চটা উজানে টানছে পারের দিকে। থরথরিয়ে কাঁপছে লঞ্চটা! দেড়শ হর্স পাওয়ারের মেরিন ইঞ্জিনটা যুঝছে প্রাণপণে।

এদিক থেকে জেলেরাও জালবন্দী হাঙরটাকে টানছে। নিরাপদ দূরত্ব থেকে তার উপর বৈঠা দিয়ে ঘা মারছে মাথার খুলিতে—ফেটে গেছে মাথাটা। ঘনশ্যাম গর্জায়—টান! টান শালাকে!

নীল জল-এর রং বদলে যায়। ভেসে উঠেছে হাঙরের রক্তাক্ত দেহটা। নিশাকর সর্দার—রতন ডিঙির খোলে লাফাচ্ছে—মেরেছি ছোটবাবু। শালাকে মেরেছি গো—ইয়া হাঙর!

ধারপাশের গা বসতি থেকে ডিঙি নিয়ে ছুটে আসে লোকজন। গাং-এ ভিড় জমে।

কাকদ্বীপের ঘাটে ওরা টেনে এনেছে হাঙরটাকে। মহকুমাশহর থেকে স্থানীয় পত্রিকার লোকজন এসেছে। ওখানের ফটোর দোকানদার ছবি তোলে পট পট করে। ঘনশ্যামের সঙ্গে হাঙরটার ছবি ওঠে। বেশ বড় হাঙর।

কে বলে—ওরা এ-গাং আসা শুরু করেছে, বিপদের কথা হে।

নিশাকর শোনায়—এবার এলে আর ফেরতি হবে না। ছোটবাবুরে চেনেনি ওরা।

গজেনও এসেছিল শহরে। ফিরবার মুখে জটলা—হৈ চৈ দেখে সেও এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়। হ্যাঁ—বিরাট বুল শার্ক একটা।

ঘনশ্যামকে দেখা যায় ঘর্মাক্ত কলেবরে ওটার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে নিশাকরদের নিয়ে। খবরের কাগজওয়ালারা—মহকুমার ছোট সাহেবও রয়েছে ওদিকে।

গজেন খুশি হতে পারে না। সেবারও একটা হাঙর মেরেছিল ঘনশ্যাম।

তাই নিয়ে হৈ চৈ হয়েছিল। ওর সাগর দ্বীপের মানুষথেকো কুমীরটা মারার খবরও ছড়িয়েছিল চারিদিকে।

আড়তদার মদন মোহন্ত বলে—ঘনশ্যামবাবু একটা মরদ হে, জলের ডাকাত—হাঙর কুমীরের যম ও। আর সারা গাং যেন ওর নখদর্পণে—

গজেন মুখ বুজে সরে এসে পায়ে পায়ে পারঘাটার দিকে এগিয়ে গেল। সে বুঝেছে ওই হাঙর মারতে গিয়ে আজ মাছ কিছুই ধরেনি ওরা। উল্‌টে জালই ছিঁড়েছে। দামী জাল। মহেশ মান্নার কানে কথাটা তুলতে হবে।

তখনও আড়তের ঘাটে ওদের নিয়ে জয়োল্লাস চলেছে।

গজেন চুপ করে এসে গহনার নৌকায় উঠলো। ব্যাপারটা তার আদৌ ভালো লাগেনি।

নিশাকর সর্দারও আজ খুশি হয়েছে এই জয়ের খবরে।

কাকদ্বীপের বড় আড়তদার মদন মোহান্ত বলে—একটা কাজ-এর কাজ করেছো সর্দার। ঘনাবাবুর মত হুঁশিয়ার ছেলেকে এই পথে এনে। গাং-এর বিপদ-আপদে ওই ছেলেটাই বাঁচাবে এই দিগরের জেলেদের। বোলতলির ডাকাত ব্যাটাদের চালান দিয়েছো—ওদিকে এবার শান্তিতে মাছ ধরতে পারবে. আর গাং-এ হাঙর-এর হানা দু'তিনবার তোমাদের ছোটবাবুই তোমাদের নিয়ে রুখেছে।

নিশাকর সর্দার কেন এই এলাকার সব জেলেরাই সাধারণ মাঝি বাওলিয়ারা আজ কথাটা মানে। গাং-এই তাদের দিন কাটে। সেখানে পদে পদে ডাকাতি—ওই হাঙরের বিপদগুলো থেকে মুক্ত করতে পারে ওই একটি মানুষ।

মদন মোহান্তের অনেক টাকা মাছের দাদনে খাটে, জেলেদের কাজ বন্ধ হলে এদেরও সমূহ লোকসান, তাই আজ মদন মোহান্ত, এখানের সব মাছ মহাজনরাই ওদের কাছে, ঘনশ্যামের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, ঋণী।

মদন মোহান্ত বলে—তোমাদের মাছ এবার আমাকেই দাও হে সর্দার। দাম ন্যায্যই দেব নগদে।

নিশাকর বুঝেছে আজ ঘনশ্যামবাবুর জন্যই তাদের এই মান, খাতির বেড়েছে। ঘনাবাবুকে সহরের বাবুরা নিয়ে গেছে ওই হাঙরটা সমেত ট্রাকে করে। নিশাকর বলে—ঘনাবাবুকে জানাবো। আর কর্তাটা কি জানেন মোহান্ত মশায় মানে দাদন কিছু নেইছি মান্নাবাবুর ঠেঁয়ে, অবশ্যি শোধ তা করতিছি—তবু মনে লয় কিছু আছে ধার বাকী—

মোহান্ত বলে—সেটা ধর দাদন বাবদ যদি শোধ করি দিই—

নিশাকর কথাটা ভাবছে, রতনরাও দেখেছে এতমাছ ধরা বেড়ে গেছে তাদের তবু দামের টাকাটা সেই অনুপাতে বাড়েনি। একটা সন্দেহ জাগে তাদের মনে। বোধ হয় ওজনের কিছু কারচুপি আছে মহেশের আড়তে।

ওরা ছেড়ে দিতেও চায় ওই আড়ত। তাই এই পথ পেয়ে রতন বলে—সর্দার। যা হয় বলি দাও! মাল দিতি দোষ কি তাকে?

নিশাকর বলে—একটু শলা করি দেখি ছোটবাবুর সাতে।

মোহান্ত শোনায়—ত্মাখো। মাছ তো ভালোই ধরছো শুনি—ভালো জিনিসের ভালো দরই দেব সর্দার। আর জাল টাল-এর যদি দরকার হয় আমারও আছে ওসব, পেয়ে যাবে।

ওদের কথাটা আজ ঘনশ্যাম শুনে কি ভাবছে। এখানের ব্যাঙ্কের তরপে ম্যানেজারও প্রস্তাবটা দিয়েছে ঘনশ্যামকে। লঞ্চের কিস্তি সে ঠিক মত দিয়ে চলেছে। কিস্তির চেয়েও বেশী টাকাই জমা দেয় সে।

ম্যানেজার অসিতবাবু বলেন—আপনার মত কাস্টমার পেলে—খুশি হতাম ঘনশ্যামবাবু। এমন পেমেণ্ট চাই না—কিস্তিতো প্রায় শোধ করে আনলেন। এতে ব্যাঙ্কেরই লোকসান।

অবাক হয় ঘনশ্যাম—কেন?

অসিতবাবু বলেন—ব্যাঙ্ক তার সুদ কম পাচ্ছে না?

হাসছে ঘনশ্যাম। বলে সে—ঋণ থাকলে ঘুম হয় না আমার। বাবাও বলে—ওসব শোধ করে দে। তাই যা রোজগার করি দিয়ে যাই।

অসিতবাবুই বলেন—শুনি সরেশ মাছ ধরেন। আর আপনার চ্যালাদেরও তৈরী করেছেন মশায়। তাই বলছিলাম নিজেরাই এবার একটা কো-অপারেটিভ করুন, নিজেদের পরিশ্রমের বেশী লাভতো খায় আপনাদের আড়তদার মহেশবাবু। নিজেরাই এবার এসব করুন।

ঘনশ্যাম ভাবছে কথাটা। এই কথাটা তারও মনে হয়েছে। কিন্তু মহাজনের হাত থেকে সরে আসতে গেলে দাদনের বাকী টাকা নিয়ে গোলমাল বাঁধবে। তাছাড়া চাই জাল—তার দামও কম নয়। পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা।

ঘনশ্যাম বলে—অনেক টাকার ব্যাপার যে ম্যানেজারবাবু। কে দেবে?

হাসেন অসিতবাবু। তিনি জানেন ওদের মাছ বিক্রীর ব্যাপারটা। শুনেছেন দৈনিক কত কুইণ্টাল মাছ ধরা পড়ে। সব জেলেই কথাটা পেড়েছেন। তিনি বলেন—কো-অপারেটিভ করিয়ে নিন, টাকা ব্যাঙ্ক দেবে। আর ওইসব কাগজপত্র করাতে আমিই সাহায্য করবো।

আজও অসিতবাবু এসেছিলেন ঘাটে। বিরাট হাঙরটা মারা পড়েছে ঘনশ্যামের হাতে। তিনিও খুশি হন। নিজেও ছবি তুলেছেন কয়েকটা।

অসিতবাবুও কথাটা মনে করিয়ে দেন আজ। ওই সমবায়ের কথা।

লঞ্চটা ফিরছে এপারের দিকে খাঁড়ি পার হয়ে। বৈকালের নিস্তরঙ্গ গাং-এ দিন শেষের আলো নামছে।

সোনালী হলুদ রং মুছে মুছে গাং-এর বুকে গাঢ় বেগুনী রং-এর আভা জাগে। মেঘমুক্ত আকাশে ভেসে চলেছে গাং চিল—দূর সাইবেরিয়া থেকে আসা চিল—বালিহাঁসের দল। বাতাসে ওঠে ওদের ক্লান্ত ডানার ঐকতান।

নিশাকর সর্দার-এর কথায় মুখ তুলে চাইল ঘনশ্যাম। লঞ্চ চালাচ্ছে মটরা। ঢেউ তুলে ছুটে চলেছে লঞ্চটা। ঘনশ্যাম বলে—ওসব করার হাঙ্গামা অনেক সর্দার। ভেবে দেখি—

নিজেকে যেন এড়াতে চায় না সে। বাবা—কমলার কথাগুলো মনে পড়ে। জানে ঘনশ্যাম তার দলবল যদি মাছ অন্যত্র দেয়, তাহলে মহেশ মান্নার আড়ত কানা হয়ে যাবে। আর ব্যবসা লাটে উঠে গেলে মহেশও মরিয়া হয়ে উঠবে।

বাবা—কমলার কথা মনে পড়ে। বাবাও এটা চান না। ঘনশ্যাম ভাবছে এসব ঝামেলায় যাবে না।

রতনও বসে বিড়ি টানছিল। শুধোয় সে—তাহলে ওই মহেশ মান্না গলাই কেটতে থাকবে—থাউক।

মহেশ মান্না আজ চটে আছে, সকাল থেকে আড়তে মাছ আসেনি। নিশাকর সর্দারের দলও ফেরেনি গাং থেকে। গজেন গেছে সকালে শহরে। নিজেই আড়তে এসেছিল সে। বাইরের বেশ কয়েকজন মহাজন নৌকা—বরফ নিয়ে এসে বসে আছে মাছের আশায়। তারাও তাড়া দেয়—মাছের কি হল মান্নাবাবু?

মহেশ দূর সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। ঝিকঝিক করছে রোদ। নৌকাগুলোর কোন পাত্তা নেই। বেলা হয়ে গেছে। বলে সে—তাই তো হে সুরথ!

সুরথ বলে—আজ্ঞা বরফ গলে জল হয়ে গেল। খদ্দেরও মাল নেবেনি। এমন জানলি মোহান্তের আড়তেই যাতাম। চলোহে—

ওরাও চলে গেল। রাগে অপমানে মহেশ বালির মত তেতে উঠেছে। নৌকাগুলো যেন সব গায়েব হয়ে গেছে।

জেলেবসতির মেয়ে-বৌরা ব্যাকুল চাহনি মেলে বালিয়াড়ির উপর থেকে

সন্ধান করছে দূর গাং-এর বুকে। কালরাতে ঝড় বাদল হয়নি—তাহলে এতক্ষণে কান্নার রোল উঠতো বসতিগুলোয়। অনেকে ঝড়ের পর আর ফেরে না গাং থেকে, ফেরার হয়ে যায় গাং-এর অতলে। কে জানে তেমন কিছু সর্বনাশ হল নাকি!

এরা পান্তা ভাত মাছপোড়া নুন কাঁচা লঙ্কা আর মাটির কলসীতে জল নিয়ে ঘাটে আসে সকালে। রাতভোর সমুদ্রে লড়াই করে মাছ মেরে মানুষগুলো ফেরে রাজ্যের ক্ষুধা তেষ্টা নিয়ে। নৌকা ভিড়লে এরা ছুটে যায়। কিছু মাছের সন্ধানে।

আর রাতজাগা ক্ষুধার্ত মানুষগুলো বালিতে বসে খেতে থাকে। না খেলে যেন দাঁড়াতে পারবে না তারা। সেই ক্ষুধার্ত মানুষগুলো এখনও ফেরেনি।

কদম বলে—কতি গেলগো লোকগুলান। একখান্ নৌকাও ফিরছে না।

মহেশ গর্জন করে—যমের বাড়ি গেছে। এদিকে এত লোকসান হয়ে গেল।

কদম বলে ওঠে—তোমার মুখখান্ এমনিই মান্নাবাবু! এতগুলান মানুষ ছেয়ে বসি আছে। আর তুমি এই কতা বলো?

মহেশ গুম হয়ে আছে।

দেখা যায় পারঘাট থেকে আসছে গজেন। ও বলে—মাছ আজ পাবানি কত্তাবাবু। মাছ লয়—ইয়া এক হাঙর মেরেছে ঘনশ্যাম দলবল মিলে। তাইনে গেছে শহরে। ফটোক তুলছে মালা পড়ছে। মাছ আজ নাই—

—এঁ্যা! গর্জে ওঠে মহেশ—খেলা পেয়েছে নাকি? আর হাঙর মারছে আমার জাল নিয়ে? জালগুলো আছে না ফর্দফাই হয়ে গেছেরে গজু!

গজেন বলে—তা কিছু তো গেছেই গো। বিরাট জানোয়ার সে কি ডুচার খান জাল না খতম করিছে!

মহেশ মান্না গর্জায়—ওদের বাবার জাল পেয়েছে? ওই ঘনা ভাবে কি? আসুক আজ ওরা। একটা হেস্তনেস্ত করছি। এর দাম কে দেবে?

জেলেপাড়ার মানুষগুলো এবার ভিড় করে গজেনকে ঘিরে। কদম শুধোয়—সবাই ভালো আছে তো গ? মানুষগুলান—জেলে বৌ-ঝিদের কাছে এইটাই বড় প্রশ্ন। গজেন ওদের ব্যাকুল প্রশ্নে বলে—দেখলাম তো সব গুলানকেই।

—হাঙরের খবরে ওরা সবচেয়ে বেশী ভয় পায়। ওর হামলায় দূর গাং দু'একটা নৌকা—মানুষজন হারিয়ে যায়। নিশাকরের বৌ শুধোয়—সর্দারকে দেখলা?

গুপীনাথ বাবা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এখন তিপলিদের ওখানেই থাকে। বাবা মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। সকাল থেকে আড়তে আসে। মাছের ঝুড়ি হিসেবে তারও মজুরির বরাদ্দ। কিন্তু আজ মাছই তেমন আসেনি। রোজগার পত্র নাই—তিপ্‌লি পয়সা রোজ না পেলে এখন ধমকায়—খাতি দিব না তুকে মরদ!

গুপীনাথের কাছে খাবারের চেয়ে মদের দরকারই বেশী। আজ পয়সাও পায়নি। তাই গুপীনাথের মেজাজ ভালো নেই। গুপীনাথ ধমকে ওঠে। —থ্যামো দিকি! গাং-এ হাঙর মারতি যাবে। একদিন নিজেই যাবে হাঙরের প্যাটে তখন সর্দারি ঘুচে যাবে।

গুপীনাথের মা ধমকে ওঠে—থামবি তুই সব্বনেশে! ছেলে? শত্তুর। নালে এই কথা বলিস!

সরে গেল গুপীনাথ!

হঠাৎ দূর গাং-এ দেখা যায় সাদা লঞ্চটাকে আসতে। পিছনে কালো সচল বিন্দুর মত নৌকাগুলো বাঁধা। ডেকে রতনকে দেখা যায় গামছা ওড়াচ্ছে। কলরব করে দৌড়লো ছেলেমেয়ের দল তীরের দিকে।

এগিয়ে আসছে লঞ্চটা। পিছনের একটা বড় বাছাড়ি নৌকায় তোলা রয়েছে পাহাড়ের মত মরা হাঙরটা। ওরা ওটাকে এখানে এনেছে।

হৈ চৈ পড়ে গেছে। সারা দ্বীপের মানুষও এসে পড়ে। গঞ্জ থেকে এসেছে সবাই। ভিড়ের মধ্যে একজনকে খুঁজছে ঘনশ্যাম!

কমলাও এসেছে! চমকে ওঠে সে ওই বিরাট জানোয়ারটাকে দেখে। কল্পনা করতে পারে না কিভাবে ওটাকে মেরেছে ঘনশ্যাম দলবল নিয়ে।

—কমলা!

ঘনশ্যামের ডাকে চাইল কমলা। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষটা ফিরছে বাড়ির দিকে।

কমলাও ওকে খুঁজছিল। বলে সে—এমনি জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করতে যাও, এ্যাঁ—এসব করতে আর যেও না তুমি। কোন দিন সর্বনাশ হয়ে যাবে। মা গঙ্গা বাঁচিয়েছেন তোমায়।

হাসে ঘনশ্যাম—ওর চোখের জল দেখে অবাক হয় ঘনশ্যাম। বলে সে—না রে! বাঁচতে গেলে লড়াই তো করতে হবে গাং-এ।

—গাং-এ তুমি যাবে না। কমলা বলে ওঠে—না।

হঠাৎ বালিচরের ওদিকে মহেশের গর্জন শুনে চাইল ঘনশ্যাম। নিশাকর,

রতনরা আসছিল। মহেশ এসে এবার ওদের সামনে ফেটে পড়ে ক্রুদ্ধ গর্জনে —বাপের জাল পেয়েছিস—এমনি করে ফর্দফাই করবি জানোয়ার মারতে গিয়ে।

রতন রুখে দাঁড়ায়। তারাও ক্লান্ত। এতবড় বিপদ থেকে বেঁচে এসেছে তার জন্য এতটুকু সমবেদনা নেই মহেশের কথায়। ও চেনে শুধু টাকা।

রতন বলে—কি মানুষ তুমি মান্নাবাবু। এতগুলো জেবন বলে কতা। বেঁচে এলাম কুনমতে ওটার হাত থেকি। বলো—জাল কেনে গেল ?

মহেশ তবু বলে—মাছও নাই আজ। আড়ত কি বন্ধ করে দেব ?

নিশাকর বলে—গাং-এর বিপদে মাছ ধরতি পারি নাই। পরে পুষিয়ে দেব।

রতন, যতীন—মহীনের দল কি বলতে যায় নিশাকরই ওদের থামায়—চল। এখন ঘরে চল। মাতা ঠাণ্ডা হলি পরে কতা হবে। চলিগো মান্নাবাবু।

ওরা ফিরে আসছে। ঘনশ্যাম শুনছে কথাগুলো। সেও যাচ্ছিল। কিন্তু কমলাই তার হাত ধরে আটকেছে। গর্জাচ্ছে ঘনশ্যাম—শালা জানোয়ার কোথাকার। দেখলি মহেশের টাকার লোভ। দেব একদিন সব লোভ ঘুচিয়ে। শয়তান।

কমলা বলে—এখন থাক ওসব। বাড়ি চলো। সারারাত যুদ্ধ করেছো।

ঘনশ্যাম বলে—যুদ্ধ তো জীবনভোরই করতে হবে রে।

কমলা বলে—করো। তবে বাপু গাং-এ আর যেতে হবে না, কাকাবাবুকেও বলছি এবার।

ঘনশ্যাম চুপ করে চলেছে। বলে সে ওর কথায়—তবে চলবে কি করে ?

—কাকাবাবু যা বলছিল তাই করো। মাল বইতে পারবে—মেলার কাজও পাবে। কমলা বলে চলেছে কথাটা। ক্লান্ত শ্রান্ত ঘনশ্যাম কথাটা আজ ভাবছে নতুন করে। মহেশ মান্নার আড়তে মাছ ধরে আসতে আর যেন সেও চায় না।

হয়তো গাং-এর এই বিপদগুলোকেও এড়াতে চায় সে। দুজনে এগিয়ে চলে বাড়ির দিকে। বালিচরে তখনও কলরব চলেছে। হাঙরের দেহটাকে কেটে ওরা তেল-চর্বি বের করছে। মাংসও বিলি করছে। বাতাসে ওঠে আঁশটে গন্ধ।

ঘনশ্যাম সদরে এসেছে। মেলার কাজ শুরু হচ্ছে। শীতের মুখ—পৌষ

সংক্রান্তির দিন এগিয়ে আসছে। মাঠের ধান কাটার পালাও শেষ হয়েছে। সোনারং-এর ধান এসে উঠেছে খামারে। চাষীদেরও এখন কাজ কম।

মহেশ মান্না লোকজন নিয়ে এবার দ্বীপের শেষ প্রান্তের বিস্তীর্ণ বালুচরে কাজ শুরু করেছে। বড় বড় মাল গুজারী নৌকা থেকে নামছে পাহাড় প্রমাণ হোগলার স্তূপ, বাঁশ আর খড়ও কেনা হচ্ছে প্রচুর। ঘর তৈরী হচ্ছে। তারপর জলের পাইপ বসবে। বিজলির পোল—জেনারেটার বসবে। আর গড়ে উঠবে হোগলার হাজার হাজার অস্থায়ী কুঁড়ে ঘর।

কপিল মন্দিরের পুরোহিত অযোধ্যা প্রসাদজীও হাঁক-ডাক করে—এ ভাই লোক্—মন্দিরকো সাফ করোজী। চুন পলেস্তারা পড়ছে মন্দিরে। সারা বছর নির্জন বালুচরের ঢিবিতে মন্দিরটা দাঁড়িয়ে থাকে। ভক্তের ভিড় থাকে না। বাতাসে ওঠে সমুদ্রের গর্জন। নোনা হাওয়ার দাপটে মন্দিরের চুন-বালি খসে যায়। এখন আবার সাদা কলি ধরিয়ে ঝকঝকে করে তোলে।

মন্দিরে ভগীরথ—গঙ্গামা—আর কপিল মুনির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এখন পাথরের মূর্তিগুলোকে পরিষ্কার করা হচ্ছে। আবার সমাগত ভক্তদের তেল-সিন্দুরের প্রলেপে ওগুলো ঢেকে যাবে।

গজেন-এর হাঁক ডাক শোনা যায় বালিয়াড়িতে—মালপত্র জলদি নামিয়ে ওপারের ডিপোতে চলে যা। দিন ভোর এক খেয়া মাল বইাব নাকি? এ্যা মেলা শেষ হয়ি যাবে তখনও বইবি শালোরা? অ সরকারমশাই—ঠিক ঠিক জমাবন্দী করো কিন্তু। বালিয়াড়ির উপর ঝাউবনের নীচে একটা খড়ো চালা তুলে বসন্ত পণ্ডিতের জন্য একটা আস্তানা করা হয়েছে। পণ্ডিতের পদবীও বদলে গেছে। এখন সে মহেশ মান্নার মেলা ঠিকেদারীর সরকার।

জাবেদা খাতায় বাঁশ—পণদরুণে খড় আর মুলী বাঁশের বেড়ার চটের হিসাব রাখছে। মুনিষজন যারা কাজ করছে তাদের রোজ হাজিরাও রাখতে হয় তাকে। বসন্ত গজেনের ডাকে চাইল।

গজেন বলে—কতো জন মজুরের জমা করছো পণ্ডিত? আর ডিঙ্গি-মাঝিই'বা কজন?

বসন্ত বলে—দেড়শ জন মজুর, আর ষাটখানা ডিঙ্গি।

গজেন চাপা স্বরে বলে ওঠে—ঘোড়ার ডিম! একশো আশিজন মজুর আর চুয়াত্তর খান্ ডিঙির খর্চা লেখো পণ্ডিত। তিরিশ জন মজুর আর চৌদ্দখানা ডিঙির রোজ বেশ কিছু টাকা। সেটা বাড়িয়ে লিখতে হবে শুনে চাইল বসন্ত। গজেনও বুঝেছে ব্যাপারটা। ঠিক এমন তুনম্বরী কাজে বসন্ত পণ্ডিত অভ্যস্ত নয়। তাই বলে বসন্ত—সে কি গো গজেন? এতগুলো

টাকা বাড়তি লেখবো ?

গজেন এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে বলে—একা শালা মহেশ মাম্লাই সব খাবে নাকিগ ? আমরাও কিছু পাই—পেয়ে থাকি। আধাআধি বখ্‌রা পণ্ডিত। নাও লেখি ফ্যালো। ইমন করতি হয় বেহৎ কাজে। বসন্ত অবাক হয়, তার ভাগে পড়বে প্রায় শ'খানেক টাকা। গজেন বলে—আর মেলা বরাবর এমনি বাড়তি হিসাবই লেখবা পণ্ডিত। বছরের এই মরসুমে সবাই কিছু কামিয়ে নেয় সাগর দ্বীপে বাবা কপিল মুনির দয়ায়। আমরা কি অপরাধ করলাম। লেখো—যা কলাম। হ্যাঁ।

হাত কাঁপছে বসন্তের, এসব তার কাছে নতুন। তবু মনে মনে টাকার অঙ্কটা হিসেব করে লোভও হয়। তার মনে এটা নতুন ভাবনা। দুটো দিকই ভাবছে সে।

ইতি উতি করে বসন্ত—মাম্লা মশাই জানতে পারবে না ?

গজেন বলে—জান্‌তে পারবে না কচু। যা বলছি করোতো।

বসন্ত কি ভাবছে।

গজেন দেখছে লোকটাকে। হয়তো ঠিক রাজী হচ্ছে না বসন্তের মত ভালোমানুষের মন এই কাজ করতে। গজেন এবার বেশ কড়া স্বরে বলে —এ কাজ না করলি এখানে তোমার চাকরী থাকবে নি পণ্ডিত। জলে বাস করে কুমীরের সাথে বাদ করোনি। গজেনকে চেনো নি তালি। তোমার চাকরী করতি দেব না ইথানে। বসন্ত চাইল ওর দিকে ভীত চকিত চাহনি মেলে। চাকরীটা তার দরকার। এতদিন যেভাবে বেঁচেছিল এভাবে আর বাঁচা চলবে না সেটা বুঝেছে। সামনে তার লোভ—লালসার জগৎ। এখানে বাঁচতে গেলে এদের সামিল হতেই হবে। নীতি-বিবেকের কোন বালাই থাকলে চলবে না। বাঁচতে তাকে হবেই।

বসন্ত পণ্ডিত বলে—তাই হবে গজেন। তবে কত্তা জানতে পারলে কি হবে ?

গজেন বলে—আমি আছি গো। গজেনকে বখরা দেবে ঠিক ঠিক—ব্যস। সবদিক সামলে দেব। সুমতি হয়েছেন তালি। এ্যাঁ। হাসছে গজেন।

বসন্ত পণ্ডিত এবার দুরু দুরু বুকে খাতায় হিসাবটা অন্য ভাষায় লিখতে থাকে। খুশিও হয় তার মন। দৈনিক এক-দেড়শো টাকা ফালতু আসবে। এমন স্বপ্ন এর আগে দেখেনি বসন্ত পণ্ডিত। তার এতদিনের স্বভাব—নীতিবোধ—সবকিছুই টাকার নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে। যাক্।

মহেশ মান্না ঘুরছে সদরে কর্তাদের দরবারে। এসময় টাকার খেলা চলে। সবকিছুর ঠিকাদারী তার হাতে আসছে। এত মালপত্র এপার থেকে বিস্তীর্ণ খাড়ি পার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মেলার ঘর তৈরী করা, রাস্তাঘাট বানানো বিভিন্ন জায়গায় জলের ট্যাঙ্ক বসানো—ইলেকট্রিক পোল পোতা নানা কাজ।

এক এক কর্তার দরবারে পৌঁচচ্ছে—নধর সাইজের তাজা ভেটকি। প্যাণ্ট কোটপরা নীলাভ সমুদ্রের গলদা চিংড়ি মাছ, না-হয় খামের মধ্যে কিছু টাকা। বিভিন্ন উপচারে পুজো দিয়ে কাজ তুলছে সে।

বয়স্ক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নরেশবাবু মহেশের চেনা। হঠাৎ নরেশবাবু সেদিন তরুণ ঘনশ্যামকে দেখে চাইলেন। বলিষ্ঠ চেহারা, ফর্সা রংটা তামাটে হয়ে উঠেছে সমুদ্রের নোনা হাওয়ায়। চুলগুলো উস্কোখুস্কো।

ঘনশ্যাম এসেছে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে যদি মেলার এত কাজের কোন ঠিকেদারী মেলে তারই চেষ্টায়। এখান ওখানে ঘুরে হতাশ হয়েই এসেছে খোদ সাহেবের কাছে। মনে হয়েছে তার কোথায় একটা অদৃশ্য হাত যেন তার এই চেষ্টাকে পদে পদে বাধা দিয়ে চলেছে।

—কি চাই? ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ভারিক্কি চালে শুধোন।

ঘনশ্যাম নিজের পরিচয়টা জানিয়ে বলে—নিজেরই লঞ্চ আছে স্যার। পারঘাটাও আমাদেরই। তাই এসেছিলাম যদি মালপত্র বইবার কোন ঠিকেদারী পেতাম—

নরেশবাবু চাইলেন ওর দিকে—লঞ্চ চালাবার লাইসেন্স আছে? গাং-এ যাতায়াত করতে পারবে?

ঘনশ্যাম চাইল ওর দিকে। পিছনের দেওয়ালে টাঙান আছে এই এলাকার ম্যাপটা। গাং-খাড়ির সব কিছু রয়েছে তাতে।

ঘনশ্যাম বলে—আমার নাম শোনার কথা স্যারের। ওই ম্যাপে যেসব গাং খাড়ির নাম রয়েছে—সব জায়গাতেই লঞ্চ নে ঘুরেছি মাছ মারতে গে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেন—তাহলে মাছই মারোগে। এসব কাজে কেন?

ঘনশ্যাম চাইল ওর দিকে। এই ঠিকাদারীর কাজ নিতে এসে যেন ভুল করেছে সে। বলেন নরেশবাবু—তাছাড়া এসব কাজ করেন মহেশবাবু, তার টেণ্ডার এ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে। আমার কিছু করার নেই।

ঘনশ্যাম তবু কি বলার চেষ্টা করতে নরেশ বিরক্তিভরে জানান—যা বলার বলেছি। এখন যেতে পারো।

অর্থাৎ তাকে পাত্তাই দিল না ওরা। ঘনশ্যাম উঠে পড়ে। বেশ বুঝেছে এখানে মহেশ মান্না শক্ত ঘাঁটি গেড়েছে।

তারও জেদ চেপে যায়।

ঠিকেদারী তাকে পেতে হবে তাই শেষ চেষ্টাই করবে সে। আর এর শেষ দেখে ছাড়বে। কি ভেবে ঘনশ্যাম সোজা এগিয়ে চলেছে কাছারি-অপিস পাড়া থেকে বের হয়ে এস-ডি-ওর অপিসের দিকেই।

এস-ডি-ও সাহেবের অপিসে গিয়ে দেখে দু'চারজন বাবু চা পান করে বাজারের মাছের দর নিয়ে তুমুল তর্ক জুড়েছে। ওকে দেখে চাইল তারা।

—কাকে চাই?

ওদের দু' একজন চিনেছে তাকে। কে বলে—আপনিই সেদিন হাঙর মেরেছিলেন না?

ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়ে। শুধোয় সে—সাহেব রয়েছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম।

ওদেরই একজন ওকে খাতির করার জন্য বলে—সাহেব তো বাংলোয় রয়েছেন, ওখানে গেলে দেখা হতে পারে। ওইতো নদীর ধারে গাছ-গাছালি দেখছেন—ওখানেই তাঁর বাংলো।

ঘনশ্যাম কি ভেবে বের হয়ে এল। ওখানে সেদিন নিয়ে গেছল তাকে শহরের লোকজন। হাঙরটাকে দেখেছিলেন এস-ডি-ও সাহেব। ওর স্ত্রী, ছেলেমেয়েরাও অবাক হয়েছিল। হয়তো আজ চিনবেন সাহেব ঘনশ্যামকে। সেই ভরসা নিয়েই ঘনশ্যাম এগিয়ে যায় বাংলোর দিকে।

এস-ডি-ও সাহেবের মেজাজটা বেশ খুশি খুশি।

মহেশ মান্না কালই তার মিসেসের জন্য নতুন এক জোড়া মকরমুখী বালা গড়িয়ে এনেছে। মেলাতে গিয়ে তার আতিথ্য গ্রহণের নেমন্তন্ন জানাতে আসবে আজই, আর মহেশ মান্না খালি হাতে কখনও আসে না।

এস-ডি-ও সাহেব তারই আসার জন্য আজ লাঞ্চ-এর পর বের হননি। খাস কামরাতে বসে ফাইলপত্র দেখছেন, হঠাৎ একটি তরুণকে দেখে চাইলেন।

বেয়ারা অবশ্য বাধা দেয়।—এখন দেখা হবে না।

ঘনশ্যাম এসেছে এখানে দেখা করবে বলে। সে জানায়—সাহেবকে বলো সাগরদ্বীপ থেকে ঘনশ্যামবাবু এসেছেন। জরুরী দরকার।

বেয়ারা বলে—এখন দেখা হবে না।

সাগরদ্বীপের নাম শুনে এস-ডি-ও সাহেব ভেবেছেন বোধ হয় মহেশবাবুর লোক, তাই নিজেই বের হয়ে বারান্দায় আসেন। এই ফাঁকে ঘনশ্যাম এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে।

—কি চাই ? মহেশবাবু পাঠিয়েছেন নাকি সাগরদ্বীপ থেকে ?

মহেশবাবুর নাম শুনে ঘনশ্যাম একটু অবাক হয়। লোকটা যে এখানেও আসে তা বুঝেছে। ঘনশ্যাম তবু আশা ছাড়ে নি। নিজের আবেদনটাই জানায় সে। বলে—মালপত্র বইতে পারবো লঞ্চ দিয়ে, গাং-এ কটা হাঙরকেও মেরেছি স্যার। সেদিনও একটাকে মারলাম—আপনিও বকশিশ দিলেন। এস-ডি-ও সাহেব দেখছেন ছেলেটিকে। বলেন তিনি—হাঙর মারলেই কি ঠিকাদারী দিতে হবে ? জানো ছোকরা কত বড় দায়িত্বের কাজ এসব ? মিনিস্টার নিজে থাকবেন—খবরের কাগজের লোকরা আসবে, সারা ভারতবর্ষের মানুষ এসে কোন অসুবিধা দেখলে, ছাড়বে ?

ঘনশ্যাম বলে—আমাকে যেটুকু কাজ দেবেন তা ঠিক সময়েই ঠিকমত করে দেব স্যার। কথা দিচ্ছি।

এস-ডি-ও সাহেব বলেন—তোমার কথায় দাম কি ?

ঘনশ্যাম চাইল ওর দিকে। তার কথার কোন দামই এখানে নেই। কোন পরিচয় স্বীকৃতিও নেই। এই এলাকার মানুষ যা পারে নি—ওই জলের আতঙ্কগুলোকে সে মুছে দিয়েছে, তারও কোন স্বীকৃতি নেই। এ যেন ঘনশ্যামের কাছে অপমানেরই, এখানে কোন কাজই এরা তাকে দেবে না।

ঘনশ্যাম আজ মনস্থির করে ফেলেছে। এবার অন্য পথই নিতে হবে তাকে। ওরা তাকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে বাঁচার কোন সুযোগই দেবে না।

ঘনশ্যাম বলে—কথার কোন দামই যদি না দিতে পারেন—তাহলে অবশ্যি কাজ দেবার প্রশ্নও ওঠে না। ঠিক আছে স্যার—নীচের অফিসাররা অবিচার করছেন ভেবে আপনার কাছে এসেছিলাম—ভেবেছিলাম আমার যোগ্যতার দাম যাচাই করে কাজ দেবেন। তা এক কথায় রায় দিয়ে দিলেন। ঠিক আছে। চলি। নমস্কার স্যার।

এস-ডি-ও সাহেবের ফর্সা মুখটা লাল হয়ে যায় ওর কথায়। ছেলেটা সত্যি কথাই বলেছে, আর বেশ নির্ভয়েই বেপরোয়া ভঙ্গীতেই বলেছে কথাগুলো।

সাহেব চটে উঠেছেন।

নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে ঘনশ্যাম, সামনে মহেশ মামাকে দেখে চাইল। মহেশের পিছনে ঝুড়িতে কি সব জিনিসপত্র নিয়ে একজন লোক আসছে—হাতে একটা নধর ভেটকি মাছও রয়েছে।

ঘনশ্যাম চাইল সাহেবের দিকে। ও বুঝে নিয়েছে মহেশ মান্না এখানেও পুজো দেয়। সুতরাং এমনি জবাব সে এখানেও পাবে। ঘনশ্যাম দাঁড়ালো না। বের হয়ে এল—বাগান পার হয়ে চলে গেল।

মহেশ মান্না উঠে গিয়ে হুজুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করে, আড়চোখে দেখছে সে হুজুরকে। মুখখানা গম্ভীর—ঝড় ওঠার আগেকার গাং-এর মত থমথমে। মহেশ মনে মনে চটে ওঠে ঘনশ্যাম হতচ্ছাড়ার উপর। অসময়ে এখানে ঠেলে এসে ঘনশ্যাম হুজুরকে বিরক্ত করেছে।

মহেশ বলে—ওটার কথা ছেড়ে দিন স্যার। একটা বোকা সোকা কাঠগোঁয়ার ছেলেটা। ওর জন্য ভাববেন না হুজুর। ওকে আমিই নাহয় ছোট-খাটো কাজ দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব। ওটা আমার উপরই ছেড়ে দেন।

হুজুর এবার চাইলেন মহেশের দিকে। ছেলেটার কথাগুলো স্পষ্ট আর সতেজ। মনে পড়ে তাকে দেখেছিল হাঙ্গরটার সঙ্গে সেদিন। ওকে কিছু কাজ দিতে পারলে খুশী হতেন। কিন্তু কোথায় তাঁর নিজের ইজ্জতে বাধে—ওই ছেলেটার সঙ্গে আপোষ করতে।

তাই মহেশের কথায় মনে মনে একটু স্বস্তি পান তিনি। বলেন—দেখুন, তবে নতুন লোককে প্রথমেই এত বড় কাজে আনি কি করে। আইন আছে। কে শোনে কার কথা? স্বাধীন হবার পর সবাই যেন সব উলটো পাল্টা ভেবে চলেছে।

মহেশ এবার ভরসা পেয়ে বলে—দেখছি স্যার কী করা যায়। যাক্‌গে—এসেছিলাম হুজুর, মা জননীরা তাহলে যাবেন—কোন ত্রুটি হবে না। বাংলো বানিয়েছি—লাগোয়া বাথরুম টুম সব আছে। মহেশ গদগদ স্বরে তার অতিথি সৎকারের ফর্দ পেশ করে চলেছে।

তেতেপুড়ে ফিরছে ঘনশ্যাম ঘাটের দিকে। একটা দিক তার দেখার দরকার ছিল। শেষ অবধি সেটা দেখে এবার বিরক্ত হয়েই ফিরছে। বাবা—কমলা চেয়েছিল শান্তিতে সে কাজ করবে। কিন্তু তার অদৃষ্টে ওসব নেই। ঘনশ্যাম এটা বুঝেছে অনেক বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। চুপ করে ফিরে চলেছে সে লঞ্চের দিকে। ঘাটে—সামনের ময়দানে ট্রাকবন্দী জিনিসপত্র এসে জমা করা হচ্ছে। ঘাট থেকে সে সব মাল বয়ে নিয়ে যাবে সাগরে। গাদা বোট—চৌধুরী নৌকা—বেদনাই মহাজনী নৌকাতে মালপত্র উঠছে। ওই কাজের কিছুটা করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু সেইটুকু করার

অধিকারও দেয়নি ওরা ঘনশ্যামকে। সে যেন ওই কাজের যোগ্যই নয়। ধুলো উড়ছে বিস্তীর্ণ চরভূমিতে। ওদিকে অসংখ্য হোগলার চালা উঠছে। পারাপার করার আগে যাত্রীদের থাকতে হবে ওখানে। কয়েক লক্ষ লোক আসবে—সাগরদ্বীপে যেতে হবে নৌকায় নাহয় লঞ্চে। তার সংখ্যাও সীমিত। তাই বহু লোকজনকে পড়ে থাকতে হয় এখানে ওপারে যাবার প্রতীক্ষা নিয়ে।

—ঘনশ্যাম!

হঠাৎ কার ডাকে চাইল ঘনশ্যাম।

মহেশ মান্না ওদিকে সরকারী জিপ থেকে নেমে এগিয়ে আসছে। ওর ডাকে দাঁড়ালো ঘনশ্যাম।

মহেশ এগিয়ে এসে বলে—তোমাকেই খুঁজছিলাম ঘনশ্যাম।

একটু অবাক হয় ঘনশ্যাম। ওর দিকে চাইল—হঠাৎ।

মহেশ মান্না হেসে বেশ মোলায়েম স্বরে বলে—দরকার ছিল হে। মানে সাহেব অবশ্যি খুব খুশি হননি। ওভাবে যখন তখন গে সাহেবদের বিরক্ত করা ঠিক নয়।

ঘনশ্যাম জবাব দেয়—খুশি নাহলে আমার বয়ে গেছে। সাহেবদিকে খুশি করার কোন দরকার আমার নাই। ওদের মুরোদ বোঝা গেছে।

মহেশ মান্না একটু ঘাবড়ে যায় ঘনশ্যামের সাফ্ জবাবে। তবু সামলে নিয়ে বলে—সাহেবদের মতিগতির কথা ছেড়ে দাও। ওদের ঠিকে দেবার আইন কানুন তো আছে। তাই ইচ্ছে থাকলেও দিতি পারে না। যাক্‌গে—আমি অবশ্যি বুঝিয়ে বলেছি।

ঘনশ্যাম ওর দিকে চাইল।

মহেশ বলে—তাই বলছিলাম তোমার লঞ্চ দিয়ে কিছু চৌধুরী নৌকাকে মাল বোঝাই করে পারাপার করে দাও, তোমাকে যা দেবার আমিই দেব।

মহেশের কথায় ঘনশ্যাম এইবার চটে উঠেছে। তবু সংযত স্বরে বলে—অর্থাৎ তোমার হয়ে কাজ করতে হবে। তুমি ভাড়ায় খাটাবে আমাকে, আর লঞ্চটাকে?

মহেশ একটু ঘাবড়ে গেছে ওর কথার ভঙ্গীতে। তবু ওকে নরম করার জন্য বলে—মানে মালপত্র বইবার ঠিকে নেতে এসেছিলে তাই বলছিলাম ওসব তো হোল না। আমার এখানেই কাজ করো কিছুদিন। টাকা আমি ভেলি কে ভেলি দেব।

ঘনশ্যাম এবার চটে উঠেছে। লোকটা সকলের মাথার উপর পা দিয়ে চলতে চায়। সাগরদ্বীপের অনেকেই তার কাছে মাথা নুইয়েছে। এবার

ঘনশ্যামের পালা। ঘনশ্যামের ঠিকেদারীর সব পথ বন্ধ করে আজ তাকেও মহেশ মান্না তার কাছে মাথা হেঁট করে কাজ করার পথই করেছে। ঘনশ্যা গর্জে ওঠে—তোমার টাকায় আমি ইয়ে করি মান্নামশাই। সাগর দ্বীপের আর যাকে কিনতে পারো—কিনো। ঘনশ্যামকে কেনার হিম্মৎ তোমার নাই মহেশ মান্না। কথাটা তোমাকে জানিয়ে গেলাম।

ঘনশ্যাম লাফ দিয়ে নিজের লঞ্চে উঠে তখনও গর্জাচ্ছে—শালা। হারামজাদ, জিভ টেনে ছিঁড়ে দেব। আমাকে কিনবি?

মটরা চমকে ওঠে। ছোটবাবুর দুচোখ জ্বলছে। বলে সে—কি হ'লগ ছোটবাবু।

ঘনশ্যাম চাপা গর্জনের ভঙ্গীতে বলে—কিছু না। যা—ইঞ্জিন চালু কর। ঠিকেদারী, কাজ—শালার কাজে পেচ্ছাব করি। গর্জে ওঠে ঘনশ্যাম—আবে মটরা—বানচোত। চালু কর ইঞ্জিন। গর্জে ওঠে বিরাট ইঞ্জিনটা। প্রচণ্ড শক্তিতে দাপাচ্ছে। ঘনশ্যাম শান্ত নিস্তরঙ্গ ঘাটের জলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে বের হয়ে গেল। ঘাটের নৌকা—ডিঙিগুলো নাচছে ঢেউ-এর মাথায়। তীরভূমিতে এসে ঢেউগুলো সশব্দে আছাড়ে পড়ে কি মত্ত আক্রোশে।

একটা কেওড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে মহেশ মান্না। আজ সেও বুঝেছে সাগর দ্বীপের একটি মানুষের কাছে তার স্বরূপ ধরা পড়েছে। আর সেও এর জবাব দেবে।

বিকটশব্দে হর্ণ বাজিয়ে লঞ্চটা মাঝ গাং-এর দিকে চলেছে। কমলাও জানে ঘনশ্যাম শহরে গেছে লঞ্চের ঠিকাদারীর চেষ্টায়। মনে মনে খুশি হয়েছে সেও। সেদিন হাঙরটা মারার খবর কমলার মুখে শুনে চমকে উঠেছিল ভুবন মাইতি—বলিস কিরে? আগেও দুটো মেরেছে—আবার আজও মেরেছে একটাকে?

কমলা বলে—হ্যাঁ। এটা বিরাট, একখানা বড় ডিঙির মত কাকা। ইয়া থালের মত মুখ, থালার মত চোখ। পিঠটা তিলের উপর ডোরা ডোরা—

—টাইগার শার্ক। ভুবন মাইতি চমকে ওঠে। ওরা জোড়ায় জোড়ায় ঘোরে। আর তেমনি বড়ও হয়—বাঘের মত হিংস্র। মানুষখেকো হয়ে উঠলে মারাত্মক হয়ে ওঠে। ভুবন ভাবছে কথাটা। অন্ত দু'একটা হাঙর তাহলে এখনও রয়েছে। নাহয় জোড়ার একটা পালিয়েছে কিন্তু ফিরে সে আসবেই আরও হিংস্র হয়ে। ভুবন বলে—ওকে গাং যেতে আর দেব নারে। তুইও বল বুঝিয়ে।

কমলা কি ভাবছে কথাটা। সেও বারবার বলেছে ঘনশ্যামকে। তাই

হয়তো ঘনশ্যাম এবার শহরে গেছে। এইখানেই লক্ষ নিয়ে যাতে কাজ পায় সেই চেষ্টায়।

—কমলা।

বাবার ডাকে চাইল কমলা। ক'দিনের চাকরিতেই বাবা যেন এই চিরন্তন অভাবের সংসারের রঙটা বদলে দিয়েছে। মায়ের পরনে সেই লাল পাড় শাড়ির বদলে এসেছে শহরের কেনা মিলের শাড়ি। বাড়িতে দুধ হচ্ছে —দুধেল গাইও কিনেছে। মাছ দিয়ে যাচ্ছে আড়ত থেকে। বাবার হাঁক ডাক মেজাজও বদলেছে। ওর পরনের ময়লা খাটো ধুতি, ফতুয়ার বদলে এখন মিলের ধুতি, পাঞ্জাবী চেপেছে। ছাতাটাও নতুন। পায়ে চটি পরে চাদর কাঁধে বাড়ি ঢুকে হাতের মাটির পাত্রে মিষ্টিটা কমলার কাছে দিয়ে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে যায়—টাকাটা রাখো। হ্যাঁ—ভাত দাও শীগ্‌গীর। চান করে আসছি। এখুনি বেরুতে হবে। কাজের যা চাপ পড়েছে।

বাসিনী টাকার মুখ দেখেছে। খুঁটে টাকাটা বেঁধে বলে—কমলা, তুই আলু বেগুন কুটে দে।

বসন্ত পণ্ডিত বলে—তার আগে বেশ তোয়াজ করে এক ছিলিম তামাক দেমা। খেয়ে চান করি। দাওয়ায় চেপে বসে বলে বসন্ত। বুঝলে কমলার মা, ওই ঘনার মুখে আজ মহেশবাবু ঝামা ঘসে দিয়েছে। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাবি তুই?

কমলা তামাকের টিকে ধরাচ্ছিল। কথাটা কানে যেতে চাইল। বাসিনী খুব খুশী হয়নি কথাটা শুনে। বলে সে—ঘনশ্যাম কি এমন করলো যে এসব হয়েছে?

বসন্ত অবাক হয়—এ্যাঁ। কি করতে যায় নি? শহরে গেছে মহেশবাবুর নামে চুকলি কেটে তার ঠিকেদারীর কাজ ক্যানসেল করে নিজে ওসব কাজ নিতে। এতবড় মুরোদ তোর? আর সাহেবরাও দিয়েছে গলা ধাক্কা দে বের করে। ওই চ্যাংড়াকে দেবে এইসব কাজ। মহেশবাবু অবশ্য সদাশয় ব্যক্তি। ও বলে—ঘনশ্যাম কাজ না পাও, আমি আছি। আমার কাজ করো। তা বাবু কিনা যা তা বলে শাসিয়েছে।

বাসিনী চুপ করে শুনছে কথাগুলো।

কমলা নীরবে হুঁকোর উপর কলকেটা বসিয়ে এগিয়ে দেয়।

যুত করে টানতে থাকে বসন্ত। গজগজ করে—বাঁদর একটা বুঝলে। যাক্ বাপু—ওখানে আর কোন ব্যাপারই নেই আমাদের। তবে কাজটা

ভালো করেনি ঘনশ্যাম। হঠাৎ খেয়াল হয়, এখুনি বের হতে হবে। বসন্ত ক'দিনেই চাকরগিরিতে রপ্ত হয়ে গেছে। বলে—চান করছি। ভাত বাড় বাপু। মাম্নাবাবুও এসে পড়বে মেলায়। উঃ—কাজ আর কাজ।

বাসিনী দেখছে নতুন ওই মানুষটিকে। টাকা পয়সা অবশ্যি আসছে। তবু তার মনে কোথায় একটা কাঁটা খচখচ্ করে বাজে। ঘনশ্যামও আর বড় একটা আসে না এখানে। সেও বোধ হয় তার কাকিমাকে ভুলে গেছে। বাসিনীরও ওবাড়িতে যাবার সাহস নেই—বসন্ত পণ্ডিত বেশ ধমকেই নিষেধ করেছিল সেদিন—খবরদার যাবে ওখানে। তোমার মেয়েও যেন মাইতি বাড়িতে আর না যায়।

বাসিনী জানে কমলা যায় ওখানে। আর সে খবরটা স্বামীর কাছে গোপনই রাখে সে। মেয়েকে ও নিষেধ করতে চায়, কিন্তু পারে না। মা মরা ঘনশ্যামের উপর একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে বাসিনীর।

কমলা খবরটা শুনে গুম হয়ে থাকে। বাবা খেয়ে-দেয়ে বের হয়ে যেতে সেও বের হয়। বাসিনী চাইতে বলে কমলা—একটু আসছি মা।

বাসিনী জানে কোথায় চলেছে কমলা। তবু সাবধান করে—দেরী করিস্‌নি বাছা।

কমলা দেখেছে তাদের গোয়াল থেকে ঘনশ্যামের লঞ্চটাও ফিরেছে। একবার খবরটা জানা দরকার। কমলা বলে—দেরী হবেনা মা। এখুনিই আসছি।

ভুবন মাইতি অনেক আশা করেছিল তার হারানো ঠিকাদারীর কিছু কাজ ঘনশ্যাম আবার ফিরে পাবে। সেই আশা নিয়েই ঘনশ্যামকে এক রকম জোর করেই পাঠিয়েছিল সে শহরে কর্তাদের কাছে।

কিন্তু ঘনশ্যামকে শূন্য হাতে অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে দেখে নিজেও চুপ করে গেছে ভুবন মাইতি। দ্বীপের নির্জনে বসে এতদিন বাইরের জগতের বাইরেই ছিল, এই কতকগুলো বৎসরের মধ্যে বাইরের জগতের রূপটা এমনি আমূল বদলে যেতে পারে ভাবেনি সে।

ঘনশ্যাম বলে—ওখানে কিছুই হবে না বাবা। ওদের মতিগতি বুঝে গেছি। আর ওদেরই বা দোষ কী? ওই মহেশ মান্না ওদের স্বভাবটাকে বদলে দিয়েছে।

এখানেও সেই মহেশ মান্নার কালো হাতের খেলাটা চলেছে। লোকটা যেন এদের সব কিছু চেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দিতে চায়, ছিনিয়ে নিতে চায়।

ঘনশ্যাম বলে—ওই মহেশ মান্না আমাকে তার হয়ে মাল বইতে

বলেছিল।

ভুবন মাইতি অবাক হয়। মনে হয় এ-যেন মহেশের কোন এক চাল।।

ঘনশ্যাম বলে—আমি 'না' করে দিয়েছি বাবা। ওর চাকরগিরি করতে পারবো না। নিজেই যা হয় করবো।

ভুবন ভাবছে কথাটা।

বলে সে—তাই কর। আর সামনে গঙ্গাসাগরের মেলা, তখন তো পারঘাটে লঞ্চই লাগবে। ওই কাজই কর। তারপর দেখা যাবে।

কমলা এসেছে এ বাড়িতে।

ঘনশ্যামকে বাবার সঙ্গে কথা বলতে দেখে ভিতরের বারান্দায় পিসীর কাছে গিয়ে বসলো। গিরিবালা জানে বসন্তের খবর। তবু শুধোয়—তোর মাকে ত দেখিনে আর কমলা।

কমলা জানতে পারে না যে বাবা চায় না যে আর ওরা এখানে আসুক। তবু কমলা আসে কি যেন দুর্বার টানে। পিসীর কথায় কমলা বলে।

একা মানুষ মা সংসার নে ন্যাটা ঝামটা খাচ্ছে। বাবাকেও তো কাজ নিয়ে থাকতে হয়।

গিরিবালা বলে—তা বাপু শুনি মান্নাবাবুর ওখানে কাজ নেছে, কাজ তো করতেই হবে।

ঘনশ্যাম বের হয়ে আসছে কমলাকে বাইরের বাড়িতে দেখে চাইল। এসময় এদিকটা নির্জন।

কমলা শুধোয়—মহেশ মান্নার ওখানে কাজ নিতে গেছলে নাকি?

হাসে ঘনশ্যাম—তুই তাই শুনেছিস নাকি?

কমলা বলে—না। বাবা বলছিল মহেশ মান্না নাকি খুব রেগে গেছে তোমার উপর।

ঘনশ্যাম বলে—তা গেছে হয় তো। গরম দেখাতে আসে আমাকে।

কমলা বলে—সাবধানে থেকো বাপু। লোকটা মোটেই ভালো নয়। আর কাজ নাকি শহরেও পাওনি।

ঘনশ্যাম দেখছে কমলাকে। ওরা জানে না জীবনের চারিদিকে কী ঝড় ঘনিয়ে থাকে। মানুষ নিজের স্বার্থে কতখানি হাত বাড়িয়ে সব কিছু পেতে চায়। ঘনশ্যাম বলে,—পাবো না তা জানতাম। ওদের কাজ করতে চাইনি। শুধু বাবা আর তুই একবার বলছিলি তাই গেছলাম। দেখে এলাম সহজ পথে বাঁচার কোন উপায়ই ওরা রাখে নি, তাই এবার আমাকেও

তৈরী হতে হবে কমলা, বাঁচতে হবেই। তার জন্য দরকার হয় লড়াইও করতে হবে। আর সে পথ নিতে বাধ্য করিয়েছে ওরাই।

কমলা দেখছে বলিষ্ঠ ওই ছেলেটিকে। ভয় হয় তার। বলে সে—আমার ভয় করে বাপু।

দু'চোখে ওর নীরব বিহ্বল চাহনি। ঘনশ্যাম-এর হাতটা ওর হাতে। ওই নীরব স্পর্শ টুকু কমলার সারা মনে বিচিত্র সুর আনে।

ঘনশ্যাম বলে—গাং-এ লড়াই করে হাঙর, কুমীরকে শেষ করতে পেরেছি ডাঙার ওই হাঙরকেও দেখবি একদিন সিধে করবোই।

গঙ্গাসাগর মেলার দিন এগিয়ে আসছে। সারা দ্বীপের মানুষের মনে এসেছে উৎসবের আভাস। বালিয়াড়িতে উঠেছে হোগলার বসত। সারা চর ভরে গেছে। নৌকায়, লঞ্চে, আসছে দোকান পশার। স্তব্ধ সমুদ্রের চরে জেনারেটার-এর শব্দ ওঠে, বালিচরের বিস্তৃত বসতে বিজলি বাতি জ্বলছে, মাইকের সুর ওঠে। মেলার প্রস্তুতি নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে লোকজন।

মহেশ মান্না এর মধ্যেও সেদিনের ঘনশ্যামের কথাগুলো ভোলেনি। ওর লঞ্চ তার চাই, সেই কারণেই মহেশ এবার চাল চেলেছে। মালপত্র এখনও আসছে। মহেশ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে ধরেছে।

—কিছু জরুরী জিনিস এখনও পৌঁছেনি স্যার। একটা লঞ্চ রিকুইজিশন করিয়ে দিন। নাহলে মুস্কিল হবে। এদিকে যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়েছে—

—লঞ্চ। সব লঞ্চতো কাজে লেগে আছে। যাত্রী পারাপার করাতেও লঞ্চ লাগবে। এখন লঞ্চ কোথায় পাই?

পথটা বাত্‌লে দেয় মহেশই।

মেলার ক'দিন মাছের আড়তের কাজ বন্ধ। সব নৌকা, লঞ্চ এদিকের ভিড় সামলাতে ব্যস্ত। মহেশ বলে,—আছে স্যার। ঘনশ্যামের লঞ্চ তো বসেই আছে। সেই যে ছেলেটি কাজের জন্য এসেছিল। সেই লঞ্চ-এর নাম্বার, নাম আমি দিচ্ছি স্যার। ওকেই কাজে লাগান। আমাকে অর্ডারটা দেন—আমি ওটাকে কাজে লাগাই। মাছ ধরা তো এখন বন্ধ!

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেন—তাই করুন গে। এনি হাউ ভিড় জমবার আগেই সব কাজ শেষ করতেই হবে।

সারা ভারতবর্ষ এমনকি নেপাল থেকেও যাত্রীরা আসছে। কেউ ট্রেনে এসে ডায়মণ্ডহারবারে নেমে বাসে ঠাস বোঝাই যাচ্ছে সমুদ্রের খাড়ির এপারে। দল বেঁধে যাত্রীরা আসছে হাওড়া স্টেশন থেকে। বাসগুলো এসে

হাজারো যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে যাত্রী আনতে। আর আসছে দূর দূরান্ত থেকে যাত্রীবাহী বাস বোঝাই করে রাজস্থানী—ইউ—পি—গুজরাটের যাত্রীরা।

গঙ্গা এসে মিশেছে সমুদ্র সঙ্গমে। সেই শেষ দ্বীপের তীর্থ স্নানে চলেছে লক্ষ মানুষ কি আর্তি নিয়ে। সারা গাং-এ দিগন্ত অবধি দেখা যায় ছোট বড় নৌকা চলেছে ভাটার টানে যাত্রী নিয়ে। আগে ওই নৌকাই ছিল সাগর-দ্বীপের তীর্থ যাবার একমাত্র পথ। এখন খাড়ি পার হয়েই বেশী যাত্রী যায়। এপারের বিস্তীর্ণ চরভূমিতে জমেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ পারে যাবার আশায়। নৌকা—ডিঙি—বড় বোটগুলো ব্যস্ত। এক একটা নৌকা যেন উপছে পড়বে যাত্রীদের ভিড়ে।

মাঝিরা চিৎকার করে—আর উঠোনা—ডুবে যাবে নৌকা। কে কার কথা শোনে। ওরা জানে না দীর্ঘ পাড়ি, দুস্তর গাং। মরীয়া হয়ে যেতে চায় সেই তীর্থ দেবতার চরণে, তার জন্ম প্রাণ যায় যাক্।

ভুবন মাইতির ঘাটে এখন দিনরাত্রি সমানে পারাপার চলছে। আর ঘনশ্যামও কাজে লেগেছে এবার। লঞ্চ-এর দুপাশে দুটো বড় গাদা বোটেও উঠছে কয়েকশো করে যাত্রী। ঘনশ্যাম এপার ওপার করে চলেছে।

মটরা বলে—ম্যাষ্টার। ইঞ্জিন আর কত চলবে গো?

ইদানীং মটরা ঘনশ্যামকে ম্যাষ্টার বলেই ডাকে। দেখেছে বড় ইষ্টিমারের সারেংকে খালাসিরা 'ম্যাষ্টার' বলে ডাকে। মটরার পরনে তেলকালি মাখা ফুল প্যাণ্ট, পরনে একটা সোয়েটার—তার রংটাও চেনা যায় না। গলায় রঙীন রুমালটা মাঝে মাঝে মাথায় বেঁধে হিন্দীগানের সুর তুলে সুখানি ধরে। হাঁক-ডাক করে যাত্রীদের ভিড় করবেন না মা। ঠিক পার করে দেব চানের আগেই। ধীর সে—

যতীন ইঞ্জিন চালু করেছে। ঘনশ্যাম দিন রাত্তি কাজ করে চলেছে।

স্বয়ং ডি এম সাহেব, অনান্য অনেকেই আসেন এদিকের অবস্থা দেখতে। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়—ঘাটে যেন জেটি ভেঙে ফেলবে তারা। ঘনশ্যাম হাঁক পাড়ে—লাইন দে আসুন। নালে লঞ্চ ভেড়াবো না।

ওরা বাধ্য হয়েই এঘাটে লাইন বন্দী চলেছে। নিশাকর সর্দার—রতন—যতীনের দল ক'দিন জাল ফেলে রেখে এদিকে এসেছে। ডি-এম সাহেব বলে ঘনশ্যামকে—তোমার এখানে কাজ বেশ ভালো হচ্ছে। অন্ত ঘাটে ত ভিড় সামলানো দায়।

ওদিকে কলরব আর্তনাদ ওঠে। অন্ত অনেক লঞ্চই এসেছে এসময় এখানে

কিছু দমকা রোজকারের আশায়। একটা লঞ্চ বোঝাই হয়ে গেছে। তিলধারণের ঠাঁই নেই। দুদিক থেকে দুটো যাত্রী বোঝাই নৌকা এসে জোর করে বেঁধেছে ওই লঞ্চের গায়ে। নৌকা দুটো টলমল করছে। জল থেকে কয়েক ইঞ্চি মাত্র জেগে আছে। হঠাৎ একদিকে সব যাত্রী চলে আসতে নৌকা দুটোই ডুবতে সুরু করে। আর্তনাদ কলরব ওঠে, আর ডুবন্ত দুই নৌকার টানে গভীর জলে দাঁড়ানো লঞ্চটাও এবার নীচের দিকে টান ধরেছে। সেটাও ডুবে যাবে দুদিকের বাঁধা নৌকা সমেত। চীৎকার ওঠে, গেল, ডুবে গেল।

আর্তনাদ ওঠে—মরগিয়া—হে মা গঙ্গা। ছিটিয়ে পড়েছে যাত্রীরা জলে।

ঘনশ্যাম চিৎকার করে—নিশাকর, যতনা, রতে,—

ওরাও ডিঙি নিয়ে ছুটেছে, লঞ্চটা এগিয়ে যায়। ঘনশ্যাম লাফ দিয়ে পড়েছে ডুবন্ত লঞ্চটার উপর। ধারালো হাসুয়া দিয়ে ডুবন্ত নৌকার বাঁধন রসিটা কেটে দিয়ে এপাশের নৌকার রসিটাও কেটে দিতে ডুবন্ত নৌকা দুটো লঞ্চটাকে ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই তলিয়ে গেল। এই লঞ্চটা বেঁচে যায়।

ওদিকে জেলেদের ছ-সাতটা ডিঙি থেকে লোকজনদের তুলছে। কয়েকটা লাইফ বেল্টও ছুঁড়ে দিয়েছে ওরা লঞ্চ থেকে। অনেকে ওগুলো ধরে ভাসছে। ভেসে গেছে বিছানা—কম্বল, তবু প্রাণে বেঁচে থাকে। ওদের তুলছে ঘনশ্যাম দলবল নিয়ে। আরও কিছু নৌকা এসে পড়ে।

ডি-এম সাহেব, সেই এস-ডি-ও এসে পড়েন। ঘনশ্যাম-এর জামা কাপড় ভিজে, কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। তবু তুলেছে সবাইকে।

ডি-এম সাহেব বলেন—আপনার জন্যই এত বড় বিপদটা এড়ানো গেল ঘনশ্যামবাবু।

কোন রিপোর্টার, পুলিশের কর্তা এসে শুধোয়। তোমার নামটা?

কে আবার ফটোও নেয়। ঘিরে ধরেছে ওরা তাকে। ঘনশ্যামের মনে পড়ে হাজর মারার কথাটা। ওই এস-ডি-ও সাহেবকেও চেনে সে।

ঘনশ্যাম বলে—নামে কি হবে স্যার? আমাকে তো আপনারা কেউ চেনেন না। আর আপনাদের কাছে নাম ফাটবে ভেবেও এসব করি না।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে ঘনশ্যাম ওর নিজের লঞ্চে উঠে হাঁক পাড়ে। —আবে যতনা—তোল, প্যাসেঞ্জার তোল। রাজ্যির যাত্রী পড়ে রইল চানে যেতে পারবেনা—আবার ফটো তোলার, নাম লেখার চ্যামনামি। তারপর আর চিনতেই পারবে না।

মহেশ মান্না থানার দারোগাবাবু আরও দু একজন এর মধ্যে এসে

পড়েছে। যাত্রীরা লঞ্চে-নৌকায় উঠছে। ডেকে দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ারী নজর রেখেছে ঘনশ্যাম, বেশী যাত্রী না ওঠে। ওদিকে জেটির মুখে পুলিশ নিশাকররা ভিড় সামলাচ্ছে। ঘনশ্যাম মহেশের সঙ্গে দারোগাকে দেখে চাইল।

বলেন দারোগাবাবু—এ লঞ্চে যাত্রী যাবে না, মহেশবাবুর মাল বইতে হবে ঘনশ্যামবাবু। যাত্রীদের লঞ্চ থেকে নামিয়ে চলে যান ওদিকে। সরকারের হুকুম।

ঘনশ্যাম চমকে ওঠে। মহেশের দিকে চাইল। সেদিনে ঘনশ্যাম মহেশের মুখের উপর জবাব দিয়েছিল ওর কাজ সে করবেনা। তাকে লঞ্চও দেবে না। আজ মহেশ তারই জবাব দিয়েছে। ওর বলিষ্ঠ মুখ চোখে তার হাসিটা ফুটে উঠেছে।

বলে সে—তাহলে চলো ঘনশ্যাম। মহেশ মান্নার কাজই করবে চলো।

ঘনশ্যাম যেন চীৎকার করে উঠবে এইবার। মটরাও এসেছে, রতন—নিশাকররাও দেখছে। হার মানতে হবে এবার তেজী ছেলেটাকে। দারোগা-বাবু তাড়া দেন—চলুন। কুইক। ঘাট ছেড়ে লঞ্চ নিয়ে চলুন।

ঘনশ্যাম কী ভেবে লাফ দিয়ে নেমে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়। মহেশ বলে—চল্লে কোথায় কাজ করতে হবে না?

ঘনশ্যামের মনে হয় ওর টুঁটি টিপেই ধরবে। কিন্তু তা ধরলো না। সে বলে—আসছি।

ওদিকে ডি-এম, এস-ডি-ও সাহেব পুলিশের বড় সাহেবরাও রয়েছেন। আহত—জল থেকে তোলা কয়েক শো লোককে চিকিৎসা করছে মোবাইল হাসপাতালে। ওঁরা সেখানেই এসেছেন।

—স্যার। ডি-এম হুজুর।

হঠাৎ সেই ছেলেটিকে জলকাদা মাথা অবস্থায় এখানে আসতে দেখে ডি-এম সাহেব শুধোন—কি ব্যাপার?

ঘনশ্যাম এগিয়ে এসে বলে—নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে একটা কাজ করলাম আর হাতে হাতে তার জন্য এমনি পুরস্কার দিলেন? তাজ্জব স্যার আপনারা!

ডি-এম সাহেবকে এধরনের কথা কেউ বলতে পারে ওর চেলাদের জানা ছিল না। কে ধমকে ওঠে—কি বলছো?

ডি-এম সাহেব কৌতূহলী চাহনিতে তরুণ ঘনশ্যামকে দেখছেন। ওর বলিষ্ঠতা—সাহস-এর পরিচয় আগেই পেয়েছেন। খুশী হয়েছেন। বুঝেছেন তিনি—ওর কথাগুলোও সতেজ আর স্পষ্টই হবে। তিনি সঙ্গের পুলিশ সাহেবকে ইঙ্গিতে থামতে বলে শুধোন—কি হ'ল ঘনশ্যামবাবু?

—চিনেছেন তাহলে? স্যার তখুনি আপনি বললেন—পারঘাটের যাত্রী পারাপারের দিকে নজর রাখুন। আর এখুনিই আপনারা দারোগাসাহেব ঠিকাদার মহেশবাবুকে নে গিয়ে বলেন—সরকারের হুকুম, তোমার লঞ্চ যাত্রী পারাপার করবে না। যাত্রী নামিয়ে দিয়ে মহেশবাবুর মাল টানতে হবে। ওর গোলামী করতে হবে। তাহলে স্যার এখানের কর্তা আপনি না ওই দারোগা আর তার চামচে মহেশ মান্না? কার হুকুম মানবো স্যার।

—সেকি! ডি-এম অবাক হন কথাটা শুনে। তিনি নিজে দেখেছেন ঘনশ্যামের দলবল আর তার নিজের ক্ষমতাটা, তাই পারঘাটে যাত্রী বইবার কাজে তাকেই রাখতে চান! শুধোন তিনি—পারঘাট-এর ইজারা তো আপনাদের।

ঘনশ্যাম জানায়—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে আপনার লঞ্চ কেন নেবে তারা? কে হুকুম দিয়েছেন?

ঘনশ্যাম বলে—তা জানি না স্যার। মহেশ মান্না দারোগাকে এনে বলে সরকারের হুকুম ওঁর কাজ করতে হবে। শুনে রাখুন স্যার—ঘনশ্যাম ও হুকুম মানবে না। তাতে জেলে নে যাতি হয়, নে চলেন।

হাসলেন ডি-এম সাহেব। বলেন তিনি—চলুন দেখে আসি ব্যাপারটা।

এস-পিও চলেছেন সঙ্গে।

মহেশ মান্না বিজয়ীর মত হুকুম করে—মটরা, লঞ্চ খালি করে দে। এবার মাল বইতে হবে—নিশাকর, কোথায় গেল ঘনশ্যাম।

নিশাকররাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বলে সে—তা তো জানি না।

মহেশ বলে—সরকারের হুকুম না মানলে কোমরে দড়ি পরিয়ে নে যাবে।

দারোগাবাবুও বলেন—অর্ডার মানতেই হবে। কোথায় গেল ঘনাবাবু? কোথায় যায়—

হঠাৎ ভিড় ঠেলে স্বয়ং ডি-এম, পুলিশ সুপারের সঙ্গে ঘনশ্যামকে আসতে দেখে অবাক হয় মহেশ মান্না। দারোগাবাবুর গলাও এক নিমিষে চুপসে গেছে। পা ঠুকে ঠকাস করে স্যালুট করে সে। মহেশও আভূমি নত হয়ে বলে—নমস্কার হুজুর। লঞ্চটা পেলেই বাকী মাল এখুনি বইতে শুরু করছি। এ্যাই ঘনশ্যাম—

দারোগাবাবুও অর্ডার করে—যাও ঘনশ্যাম, হুকুমমত কাজ করো। জলদি —লঞ্চ নিয়ে চলে যাও গোডাউনে।

ডি-এম সাহেব বলেন—অর্ডারটা দেখি।

দারোগাবাবু মহেশ মান্না হুমড়ি খেয়ে পড়ে হুকুম তামিল করে অর্ডারটা

দেখিয়ে। ডি-এম সাহেব কাগজটা দেখে মহেশবাবুর দিকে চেয়ে শুধোন।
—আপনিই মাল বইবার ঠিকাদার ?

—হাঁ হুজুর।

—মেলার তিন দিন আগে আপনার সব মাল ওখানে পৌঁছে দেবার কনট্রাক্ট, আজ অবধি মাল যায় নি কেন ?

মহেশ মান্না একটু ঘাবড়ে যায় ওঁর কথার স্বরে। আমতা আমতা করে।
—ঠিক পেরে উঠিনি স্যার।

ডি-এম সাহেব বলেন—না পারলে আপনার কশন মানি থেকে সে খরচ কেটে নেওয়া হবে। সরকার নিজেই মাল নিয়ে যাবে। তার জন্য কোন অন্ত লঞ্চ আপনাকে রিকুইজিশন করে দেওয়া হবে না। আমি এই অর্ডার ক্যানসেল করে গেলাম।

মহেশ চমকে ওঠে। তার সব চাল ব্যর্থ করে দিয়েছে ঘনশ্যাম, শুধু তাইই নয় তার আর্নেষ্ট মানি থেকেও কয়েক হাজার টাকা কাটা যাবে, বদনাম হবে তার। আর তার জন্ত এ কাজও ভবিষ্যতে হারাতে হবে, নাহয় দ্বিগুণ নজরানা দিয়ে সামনের বছর কাজ পাবার চেষ্টা করতে হবে।

ডি-এম সাহেব বলেন—যে ভাবে হোক আজই সব মাল নিয়ে যেতে হবে অন্য কোন উপায়ে। পারঘাটার এই লঞ্চ আপনি পাবেন না—এখানেই উনি থাকবেন। দিস্ ইজ মাই অর্ডার। যান ঘনশ্যামবাবু—যাত্রীদের পারাপার করুনগে। ডি-এম সাহেব—চলে গেলেন অর্ডারের চিরকুটখানা হাতে নিয়ে। এ নিয়ে হয়তো জল ঘোলা হবে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকেও তলব করবেন। আর তিনি ঝাল ঝাড়বেন মহেশ মান্নার উপর। দারোগাবাবুও গুম হয়ে গেছেন চুপসে যাওয়া বেলুনের মত।

ঘনশ্যাম বলে—চলি স্যার। চলি মহেশবাবু। হঠাৎ তীক্ষ্ণ সিটির শব্দে চাইল সকলে। মটরা প্যান্ট পরে গলায় রুমাল বেঁধে সারেং-এর ঘরের ছাদে উঠে মুখে আঙুল পুরে বিকট শব্দে সিটি বাজিয়ে হাঁকতে থাকে—লঞ্চ ছাড়ছি—পারে যাবে। পা—রে।....

ঘনশ্যাম যাত্রী বোঝাই লঞ্চ নিয়ে—ছ'পাশে দুটো যাত্রী বোঝাই গাদাবোট টেনে মাঝ গাং এর দিকে চলেছে। মহেশ মান্না গুম হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে। তার এই চালটা ঘনশ্যাম এমনি করে ভেস্তে দিয়ে উল্টে বিপদে ফেলে যাবে তা ভাবতেও পারেনি। চাপা রাগে ফুঁসছে সে।

সমুদ্রের এলোমেলো হাওয়া বইছে। হোগলার ছাউনি ভেদ করে রাতের

পুরু হিম কণা কণা শিশির বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মাথায় ছাউনি অবধি নেই। ভিজে বালিচরে খড় দুচার আটি কিনে তাতেই শুয়ে আছে কম্বল মুড়ি দিয়ে। ভোর থেকেই কলরব শুরু হয়। লাখ কণ্ঠের কলরব। সামস্তোত্র ধ্বনি ওঠে মাইকে।

ভারত সেবাশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকরা—অন্য বহু সংস্থার ভলানটিয়াররা উঠে পড়েছে। ওই শীতে রাতের শেষ আঁধারে তারা দাঁড়িয়েছে সমুদ্রের জলে—মোক্ষস্নান-এর লগ্ন শুরু হয়েছে। যাত্রীদল চলেছে সমুদ্র স্নানে—ঘন কুয়াসা মুছে মুছে যাচ্ছে। পূর্ব আকাশ-এর বিস্তীর্ণ আঙিনায় চলেছে সূর্যোদয়ের পূর্ব রাগ।

—দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে।

ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে—

আকাশ বাতাসে ধ্বনিত হয় গঙ্গাবন্দনার সুর। কোন যুগাতীত কাল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে এই তীর্থে—এই লগ্নে স্নান করেছে পুণ্য সাগর সঙ্গমে। দেবতাকে অর্ঘ্য নিবেদন করেছে। আজও মহামিলনের ধারা ভারতের বুকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

নরহরি ভটচায এখন ব্যস্ত। তার ভাইপো—জামাই—আরও দুচার জনকে এনেছে। ওদিকে কয়েকটা তক্তপোষ পেতেছে জলের ধারে। কিছু কুচো ফুল, শুকনো নারকেল কয়েকটা আর একটা এঁড়ে বাছুর গ্রাম গঞ্জের বাড়ি থেকে এনে বেঁধে রেখেছে।

মন্ত্র হাঁকছে—ওঁ—গঙ্গাযমুনাশ্চৈব গোদাবরী—

রুপেয়া দাও। দশ রুপেয়া ব্রাহ্মণ দক্ষিণা। আর বৈতরণী পার হোয়গা—বিশরুপেয়া গরুর দাম, দেও।

দরদাম করার সময় নেই। দশ বারো টাকা যা পায় তাই কুড়িয়ে চলেছে। ভিড়ের শেষ নেই। আর ওদিকে চড়ার একপাশে বসেছে গদাই নাপিত। সে পাইকেরী দরে ন্যাড়া করে চলেছে। আর তারা এসে পড়ছে নরহরির খপ্পরে।

নরহরির শীর্ণ দেহে মত্ত হাতির বল এসেছে। কোরাসে মন্ত্র আবৃত্তি করে বলে—স্নান করো। ডুব দেও—সব পাপ চল যায়গা।

একজন গাট্টা-গোট্টা পুণ্যার্থী শুধোয়—চাচাকো মারা, কিস্‌কা জমিন লে লিয়া, কোন আউরৎ কো ফাঁসায়া—এ ব্রাহ্মণজী।

নরহরি তক্তপোষ থেকে এবার হাঁটুভোর কাদা গোলা জলে লাফ দিয়ে পড়ে সেই পুণ্যার্থীর ন্যাড়া মাথা ধরে একবার চুবিয়ে বলে—চাচাকে মারার

পাপ চলা গিয়া। ফিন্—

আর একবার চোবান দিয়ে বলে—জমি চুরি করার পাপ ভি চলা গেল। ফিন্—

এমনি করে অনেকের অনেক পাপ মুক্ত করে বলে—দেও পঞ্চাশ রুপেয়া।

রফা হয় বত্রিশ টাকায়। ওদিকে ছেলেটা এগিয়ে আসে ভাঁড়ের চা নিয়ে। শীতে হিমে জলে কাদায় নেমে কাঁপছে নরহরি। চা খেয়ে গা তাতিয়ে আবার আসরে অবতীর্ণ হয়। বলো—ওঁ।....

বসন্ত পণ্ডিত ক'দিনে বেশ রোজকার করেছে। এখনও মেলার অনেক কাজ বাকী। মেলা বসার আগে থেকে আর মেলা ভাঙার পরও কয়েকদিন ধরে যতসব মালপত্র খুলে পাঠাতে হবে ওপারে। তার কুলিদেরও মজুরি দিতে হবে। মাঝিদের টাকা মিটোতে হবে। তবে মেলার কাজ ফুরোবে। বসন্ত চায় মেলা যেন দীর্ঘ দিনই চলুক। তার চাকরিটা বহাল থাকবে।

মেলার ওদিকে তেরপলের তাঁবুর নীচে অপিসঘর করা হয়েছে। কিছু মজুরকে বসিয়ে রাখতে হয়েছে কখন কোথায় দরকারে লাগে। মহেশ মান্নাও ব্যস্ত। কর্তারা আসছেন—কফি—বিস্কুট আনা হচ্ছে। ওই মাঝেই বসন্ত শুনেছে ঘনশ্যামের সঙ্গে লঞ্চ নিয়ে ব্যাপারটা।

গজেন বলে—আমি ছিলাম না কত্তা। তাহলে ঘনার রোয়াবি ঠাণ্ডা করে দিতাম। ওই নিশাকরদেরও দেখে নিতাম। পরক্ষণে বলে সে—ঠিক আছে। এক মাঘে শীত পালায় না। মেলার ঝামেলা চুকুক। তারপর তো আড়তে আসতেই হবে। দেখে নোব ব্যাটাদের। এ্যাই গুপীনাথ—ওদিকে সব ঠিক আছে।

গুপীনাথও এখন গজেনের পিছনে লেগে আছে। বলে সে—হ্যাঁ গো। চলেন কোম? ভালো জিনিস-এর খবর আনছু—

দুজনে এগিয়ে চলেছে বালিয়াড়ির ওদিক দিয়ে। মেলার কোলাহল-এর বাইরে এই দিকে এখনও কিছু গরান সুন্দরী গাছ ঠিক আছে। ধান ক্ষেত ছিল এদিকে। এখন ধান উঠে গিয়ে সারবন্দী হোগলার চালা গড়ে উঠেছে।

ওপরের মেনল্যাণ্ড—মেদিনীপুরের দিক থেকে বড় গাং পাড়ি দিয়ে এসেছে দেহপসারিণীর দল। গঙ্গাসাগর তীর্থের মহিমা তাদের মনের কালোকে মুছে দিতে পারেনি। ওরা এসেছে ব্যবসার পশরা নিয়ে। পশরা তাদের নাচ গান আর দেহটাও।

নাও ওস্তাদ।

গুপীনাথ গজেনকে খুশী করার জন্যে এনেছে তিপলির হাতের তৈরী এক

নম্বরী মদ। মেলায় মরশুমে ওদের বাণিজ্যও জোর চলেছে। আবছা অন্ধকার ছড়ানো এখানে। সমুদ্রের গর্জন ওঠে। গজেনের চোখের সামনে একটা মাংসল দেহের আবেশ তাকে যেন কোন গহনে নিয়ে চলেছে। গুপীনাথ টাকা ক'টা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে কিছু মানুষ এখানে কী উন্মাদ বুভুক্ষা নিয়ে ফিরছে। গুপীনাথও এই অবকাশে কিছু রোজকার করে নিতে চায়।

তিপ্‌লি ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। ওদিকের একটা চালা ঘরে মদের বেসতি নিয়ে বসেছে মেয়েটা। রোজকারও বেশ হয়। গুপীনাথ এখান ওখানে ঘুরে কিছু মাল বেচে, আর বেশ কিছু লোকও তীর্থে এসে এই দ্রব্যের সন্ধানে ঘোরে। রাত্রি হয়ে গেছে। তিপ্‌লি মালপত্র বেচে গ্রামের দিকে যেতে পারে না। শীতের রাত্রি, কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। তাই গুপীনাথ বলে—এখানেই থাক।

মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছিল—হঠাৎ কাকে ঝাঁপ ঠেলে ঢুকতে দেখে ঘুম জড়ানো চোখে চাইবার চেষ্টা করে।

—কে। জড়িত কণ্ঠে শুধোয় সে। তিপ্‌লিও মদ গিলেছে। চোখ জড়িয়ে আসে। মনে হয় গুপীনাথই ঢুকেছে। হঠাৎ কার বলিষ্ঠ হাতের নিবিড় আলিঙ্গনে চমকে ওঠে মেয়েটা। মদ বেচে সে—গঞ্জে এখানে ওখানে ফষ্টি নষ্টি করে, কিন্তু অন্য কেউ রাতের অন্ধকারে তার সর্বস্ব লুটে নেবে তা ভাবতে পারেনি। নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে তিপ্‌লি। কিন্তু পারে না। শক্ত দুটো কঠিন হাত ওকে ধরে পিষে ফেলছে, সারা শরীরের নিবিড় চাপটা ওকে যেন ধীরে ধীরে সম্মোহিত করে তুলেছে। একটি বিচিত্র স্বাদ জাগে মেয়েটার মনে, তার লোভী মন কী বিচিত্র এক নেশায় মেতে উঠতে চায়। বলিষ্ঠ লোকটার স্পর্শ তাকে গ্রাস করেছে। ধীরে ধীরে মেয়েটা শীতরাতে অজানা পুরুষের উন্মাদনার হাতে নিজেকে তুলে দেয়। অন্ধকারে দুটো চোখ জলছিল—সেই চোখ দুটোর চাহনি স্তিমিত—নেশালাগা শান্ত হয়ে ওঠে। অন্ধকারে দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দ ওঠে—দীর্ঘতর, উচ্চতর গ্রামের নিঃশ্বাস নয়, দুটো অতৃপ্ত জীব যেন হাঁপাচ্ছে। দুজনের মাঝে ওরা কি আদিম তৃপ্তির সন্ধান পায়।...নেশার ঘোরে আর তৃপ্তির স্বাদে এলিয়ে পড়ে মেয়েটা। শীতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে গুপীনাথ। পাহারা দিচ্ছে। গজেনকে টলতে টলতে ঝুপড়িটা থেকে বের হয়ে আসতে দেখে এগিয়ে যায়। না—কোন গোলমাল হয়নি।

গজেনও খুশী। পকেট থেকে গোটা কয়েক টাকা বের করে দিয়ে

চাদরটা কোনমতে গায়ে জড়িয়ে চলে গেল মেলার দিকে। গুপীনাথ এদিক ওদিক চেয়ে এবার নিজেই ঝুপড়িতে গিয়ে ঢুকলো।

—তিপ্‌লি। অন্ধকারে ডাকছে মেয়েটাকে। কাঁথা জড়িয়ে কি নিবিড় আবেশে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা। গুপীনাথ থমকে দাঁড়ালো।

মনে হয় অন্ধকারে আজ সে নিজের পরাজয়ের একটা ইতিহাসই রচনা করেছে। তিপ্‌লি জানে না আজ গুপীনাথকে বিশ্বাস করে সে ঠকেছে। গুপীনাথকে নিয়ে সে ঘর বেঁধেছিল আর সেই গুপীনাথই তাকে আজ তার নিজের স্বার্থে একটা জানোয়ারের হাতে তুলে দিয়েছে।

তিপ্‌লি!—উ! ঘুমের ঘোরে সাড়া দিয়ে আবার নেতিয়ে পড়ে মেয়েটা। বিবশ দেহ—ক্লান্তিতে ঢলে পড়ে। গুপীনাথ ওর পাশেই কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুল। ঘুম আসে না। মেলার কলরব উঠছে। লাখ লাখ মানুষ তীর্থে এসে পুণ্যিস্নান করছে, আর গুপীনাথ কিনা নোংরা ঘৃণ্য জীবের মত পয়সাকেই পরমার্থ বিবেচনা করে একটি মেয়ের বিশ্বাসকে বিকিয়ে দিয়েছে কানাকড়ির দামে।

তিপ্‌লি ঠিক ঘুমোয়নি। আজ সে যেন অনাস্বাদিত একটা জীবনের স্বাদ পেয়েছে। গুপীনাথ এ নয়, আর কেউ। সে তৃপ্তির সুর তার সারা মনে। সেটাকে প্রকাশ করতে চায় না সে। গুপীনাথের ডাকে একবার সাড়া দিয়েই ঘুমোবার ভান করে। গুপীনাথ চুপ করে শুয়ে পড়ল ওদিকে। মেয়েটা কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করে।

জয়বাবা কপিলমুনি—গঙ্গা মায়িকি জয়। কলরব ওঠে যাত্রীদের মাঝে; স্নান করে ওরা পুজো দিতে এসেছে কপিলমুনির মন্দিরে। খোলা বারান্দায় মূর্তিগুলো সাজানো। সারা দ্বীপের গাঁদা ফুল এসে জমেছে এখানে। মালা ফুল বিক্রী করছে জেলেপাড়ার মেয়েরাও। মাটির ভাঁড়ে জল আর ফুল নিয়ে যাত্রীরা ভিড় করেছে।

পয়সা টাকার পাহাড় জমছে।

অযোধ্যা থেকে এসেছেন কপিল মন্দিরের মূল সেবাইত। মন্দিরটা এই সাগরদ্বীপে। আবহমান কাল থেকে ওই মন্দিরের উপর অধিকার কিন্তু অযোধ্যাবাসীদের। এখনও সেই অধিকার স্বীকৃত হয়ে চলেছে। ক'দিনেই প্রণামী পড়ে কয়েক লক্ষ টাকা। পুলিশ পাহারায় সেই সব পয়সা বস্তাবন্দী হয়ে গোনা হচ্ছে।

ওদিকে যাত্রীরা দূর থেকে গঙ্গাজলের ভাঁড় আর পয়সা ছুঁড়ছে মন্দিরের

শিলারূপী দেবতাকে লক্ষ্য করে। পুরোহিত যারা রয়েছে তাদেরও সাবধানে থাকতে হয়। যে কোন মুহূর্তে ওই জলের ভাঁড় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাদের মাথায় কপালে লাগতে পারে। ওরা মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করে ফুলের স্তূপের মধ্য থেকে টাকা পয়সা কুড়িয়ে চলেছে। কলরব ওঠে নানা কণ্ঠে।

সাঙ্গ হল মেলা।

তিনরাত্রির এই মেলা। লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরে ফেরা শুরু হয়েছে। ডিঙি নৌকা—লঞ্চগুলো ঠাসবোঝাই হয়ে চলেছে গেনল্যাণ্ড এর দিকে। দোকানীরাও ক'দিন বালুচরে সারবন্দী দোকান সাজিয়ে বসেছিল। জিলাবী—খাজা—গজা বোঁদের লাড়ুই ছিল প্রধান আকর্ষণ। মনোহরী দোকানের মালপত্র প্যাক করে দোকানদাররা ফিরছে মাল গুজারী নৌকায়। হাসপাতাল, ডাকঘর, পুলিশ থানা সবই এসেছিল। তারাও ফিরছে। একদিনেই মেলা অর্দ্ধেক সাফ্। বাকী যারা পড়ে আছে তাদেরও এবার যাবার পালা। শূন্য হয়ে আসছে বালুচর। ক'দিন এখানে আলো ঝলমল করছিল—জেগে উঠেছিল নির্জন দ্বীপ মানুষের কলরবে। আজ সেখানে আবার শূন্যতা নামছে। বছর ভোর পড়ে থাকবে এই নির্জনে অনাদৃত দেবতা আর মন্দির। জোয়ারের জল উঠে এসে ধুয়ে নিয়ে যাবে বালুচরে মানুষের পরিত্যক্ত এই ছেঁড়া পাতা—কাগজ—চটের টুকরো—ময়লা—মায় তাদের পদচিহ্নটুকুও। কোন চিহ্নই রাখবে না প্রকৃতি। আবার স্তব্ধতা নামবে বিধৌত বালুচরে। ভিজে বালুচরে পায়ের দাগ এঁকে যাবে স্নাইফ—টিল—সিগোয়ালো পাখিরা, আঁকি বুকি কাটবে ঢেউগুলো। ওদের জগতের অখণ্ড শান্তি ফিরে আসবে।

বসন্ত পণ্ডিত দাঁড়িয়ে আছে শূন্য প্রায় বালুচরে। মানুষ জন ফিরে গেছে। নৌকায় গাদাবোটে উঠছে পাল—তারের বাণ্ডিল—রশি, টিনের বোঝা।

গজেন তাড়া দেয়—শেষ খ্যালা খেলে নাও সরকার মশায়। বছরের শেষ খ্যালা। তা ইবার আমদানী পত্তর মন্দ হয়নি বলো।

বসন্ত পণ্ডিতকে ও সরকার বলেই ডাকে। বসন্ত জানে এবার কিছু পয়সা সে পেয়েছে, কিন্তু ভাবনাও হয়। মেলার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল সে, এবার মেলা ফুরিয়েছে। কে জানে মহেশবাবু কি করবে তাকে নিয়ে। এক কথায় জবাবও দিয়ে দিতে পারে চাকরিতে। বিপদে পড়বে বসন্ত।

গজেনের কথায় বলে বসন্ত—তাতো হলো গজেন, এবার কি হবে তাই ভাব'ছ। চাকরির কি হবে?

গজেন দেখেছে লোকটা বোকা বোকা। তাকে ধমকে—কৌশলে জুনবরী

হিসেবে কিছু লিখিয়ে তারও প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে। লোকটাকে হাতে রাখতে হবে, গজেন বলে—কত্তার লোকের দরকার, আর সরকার মশায়, গজেন বলে কত্তা না করতি পারবেনি। দেখি বলে।

বসন্ত আজ টাকার স্বাদ পেয়েছে। সে বলে—তাই গ্যাখো গজেন একটা গতি না হলে বিপদে পড়বো।

মহেশ মান্না কথাটা ভোলেনি। মেলার হাঙ্গামা চুকে গেছে। ক'দিন আয়পয়ও মন্দ হয়নি। এবার তাই বৈঠকখানায় বসেছে আরাম করে। ক'দিন স্কুলও বন্ধ ছিল। নটবর—মদন—কিশোরী-মাষ্টারের দলও স্কুলের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মেলায় ভলেনটিয়ারী করেছে। নটবর-এর সেই বিদ্রোহ সত্তা আজ হারিয়ে গেছে।

মহেশ মান্না বলে—নটবর। ক'দিন খাটাখাটুনি গেছে। আজ তাহলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসো। বৈকালে কর্মীদের ফিষ্টএর আয়োজন করা হয়েছে। আর তোমাদেরও এ কাজটাও একটু দেখাশোনা করে তুলে দিতে হবে।

নটবর জানে মহেশ মান্না টাকা পয়সা তাকে দেয়। তাছাড়া নটবররা স্কুল-এর ডেভেলাপমেন্ট ফি বলে কিছু টাকা ছাত্রদের কাছ থেকে ধার্য করেছে। মাসে মাসে তার থেকে কিছু টাকার বখরাও তারা পাচ্ছে।

নটবর বলে—ওসব হয়ে যাবে মান্না বাবু! কি হে মদন—মদন আরও বশংবদ। সে বলে ওঠে—আজ্ঞে আমরা থাকতি ওসব কাজ আটকাবে নি।

মহেশ মান্না আজ সকলকে ফিষ্টে আপ্যায়ণ করবে। গজেনও ব্যস্ত। বসন্ত পণ্ডিত তখনও হিসাব পত্র শেষ করার চেষ্টা করছে। মহেশ বলে—শেষ দিকের মাল বইবার অর্ডারটা ক্যানসেল করিয়ে কিছু লোকসান করিয়ে দিলে হে মাষ্টার। ওই ঘনশ্যামই করলো এটা।

বসন্ত গজেন দুজনেই জানে সেই লঞ্চ-এর রিকুইজিসনের ব্যাপারে ঘনশ্যাম খোদ ডি-এম সাহেবকেই টেনে এনেছিল। ফলে মহেশের সেই কনট্রাক্ট ক্যানসেল হয়ে যায়।

মহেশ বলে—তোমরাই দেখলে তো কি কাণ্ড বাধালো সেদিন। কন্দর্প মাহাতোও রেগেছিল ঘনশ্যামের উপর। তার এলাকার ডাকাত দলকে ঠাণ্ডা করেছে ঘনশ্যাম। হীরুসর্দার এখনও জেলে। দল ভেঙে গেছে। নাহলে গঙ্গাসাগরের মরসুমে ওই গাং-এ যাত্রীনৌকা লুঠ করে অন্ধকারে নগদ—সোনা দানা যা পেতো ওরা তার অনেকটা যেতো কন্দর্পের হাতে। সেই রোজকারও বন্ধ হয়ে গেছে।

কন্দর্পের রাগটা ফেটে পড়ে। বলে সে—ওই একটা ছেলে নিজেকে সাগরদ্বীপের রাজা বলে ভাবছে মান্নাবাবু। আর আপনার পিছনেও লাগছে এভাবে? এমনি করে অপমান করবে?

মহেশ মান্না ভাবছে কথাটা। সেই অপমানটা ভোলেনি সে। পারঘাটের দোহাই দিয়ে ঘনশ্যাম তার সেদিনের হুকুমমানা বাতিল করেছিল; ওই পারঘাটার ব্যবস্থাই এবার করবে সে। সাগরদ্বীপে ভুবন মাইতি—ঘনশ্যামের রুজি রোজকারের পথই বন্ধ করে দেবে মহেশ মান্না। এবার যে ভাবে হোক পারঘাটার বাৎসরিক ইজারা ডাকের মুখেই ঘা দেবে সে। ডাকের নোটিশ চেপে রেখে কৌশলে নিজের নামেই ডাক করে নেবে, তার জন্য সদরে কিছু নৈবেদ্যই নিবেদন করবে। এ তার ইজ্জতের প্রশ্ন।

নরহরি ভটচায ওদিকে কড়িবাঁধা হুকোয় তামাক টানছে। মেলার মরশুমে সেও বেশ কিছু টাকা কামিয়েছে। কোন শাঁশালো যাত্রীর কাছ থেকে প্রণামী বাবদ একটা দামী শাল হাতিয়েছে। ময়লা কাপড় আর ছেঁড়া ফতুয়ার উপর দামী শাল চাপিয়ে তামাকের শেষ ধোঁয়াটুকুও গিলতে গিলতে বলে—তাই বলি কন্দর্প বাবু, আপনি, নবীনবাবু, ভূধরবাবু এঁরা সব মাতব্বর রয়েছেন। তাছাড়া দ্বীপে সমাজও আছে। একদিন ডেকে ওই ঘনশ্যামকে সামাজিক দণ্ডই বিধান করুন।

মহেশ মান্না খুশী হয়। তবু বলে সে—না, না। অসামাজিক কাজ তো তেমন কিছু করে না।

নরহরি বলে ওঠে—করেনা আবার? শুনি জেলে পাড়াতেই পড়ে থাকে। ওখানের কদম ছুড়িটার সঙ্গে কত আসনাই। কি হে ম্যাষ্টার। তোমাকেও কথাটা বলবো বলবো ভাবি—তা বাপু, তোমার মেয়েকেও ওর সঙ্গে মিশতে বারণ করো। কোন দিন কি বিপদ না বাধায়। তখন সামাজিক দণ্ড থেকে তুমিও রেহাই পাবে না। কথাটা শেষ করে সাগরদ্বীপ-এর ব্রাহ্মণ কুলতিলক সমাজের কর্তা নরহরি ভটচায হুঁকোটায় প্রবল বেগে টান দিতে থাকে। গড়্গড় শব্দ ওঠে কলকেতে।

বসন্ত পণ্ডিত চমকে ওঠে। তার মেয়েকে জড়িয়ে এই পঞ্চজনের মধ্যে ঘনশ্যামকে নিয়ে এসব অপ্রিয় কথা উঠবে তা ভাবেনি সে। অপরাধীর মত বলে বসন্ত—ছেলেবেলা থেকে মেলামেশা করছে—তা এবার বিয়ে থা দেবার কথা ভাবছি। আমি নাহয় নিষেধ করে দেব ঘনার সঙ্গে না মিশতে।

নরহরি বলে—তাই করো। বাপুহে আগুন আর ঘি। আর মেয়ে তোমার তো ছোটটি নেই—

মহেশ মান্নার চোখের সামনে কিশোরী সন্ত যৌবনোন্মুখ মেয়েটির সুন্দর শান্ত রূপ ফুটে ওঠে। তার মনের পরতেও সেই বালিয়াড়ি—ঝাউবন—সমুদ্রের ঢেউ-এর সুর সবমিলিয়ে একটি তরুণীর ছবি ফুটে ওঠে। মহেশ বলে—ঠিক আছে। আর ভটচায মশাই—আপনারাও নজর রাখুন। তবে আমি বাপু ওসবে নেই। নিজের কাজ নিয়ে দ্বীপের মঙ্গলের ব্যাপার নিয়েই ভাববো। হাইস্কুল, হাসপাতাল এসব হোক—কে কি করলো এসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাই না। পরক্ষণেই আজকের ব্যাপারের কথা মনে পড়ে তার। বলে—ওরে গজেন, দারোগা বাবুদের বলেছিস তো ফিষ্টে আসতে। রমন ডাক্তার—বি-ডিও সাব—ওদেরও বলবি! কেউ যেন বাদ না পড়ে।

গজেন জানায়—সব বলা হয়েছে।

মহেশ বলে—কাল থেকে আড়ত খুলবে। পণ্ডিত—তুমি বাবু কাল থেকে আড়তেই বসবে। পরে দেখা যাক কোথায় লাগাতে পারি তোমায়। আড়তে তো লোক রয়েছে—অন্য কোথাও দেখতে হবে।

বসন্তও ভাবছে কথাটা। বলে সে—যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন মান্নাবাবু, আপনার আশ্রয়েই পড়ে আছি।

নরহরি বলে ওঠে—মহৎ আশ্রয় হে। গতি হয়ে যাবে। হুঁকোটার দিকে চেয়ে আছে সুব্ধ নয়নে ফটিক জানা, শীতে ডুটান তামাকের তার দরকার। তাড়া দেয় সে, হোল তোমার ভটচায! কলকে যে খালি ছাই করে দিলি গা! —নে! নরহরি বিরক্ত হয়ে কলকেটা তুলে দেয় ওর বিনাকড়ি বাঁধা শূন্য হুঁকোটার মাথায়। কড়িবাঁধা হুকোটাই তার ব্রাহ্মণত্বের প্রতীক। ওটা এবার নামিয়ে রাখে। মহেশ মান্না কথাটা ভাবছে। ভুবনের পারঘাটের উপরই এবার হানা দেবে সে।

ক'দিনপর এরা সমুদ্রে গেছে! ঘনশ্যামও রয়েছে লঞ্চ নিয়ে। বেশ কয়েকদিন মাছের জাল পড়েনি গাং-এ। তাই মাছগুলো একটু বেশী পরিমাণেই ঝাঁক বেঁধে ঢুকেছে খাড়িতে। জলে ওদের শিরদোখা দেখা যায়। সন্ধানী চোখ মেলে গাং-এর দিকে চেয়ে চেয়ে ঘনশ্যাম বলে—জাল নামাও সর্দার। মাছ-এর ঝাঁক এদিকেই উজিয়ে এসেছে।

নিশাকরও জলের ধরন দেখে বুঝেছে ব্যাপারটা। তারা ডিঙি খুলে নিয়ে জাল মেলতে থাকে গাং-এ। ডিঙিগুলো স্রোতে সরে সরে গিয়ে দীর্ঘ জাল ফেলে এবার গুটিয়ে তুলেছে। ঘনশ্যাম চেয়ে আছে গাং-এর দিকে।

মাছ আজ উঠেছে প্রচুর। জাল টেনে তোলা যায় না। মোনা ভেটকির একটা ঝাঁকই ধরেছে তারা। নধর সাইজ—সোনালী ঝকঝকে রং—পার্শে

মাছের ঝাঁকগুলো বেকাদায় জালে পড়ে দাপাচ্ছে। খুশির চোটে রতন চিৎকার করে—জয় মা গঙ্গা। জয় বাবা কপিল মুনি। বছরের পেথম সাম খেপ্পায় জাল ভরে গেছে তাদের। গঙ্গাসাগরের পূজা দিয়ে মকর স্নানের পর আজ প্রথম জাল নামাচ্ছে আর মাছ যা পেয়েছে আশাতীত।

নিশাকরও খুব খুশী। বলে সে—ছোটবাবু। মাছ যে ডিঙিতে খায় ধরে না গো! জয় বাবা!

ঘনশ্যাম বলে—যাই ধরো সর্দার। ওসব তো যাবে মহেশ মান্নার গব্বে। চুপ করে যায় নিশাকর। কথাটা সত্যিই। ঝকঝক করছে মাছের স্তূপ নৌকার খোলে। নধর সাইজের কয়েকটা ভেটকি পড়ে আছে। কালোর জালে ধরা পড়েছে একটা বিরাট কচ্ছপ। ওটাকে চিৎ করে ফেলে তার দিয়ে পা চারটে বেঁধে রেখেছে। আজকাল মাছের যা দর—তাতে মাছ যাদের সাধ্যে না কুলোয় ওই কচ্ছপই খায়। এতকিছু মাছ ধরেও তারা হাতে পয়সা ঠিক মত পায় না। দেখেছে নিশাকর তার ছেলে গুপীনাথ জামা প্যান্ট—যা দামের পরে, তা তার জোটে না। মহেশ মান্নাই ফুলে উঠেছে। রতন ধুসো চাদর জড়িয়ে বিড়ি টানতে টানতে বলে—একটা ভেল্‌কিবাজী কুথায় আগে গো ছোটবাবু। শালা দাম ঠিক যেবে নেয় ওরা। যদি মাছ নিজেরা বেচতি পারতাম—হ্যা গা খুড়ো—শালো মান্নাবাবুর ঠিঁই আর কতো দিনা আছে নিয্যাস কও দিনি।

ওটার হিসাব তারা কেউ রাখেনি। ঘনশ্যামও বুঝেছে ব্যাপারটা ওদের ঋণ কোন দিনই শোধ হবেনা। হিসাবটা ওই মান্নার হাতে। নিজেও ভেবেছে সমবায়ের কথা। নিশাকর বলে—কি জানি রে! মনে হয় যেন হাঙরের দাঁতে পড়েছি—কেবল গিলিই যাবে ওই মান্নাবাবু মোদের।

কথাটা ভাবছে তারা। কিন্তু কোন পথ পায় না। জলে ওঠে রতন ফকির আর ক'জন।

গজেন আজ মাছের নৌকাগুলো আসতে দেখে এগিয়ে যায়। মাছ দেখে খুশী হয় সে। বলে—হ্যাঁ। মাছ আজ ধরেছিস বাপু। ওরে গুপী—নাদন —নে বাবা ঝুড়ি তোল কাঁটায়। ক'দিন আড়ত বন্ধ ছেল আজ মাল চালান দিতি হবে সকালেই। শীতের রোদ উঠেছে বালিয়াড়িতে—ঝাউবনে। জেলে পাড়ার বৌ ঝি—ন্যাংটা বাচ্চাগুলো এসেছে জেলেদের খাবার নিয়ে। ছেলে-গুলো ঘুরছে। কুচো মাছ ঝুড়ি থেকে যা পড়ছে তারা কুড়িয়ে নেয়। দু'চারটে পার্শে—পায়তাতেলি জুটছে ওদের ভাগ্যে।

গুপীনাথ ধমকায়—হঠ রে! এ্যাই! কুত্তার দল।

নিশাকর সর্দার চাইল ওর দিকে।

তারই ছেলে, কিন্তু গুপীনাথ এখন তার বাড়িতে থাকে না। সেই তিপ্‌লিকে নিয়ে আলাদা থাকে গঞ্জের বাজারের পিছনে। মেয়েটার সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা যায়। নিশাকর রাগে ঘেন্নায় ছেলের সঙ্গে কথাই বলেনা সেইদিন থেকে।

তাতে অবশ্য গুপীনাথের কিছু যায় আসে না। সে এখানেও বেশ রোজকার করে আর বৈকালের পর থেকে তিপ্‌লির চোলাই মদের কারবারে নামে। শিষ দিয়ে গুপীনাথ মাছ তুলছে ঝুড়িতে।

—এাই! হঠ। লোকটাকে সরিয়ে দেয় সে। গোপাল জেলে অন্ধ। এককালে চোখ ছিল গতর ছিল তার! মহেশবাবুর জালেই কাজ করতে গিয়ে সমুদ্রে নৌকাডুবি হয়। জালের বয়া ধরে ভাসছে গোপাল অকুলসমুদ্রে। কখন জ্ঞান হারিয়ে যায়—তারপর কোন জেলে-নৌকা ওকে তোলে। কোনরকমে বেঁচে ওঠে। নোনা জলে হেজে গিয়ে নাহয় বিষাক্ত 'কচু লেগে চোখদুটো নষ্ট হয়ে যায়। সেই থেকে গোপাল গঞ্জে ভিক্ষে করে। পারঘাটার ধারে বসে থাকে। আর সকালে এগিয়ে আসে বালিয়াড়ি পার হয়ে আড়তে। তার মেয়ে ললিতাও বাবার সঙ্গে ঘোরে। এখন বড় হয়েছে মেয়েটা। এর ওর বাড়িতে কাজ করে। অন্ধবাবাকে নিয়ে ঘোরে।

মেয়েটার দেহে এসেছে যৌবনের জোয়ার। গোপাল আসে সমুদ্রের ধারে। এই জগতকে সে ভুলতে পারেনি। ওই ঝাউবনের হাওয়ার স্বর—সমুদ্রের উত্তাল গর্জন—মাছের আঁসটে গন্ধ সব মিশে তার হারানো যৌবনের বহু দিনের স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনে। মাছ এট্টা দে। এ্যাই গুপী—ওহে গজেন—

—ভাগ! গুপীনাথের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গোপাল জলের উপরই। শীতে হিমে ভিজে গিয়ে কাঁপছে বুড়ো। নোনা জলের ঢেউ-এর তোড় ঢুকেছে তার মুখে—

দৌড়ে আসে ললিতা—বাবা! বাবাগ!

—মাছ খাবে! গর্জাচ্ছে গজেন—দে চুবিয়ে দে! নোনা গাং-এ—

চিৎকার করছে মেয়েটা। রতন এগিয়ে যায় ব্যাপারটা দেখে।

—এ্যাই গুপী!

গুপীনাথ থামলো। রতন একটা মাছ তুলে নিয়ে বলে—নাও গো খুড়ো। ধর ললিতা।

সুন্দর একটা ভেটকি মাছ। গোপাল উঠে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে শীতে। ইতঃস্তত করে ললিতা—ওটা দিবা?

রতন দেখছে মেয়েটাকে। তার দেহে যৌবনের সাড়া, দুচোখে শান্ত চাহনি। কোন কিছু দাবী তার নেই—শুধু সংকোচ। রতন বলে—নে। আর গুপী, বুড়ো কানা মানুষটাকে এমনি করে চুবিয়ে দিলি কেনে ?

গজেনও খুশি হয় নি ওকে এমন মাছটা দিতে। বলে সে—মাছটা দিলি ? আড়তের বউনি হ'ল না।

রতন শোনায়—আমাদের মাছ থেকে দিছি। তুমি যাও দিন্। লোকটার তুমাদের জন্যে আজ চোক নষ্ট হই গেল, কি দিয়েছো তোমরা ? তোমার মালিক ? এমনি করেই জেলেদের জীবন কাটে। ওদের পরিশ্রমের ফসল তোলে মায়ারাই, আর শেষ বয়সে পথেপথে ঘোরে, অনাহারে মরে, বেঁচে থাকলে, অবশ্যি ওদের পরমায়ু সীমিতই,—কে কোনদিন সমুদ্রে গিয়ে হারিয়ে যাবে তার ঠিকানা নাই।

ললিতা দেখছে ওকে।

গোপাল বলে—তাই বল বাবা। ওদের জালে গে চোখ গ্যালো—এক-মুঠো খাতি দেয় না! ভগমান দেখবে রে!

রতন গর্জায়—ভগমান! সি সব কিছু নাই। যা ললিতে—খুড়োকে নে যা। সকালে আসি আমাদের খোঁজ নিবি—মাছ দিব।

কৃতজ্ঞতাভরে চেয়ে থাকে ললিতা।

নিশাকরও দেখেছে ব্যাপারটা। মনে মনে খুশিই হয়। নিজের ছেলে গুপীনাথ তার মুখ রাখেনি। ওর ইচ্ছা ছিল ওই ললিতাকেই ছেলের বৌ করে ঘরে আনবে। গরীবের মেয়েটাও সুখী হবে, তার সংসারেও শান্তি আসতো। কিন্তু তা হয়নি। কানা গোপালের কাছে সে যেন অপরাধীই রয়ে গেছে।

রতনও তার ভাইপো। ছেলেটা সত্যিই কাজের। আজ রতনকে দেখে মনে হয়—ললিতার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে এবার ঘরবাসী করবে।

গজেন রতনের কথায় সরে এসেছে। গুপীনাথও খুশি হয় নি। জানে সে ওই জেলেপাড়ার তার জ্ঞাতি গোষ্ঠী তাকে হিংসা করে। গুপীনাথ ওদের পরোয়া করে না।

গজেন কাঁটার কাছে এসে ওজন দেখছে। বালির উপর বাঁশের তেপায়া বানিয়ে ঝুড়ি বন্দী মাছ পাল্লায় তুলে ওজন হাঁকছে নশীরাম—বিয়াল্লিশ কেজি —সাতশো।

গজেন খিঁচিয়ে ওঠে—আবার সাতশো কেন ? পুরো বিয়াল্লিশ। লেখো সরকার।

বসন্ত মাষ্টার লিখে চলেছে। মহেশ মান্না শাল জড়িয়ে বসে নজর রাখছে সব দিকে। হাঁক শোনা যায়—বাইশ কেজি।

রতন পাল্লার কাছে দাঁড়িয়েছিল। তিনটে নধর সাইজের ভেটকি পাল্লায় তুলে ওই ওজন হাঁকতেই গর্জে ওঠে রতন—সি কি গো? বাইশ কেজি! শালো এক একটাই তো নিদেন দশ বারো কেজি করে হবে। অ খুড়ো—এসো দিকি ইদিকে। এ্যাই নশে—পাল্লা নামাবি নাই। খপ করে রতন বাট খাড়াটা তুলে চীৎকার করে ওঠে—অ খুড়ো—স্থাখো গো, শালোর বাটখারা ছাঁপ ফাঁপা গো, এ্যাঁ—আঁতকে ওঠে নিশাকর সর্দার—এ্যাঁ—! বলিস কি রে?

জেলেরা সবাই ভিড় করেছে। দেখছে বিচিত্র ওই বিরাট বাটখারার ভিতরের কারিকুরিটা। বাইরে থেকে ধরার কোন উপায়ই নেই, বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী, দু'নম্বর বাটখারা। দশকেজি—বিশ কেজির বাটখারায় নিদেন আড়াই কেজি—পাঁচ কেজি করে ওজনে কম। কলরব ওঠে—ওরে শালো—এ্যাই কম্মো তোমার। এ্যাদ্দিন এই ওজন করেছিস! হ্যারে শালো গজেন—কই গো মান্নাবাবু!

নিশাকর—রতনরা অবাক হয়।

ঘনশ্যাম লঞ্চে বসে দাঁতন করছিল। চোখ মেলে রয়েছে সে তীরের ঝাউবনের দিকে। কমলা সকালে আসে, তার লঞ্চের শব্দ আর হর্ণ শুনে। তারজন্য ঘনশ্যাম ঘাটে আসার মুখে জোরে জোরে হর্ণটা বাজায়। গ্রামগঞ্জের আকাশে সমুদ্রের চাপা গর্জন ছাপিয়ে শব্দটা ওঠে।

মটরা বলে—ম্যাষ্টার আমাদের শ্যামের বাঁশী বাজাছে যতনা। রাধা এলো বলে।

ওরা জানে ব্যাপারটা। কমলাও বের হয়ে আসে—মাছ নেবার ছল করে। কদমও দেখেছে দৃশ্যটা। সেও কমলাকে এ নিয়ে হাসি মশকরা করে—কি গো দিদি! আঁ্যা—

গেয়ে ওঠে মুখরা মেয়েটা—শ্যামের বাঁশী বাজলো বনে—

ঘরেতে রই ক্যামনে—

ওলো ননদিনী—

কমলা ধমকে ওঠে—থামবি তুই কদম। মাছ নে আসতেছি কে কোথার এল বয়ে গেছে আমার দেখতে। তবু কমলাও আসে। ঘনশ্যাম দেখছে ওই ঝাউবন থেকে বের হয়ে আসছে কমলা। বাতাসে উড়ছে ওর শাড়ির আঁচল। দেহের রেখাগুলো সুস্পষ্ট। কি ব্যাকুল হয়ে চেয়ে থাকে সে।

হঠাৎ মটরার ডাক শুনে চাইল। মটরা বলে—তুমি ওদিকে দেখছো—

উদিকে আড়তে ধুন্দুমার কাণ্ড বেঁধেছে গো। শালো গজেনরা এ্যাদ্দিন ফাঁপা বাটখারার ওজনে গলা কেটেছে, আজ ধরে ফেলেছে রতনদা—ওই গ্যাখো—কাণ্ড!

মহেশ মান্নার ইঙ্গিতেই এসব কাণ্ড হয়ে আসছে এতকাল ধরে। আজ হঠাৎ এমনি ভাবে ধরা পড়ে যাবে হাতে-নাতে তা ভাবেনি। গজেনও চমকে উঠেছে।

ঘনশ্যাম লঞ্চ থেকে ব্যাপারটা দেখে হাঁক পাড়ে—তুলে আন বাটখারা। সহরে নে যাবো! রতন বাটখারাগুলো ধরেছে। মদন—রতন—যাদব আরও অনেকে বলে—তাই নে চল। পুলিশে যাবো। ইয়ার প্রীতিকার করতেই হবে।

ওরা বাটখারার দখল নিতে চায়। মহেশ মান্না জানে ঘনশ্যামকে বিশ্বাস নেই। দরকার হলে সদরের কর্তাদের কাছ অবধি ওসব নিয়ে যাবে। আর জল গড়াবে অনেক দূর অবধি। মহেশ এবার অকুস্থলে অবতীর্ণ হয়। হুকুম করে সে—কেড়েনে বাটখারা। খবরদার দিবি ওসব। কেড়ে নে—

গজেনও তৈরী ছিল। সে এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের উপর। গুপীনাথও জবাব দিবার সুযোগ পেয়ে একটা বাঁশ হাতে ওর দলের আরও কিছু লোককে নিয়ে লাফিয়ে পড়ে জেলেদের উপর।

ছিটকে পড়ে রতন অতর্কিত আঘাতে, বুড়ো নিশাকর এগিয়ে আসে।

—এ্যাই!

তাকেও কে এক ঘা লাঠি বসিয়েছে পিঠে। আর্তনাদ করে পড়ে যায় নিশাকর। গজেন গর্জাচ্ছে—পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দে! খুব বেড়েছে ব্যাটারা।

মহেশ মান্না হুকুম দেয়—তোল মাছ। এক পয়সাও দেবনা। হঠাৎ সামনে ঘনশ্যামকে দেখে চাইল মহেশ।

ঘনশ্যাম এগিয়ে এসেছে লঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে নেমে। আহত রতন—যতন, ফটিক—গুপলার দল কাতরাচ্ছে।

—গ্যাখো ছোটবাবু, গলা কাটছে আবার বলতে গেলে মারলে—মাছ কেড়ে নেবে বলছে।

মহেশ গর্জে ওঠে—তাই নেব। যা করতে পারিস কর। গজেন—ওদের মুখের গ্রাস—দিন রাতের পরিশ্রমও ছিনিয়ে নেবে। ঘনশ্যাম-এর বখরা আছে এতে—সে সবও আজ দেবেনা মহেশ।

ঘনশ্যাম গর্জে ওঠে—গজেন!

গজেন রুখে ওঠে—তুমি কে হে? তোমার—বাপের মাছ! এই—

ওর কথাটা শেষ হয় না। ঘনশ্যামের একটা লাথিতে গজেনের দেহটা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সাতপাক দিয়ে ছিটকে পড়লো নোনা গাং-এর জলে, সশব্দে জল ছিটকে ওঠে আগত ঢেউ-এর।

গুপীনাথ এগিয়ে আসতে একটা চড়ে তার শীর্ণ দেহ টাউরি খেয়ে ধরাশায়ী হয়েছে। অন্যরা পিছিয়ে পড়েছে তাদের দুই নেতাকে নিমেষের মধ্যে ভূমিশয্যা নিতে দেখে। মহেশ মান্না চুপ করে গেছে।

নিশাকর সর্দার কাতরাচ্ছে। ছোটবাবু! কি করছেন?

ঘনশ্যাম আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতবড় অন্যায়ের প্রতিবাদ করেই তাকে বাঁচতে হবে। এই মুখোমুখি হওয়াটা সে চায় নি, কিন্তু এড়াতে পারেনি আজ। একদিন এর জন্য তৈরী হতেই হতো। সেটা এখন থেকেই হবে সে। ঘনশ্যাম বলে—ঠিক করছি সর্দার। এটা করতেই হবে বাঁচতে গেলে। নাহলে মহেশ মান্নার হাত থেকে আমরা কেউ বাঁচবো না। রতন—ফটিক; তোল, নৌকায় মাছ তোল। সব মাছ। এই আড়তে আর মাছ আসবেনা কোনদিন। আমরাই মাছ ধরবো—বিচবোও আমরাই যেখানে ন্যায্য ওজন দাম পাবো সেখানে। চল—কাকদ্বীপে মোহান্তের আড়তেই যাবো।

মহেশ মান্না আজ বিপদের মুখোমুখি হয়েছে। জানে প্রতিবাদ করার সাধ্য তার নেই। গজেন ধরাশায়ী, গুপীনাথের দাঁতই পড়ে গেছে বোধ হয়। বাকী লড়ুই-এর দল নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে। মহেশ তবু বলে—মাছ নে যাবে? আমার দেনা—জাল ভাড়া? ঘনশ্যাম বলে—সব হিসাবমত পাবে। নে—তোল।

জেলেরা আজ যুদ্ধজয়ের আনন্দে সব আঘাত ভুলে গর্জে ওঠে—তাই যাবো। ইখানে মাছ আনবো নাই। তোল—তোলরে মাছ। ওরা মহেশের চোখের সামনে দিয়ে ঝড়ের বেগে ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে নৌকাতে রাখছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সব সাফ।

কমলা চুপ করে দেখছে কাণ্ডটা। ঘনশ্যামের আজ কথা বলার সময় নেই। দুজনে একসঙ্গে বাড়ি ফিরে যেতো। তাও আজ হয় না। ঘনশ্যাম লঞ্চে ওঠার আগে বলে—চলি কমলা, ফিরে এসে কথা হবে। এখন সময় নাই, অনেক কাজ। বাবাকে খবরটা দিবি। লাফ দিয়ে লঞ্চে উঠে চিৎকার করে—মটরা। ইঞ্জিন চালু কর।

সশব্দে লঞ্চটা জল কেটে পিছনে জেলে ডিঙিগুলো টেনে নিয়ে চলেছে। আহত রতন চিৎকার করে—ওজন মারার খেলা ঘুচিয়ে দেব মান্নাবাবু? কুন শালা আর মাছ আনে ইখানে।

বলিষ্ঠ ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকে ললিতা। গোপাল মারামারি—চিৎকার—ঘনাবাবুর গর্জনও শুনেছে। শুধোয় সে—হ্যারে ললিতে ওরা মাছ তালে দিলনা ইথানে ?

ললিতা বলে—হ্যাঁ গো ! কাকদ্বীপে নে গেল।

অন্ধ গোপালের মনে হয় একটা কাজের কাজই করেছে তারা। এই লোকটার হাত থেকে তবু বাঁচতে পারবে ওরা। গোপাল বলে।

—মা গঙ্গা ওদের ভালো করুন রে ! চল মা—উঃ কি কাণ্ড হই গেল বল দিদি ? অযথা মারতে গেল মান্না—

ললিতার মনে পড়ে বারবার রতনের কথা। বোধহয় খুবই লেগেছে ওর। আর জবাবটা দিয়েছে তেমনি ছোটবাবুও। বলে ললিতা—ছোটবাবু যা মারিছে গজেনরে—গুপীটাকে—হ্যাঁ। মার একখান—

কদমও দেখেছে ব্যাপারটা। এমনি করে এতকাল ওদের অর্ধেক রোজকার চুরি করে এসেছে মান্নাবাবু, গজেনই সেটা করেছে। আজ সেও খুশী হয়েছে।

গজেন তখন কোন মতে উঠে বসেছে। বাঁ পায়ে লাথিটা মেরেছে, কে জানে ভেঙে গেছে নাকি হাডটা। নাকে মুখে ঢুকেছে স্রোতের বালি—নোনা জল। কাশছে সে—চোখ জ্বলছে।

মহেশ মান্নাও দেখছে তার চোখের উপর চরম আঘাতে তার সব দুর্গ—সেনাপতিদের ঘায়েল করে একা ঘনশ্যামই যুদ্ধ জয় করে তার মুখে কালি লেপে দিয়ে সব মাছ নিয়ে চলে গেল। ওরা মাছ না দিলে আড়তও চালানো মুস্কিল। এত টাকার আমদানি বন্ধ হয়ে যাবে। গজেনও কাজটা করেছে বোকার মত।

মহেশ হাক পাড়ে—গজেন। এ্যাই গজা—

কদম হেসে ওঠে। মহেশ মান্না দেখছে মেয়েটাকে; আরও চটে ওঠে সে বসন্ত পণ্ডিতের মেয়ে কমলাকে ওখানে দেখে। ঘনশ্যামের লঞ্চ দেখেই ছুটে এসেছে মেয়েটা।

কদম বলে ওঠে—গজা তো থাজা হয়ে পড়ে আছেন গো।—তা তুলে ধরো ওটাকে, নালি গাং-এর স্রোতে আবার ভেসে গে কামাটের দাঁতে পড়তি পারে।

গজেন ততক্ষণে কোনমতে দেড় ঠ্যাং নিয়ে ভিজে বালি মাখা মূর্তিতে খাড়া হবার চেষ্টা করে।

মান্নাবাবু ধমক দেয়—যা তো ছুঁড়ি। যা—

কদম বলে—যাচ্ছি গো। মাছ নেত্তি আর আসবো নাই। ইবার গজের

ঘাটেই যাবো। অ গজেন দা—ঠ্যাং খান্ যি লড়বড় করছে গো। আহা—

গুপীনাথ ফুঁসে ওঠে—চোপ—কদম বলে—ওরে মরদ! ইবার দেখছি রা বেইরেছে। এতক্ষণ রা কতো কতি ছ্যালো ছোটবাবুর ছামুতে? চলো গো দিদি—কদম কমলাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

মহেশ মান্না গর্জায়—এবার আড়ত তুলেই দিতে হবে তোদের জন্য। আর পণ্ডিত—

বসন্ত এতক্ষণ ধরে নীরবে বসে দেখছিল সর্বনাশটা। সেও বুঝেছে বিপদের গুরুত্ব। মহেশ মান্না কি ভেবে বলে—ওসব খাতাপত্তর রেখে চলো আমার সঙ্গে সদরে আজই দুপুরের লঞ্চে। একটা রোজকারের পথ তো বের করতে হবে। ছি ছি—গজেন—গুপী, কোন কম্মের নোস তোরা। নাহলে একা ঘনশ্যাম তোদের ঠাণ্ডা করে এই কাণ্ড করে গেল।

গজেন বলে—থানা পুলিশে যাবো—

বলে ওঠে মহেশ—থাক। আর ওসবে কাজ নাই। মার খেয়ে মুখ বুজে ঘরে বসে থাকগে। খুব মর্দানি বোঝা গেছে তোদের।

গজেন রাগে ফুঁসছে। গুপীনাথের জামাটা ছিড়ে গেছে—রুমালটা ঝুলছে গলায়, জলে ভিজে ন্যাতা কানির মত। দাঁত দিয়ে—মুখ দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে। মহেশ আজ এই মারের জবাব দেবার কথাই ভাবছে। তার জবাবটা হবে অন্যপথে, অন্যরূপে। এর জবাব না দিতে পারলে সাগর দ্বীপে তার মুখ দেখানো যাবে না। ঘনশ্যাম এইবার মাথা ধীরে ধীরে তুলছে—তার সেই শক্ত মাথাটাকে নুইয়ে দিতেই হবে মহেশকে—সে যে ভাবেই হোক।

কমলার সুন্দর মুখে ও জয়ের হাসিটা দেখেছে মহেশ। ঘনশ্যামের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথাও জানে। মহেশ কি ভাবছে।

বালিয়াড়িতে মরা মাছ দু-চারটে পড়ে আছে। চিলগুলো নীল আকাশে উড়ছে, তাদের তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা যায়। মাঝে মাঝে বিশাল ডানা মেলে তীর বেগে বালিয়াড়িতে এসে ছোঁ দিয়ে ধারালো নখে শিকার তুলে আবার শূন্যে ভেসে যায়। বলিষ্ঠ পাখার ভারে ওরা হেলে দুলে উড়ছে ঊর্ধ্বাকাশে।

মহেশ এগিয়ে চলে, বসন্ত পণ্ডিত তার পিছনে অনুগত প্রাণীর মত চলেছে মুখবুজে ভেড়ির উপর দিয়ে। পারঘাটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো মহেশ মান্না।

সকালে মাছের আড়তের খবরটা এর মধ্যেই হাওয়ায় ভেসে এখানে এসে পৌচেছে। দু একটা ছেলেও সুখবরটা দেয়—গজেনকে মারি গাং-এ ফেলছে ছোটবাবু। মহেশ মান্নারেও ধরিছেল—শালোরা কাঁপা বাটখারায় ওজন

দেয় গো। দিছে দফা নিকিশ করি। মান্নার আড়ত থেকি সব মাল নে গেল ওরা। খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। কানে আসে ভুবন মাইতিরও।

অঘোর সরকার পারঘাটের যাত্রীদের পারানী আদায় করছে, এখন যাত্রীর ভিড় কমই। নৌকাগুলো যাত্রা নিয়ে চলেছে। ভুবন বলে—এসব কি শুনছি অঘোর ?

অঘোরও শুনেছে কথাটা। বলে সে—মাছের অর্দ্ধেক বখরা ঘনাবাবুর, ওকেও ঠকিয়েছে মহেশবাবু, তাই ওরা নাকি এআড়তে মাল দেবে না। সব মাছ নে যাবে কাকদ্বীপে।

—সেকি! শুনলাম মারধোরও করেছে।

ভুবন মাইতির কথায় অঘোর বলে—মেরেছে গজেনের দলও জেলেদের। বাটখারার কথা তুলতে তারাই শুরু করে মারধোর।

ভুবন মাইতি ভাবনায় পড়ে। তার জমি সব নিয়ে নিয়েছে মহেশ তবুও চুপ করে ছিল সে। ঘনশ্যামকেও থামিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আজ সেই মুখোমুখি সংঘাতটাকে আর এড়াতে পারেনি। ভুবন জানে মহেশ মান্নাকে।

হঠাৎ তাকে দেখে চাইল।

এই ঘটনার পর মহেশ যে নিজে এখুনিই এখানে আসবে তা ভাবতে পারেনি। ওকে দেখে উত্তেজনা চেপে বলে ভুবন।

—এসো মহেশ। কি সব গোলমাল হয়েছে শোনলাম—

মহেশ বলে ওঠে—তাই এসেছি ভুবনবাবু। আপনি মানীলোক—

ভুবন চাইল ওর দিকে। হঠাৎ বলে ওঠে ভুবন। —এতই যদি মানো তবে ধবলাটের আমার এতগুলো জমি অন্যায়ভাবে দখল নিলে কেন ?

চমকে ওঠে মহেশ।

কিছু জবাব দেবার আগেই ভুবন ওই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার জন্ম বলে,—তা যাকৃগে! বলো—আজ আবার কি হল ?

মহেশ ঘনশ্যামের সম্বন্ধে বলে,—ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে আমার আড়ত তুলে দিতে চায় ? আমার লোকদের মারধোর করে। আপনাকে জানিয়ে গেলাম ওকে একটু সামলে চলতে বলবেন। আমার ক্ষতি করতে গেলে ভালো হবে না। পরে বলবেন—তাই আগেই কথাটা জানিয়ে গেলাম মাইতিমশায়।

মহেশ মান্না প্রকারান্তে জানিয়ে গেল যে এই দ্বীপে থাকতে গেলে তার অন্যায় অত্যাচার, শাসন, শোষণ সবই মেনে চলতে হবে।

ভুবন মাইতির এক একসময় মনে হয় তার আগেকার সেই সাধ্য থাকলে

মুখের উপরই জবাব দিত, কিন্তু আজ তার সাধ্য নেই। জীর্ণ দেহ—পায়ের নীচেকার জমিও কেড়ে নিয়েছে ওই শয়তান। আজ জানিয়ে গেল এখানে বাঁচতে গেলে তার সবকিছু অন্যায়কে মেনে চলতে হবে।

ঘনশ্যাম তার প্রতিবাদ করেছে—তাই আজ ক্ষেপে উঠেছে মহেশ।

—কত্তাবাবু।

ভুবন মাইতি অঘোরের ডাকে চাইল। এনিয়ে কোন কথাই বলতে চায় না। ভুবন প্রতিবাদ করতে পারেনি মহেশের কথায়। নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল মনে হয়। বলে ভুবন—আজ চলি অঘোর। ঘনশ্যাম এলে বাড়ি যেতে বলো।

অঘোর দেখছে অসহায় মানুষটিকে। বলে সে—এই রোদে একা যেতে পারবেন তো?

হাসল ভুবন। জীর্ণ মুখে ছড়িয়ে বিষণ্ণ বেদনাতুর হাসি। বলে সে, —অনেক সয়েও বাঁচতে হবে অঘোর। কি করা যাবে বলো—পারতেই হবে। ঘনশ্যাম ফেরলে বাড়ি যেতে বলো। তার কাছেই শুনতি হবে ব্যাপারটা। এদিকে মহেশ তো শাসিয়ে গেল।

অঘোর সরকার চেনে মহেশকে। বলে সে—ও ক্যামন লোক তা তো জানেন। এ্যাদ্দিন ধরে এই জেলেদের মায় ঘনাবাবুকেও মাছের এজনে, হিসেবে মেরেছে। আজ তাই ক্ষেপে গেছে তারা।

ভুবন মাইতি বলে—কে জানে।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে তার। বলা হয়নি অঘোর সরকারকে। ভুবন মাইতি বলে—ঘাটের ডাকের সময় হয়ে গেছে অঘোর, সদরে গে খবর নিয়ে জমাবন্দীর টাকা পত্র কবে দিতি হবে জেনে এসো। যা দিনকাল পড়েছে এখন ঘাট-এর ইজারা বজায় রাখা দায় হবে।

অঘোর সরকার তা জানে। তাই বলে সে—ওসব দেখছি কত্তাবাবু।

ভুবন বাড়ির পথ ধরে।

রোদের তাপ বেড়েছে। গাং-এর বুকে শীতল শান্ত হাওয়া মুছে গিয়ে এবার আসছে দখিনা বাতাস। ভাটির টান নামছে—মুখোট বাতাসে ঢেউগুলো ফুলে ফুলে উঠে তীরভূমিতে আছড়ে পড়ে।

—কাকাবাবু!

ভুবন মাইতি চাইল কমলাকে এগিয়ে আসতে দেখে—তুই!

কমলা বলে—এখনও বাড়ি যাওনি—পিসী তাই খবর নিতে পাঠালো। শরীর ভাল নাই শুনলাম?

মেয়েটার দিকে চাইল ভুবন মাইতি। হাসে সে। জানায়—শরীরের দোষ কি বল? তা হ্যাঁরে—তোর বাবার খবর কি? এখন তো আসেই না। ভুলে গেছে আমাকে। তবু তুই আসিস! খোঁজ খবর নিস্।

চুপ করে কি ভাবছে কমলা। দেখেছে এখন তার বাবাকেও। লোকটা মহেশ মান্নার ওখানে চাকরি নিয়ে আজ তার আগেকার বন্ধু ভুবন মাইতিকে ভুলে গেছে। নিজে তো আসেও না—সেদিন বাড়িতে মাকেও শাসিয়েছে, যাতে কমলাও এদের বাড়িতে না আসে। তবু থাকতে পারে না কমলা।

এই বৃদ্ধের উপর মায়া পড়ে গেছে। আর ঘনশ্যামকে ঘিরে তার মনের অতলে একটি বিচিত্র সুর ওঠে। জাগে রামধনুর রং। এই অনুভূতিটুকু আজ তার নিঃস্ব মনে একটা সম্বল হয়ে আছে।

—কিরে! ভুবন মাইতি ওকে ভাবতে দেখে শুধোয়।

জানায় কমলা—না। মানে বাবা চাকরি নে—আটকে পড়েছে তাই সময় পায় না। চলো বাবু যা রোদ মেলছে পিঠ তেতে যায়।

ঘনশ্যাম কিছুদিন থেকেই মতলবটা করেছিল। কাকদ্বীপের ব্যাঙ্কের তরুণ ম্যানেজার ভূপতিবাবুও ঘনশ্যামের খুব পরিচিত হয়ে গেছেন। দেখেছেন তিনি ছেলেটি সৎ, পরিশ্রমী। আর আড়তদার মদন মোহান্তর খুব প্রিয়জন।

মদনের ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন হয় মাসে কয়েক লাখ টাকার। বড় মাছের ব্যাপারী।

আজ মদন মোহান্তও অবাক হয় ঘনশ্যামদের দলবলকে এত মাছ সমেত তার আড়তে আসতে দেখে। মদন মোহান্ত জানে এই দিগরের গাং-এ ওরা সেরা মাছ মারিয়ে।

এতদিন ওদের দলকে আটকে রেখেছিল মহেশ মান্না। মদন মোহন্ত ওদের মাল পেত না।

আজ হঠাৎ ওই প্রচুর সেরা মাছ নিয়ে ওদের আসতে দেখে মদন মোহান্ত খুশি হয়।

ঘনশ্যাম—নিশাকরদের দু' চারজনকে আহত দেখে শুধোয়। কি হ'ল হে।

ঘনশ্যাম বলে—মহেশ মান্না শালা ডাকাত। মাল-এর ওজনে এতকাল মেরেছে। আজ ধরা পড়তেই ছাখো না মদনবাবু ক্যামন মেরেছে ওদের। মাছ লুঠ করে নিত। নেহাৎ পারেনি।

সেকি। মদন মোহান্ত অবাক হয়।

ঘনশ্যাম বলে—আর মাছ ওকে দেবো না। জেলেরাই সমবায় করবে। তুমিও তো বলেছিলে, ওসব ব্যবস্থা করে দাও। জাল কাল—নৌকা কিছু দাও, সমবায় করছি আমরা।

ওসব কথা বসে হবে, চলো মাল খালাস করো।

এত মাছ দেখে অবাক হয় মদন। ডিঙির খোল ভর্তি ইলিশ—নধর চকচকে ইলিশ। সেরা জাতের পমফ্রেট, পারশে আর বর্ণবৈচিত্র্যময় সমুদ্রের বাগদা চিংড়ি। তার বাজার দর কয়েক হাজার টাকা।

ঘনশ্যাম বলে—কাঁটা লাগাও। ভেটকিগুলো লক্ষে আছে—রূপালী সোনালী আভায় চকচক করছে নধর দশাসই ভেটকি।

মদন যেন স্বপ্ন দেখছে।

শুধোয়—এত মাল মহেশকে দিতে।

নিশাকর বলে—হ্যাঁ গ। এর থিকি বেশীই দিতাম গোপের মুখে।

কাঁটায় মাল চাপাচ্ছে। ওজন হাঁকছে সরকার খাতাবন্দী হচ্ছে। ওরা দাঁড়িয়ে বসে আছে। আজ সকালে মহেশের ঘটনাটা ওদের মনে তখনও জ্বালা ধরিয়ে রেখেছে। দেহের আঘাতগুলো হয়তো মুছে যাবে, কিন্তু ওদের মনের আঘাত মুছবে না।

শীতল মাইতি ওদিকে গুম হয়ে বসে আছে। সেও এদের দলেই মাছ ধরে, কিন্তু মহেশের ঘরে কাজ করে তার বৌটা। দজ্জাল বৌ। মহেশ মান্নার কিছু জমিও ভাগে চাষ করে শীতল। তার মনে হয় আজ থেকে দ্বীপের মানুষগুলোর জীবনে একটা স্থায়ী ফাটলই ধরে যাবে। মহেশ মান্নাও এইভাবে মাছ তুলে আনাটাকে সহ্য করবে না।

শীতল ভয় পেয়ে গেছে। ক্রমশঃ যত ভাবছে ততই বেশী মুষড়ে পড়ে।

নিশাকররা মাছের ওজন দৃষ্টে দর-দামের অঙ্কটা শুনে খুশী হয়। কয়েক হাজার টাকা। আর মদন মোহান্ত টাকাটা নগদই দিতে চায়।

বলে—এখন নে গিয়ে মহেশ মান্নার দেনা কিছু মিটিয়ে দিবি।

ঘনশ্যাম বলে—ওসব হবে মোহান্ত মশাই।

জেলেদের নামে নামে সমান ভাগ হয়ে যায় টাকাটা।

ঘনশ্যাম বলে—ব্যাঙ্কে চলো মোহান্ত মশাই, সব টাকা নে যাবোনি। এই নে সমবায়ের খাতা খুলে দোব আজই। আর জাল কিনতি কিছু টাকা লোন করি দিতি হবে। সব শোধ হই যাবে।

—বেশ তো। মদনও এদের হাতে রাখতে চায়। জানে, এদের মাছের দাম যা হবে তা দিনে কয়েক হাজার টাকা। তারও মুনাফা থাকবে—কারণ সব মাছ

আসবে তারই আড়তে।

নিশাকর, যতন, রতন, জেলেরাও সবাই রাজী।

বলে নিশাকর—ঘনাবাবু যা বলছে শোন্ সকাই। একদিনে কি রজকার করি তাও দ্যাখ, মহেশ মান্নার গব্বে এতকাল সব দিই এসেছি। নে চল—সমবায়ই করতিছি আজই। চলো গো বাবু। চলরে—তুদেরও টিপছাপ দিতে হবে।

সকলেই রাজী।

বলে ওঠে শীতল—আর উসনে আমি নাই গ।

রতন গর্জে ওঠে—কেনে হে?

শীতল বলে—জলে বাস করি কুমিরের সাথি বাদ করতি পারবো নি। আমরা হিস্তে ফেলি দাও, ওই সমবায়ে আমি নাই। মহেশবাবুরে চেননি—শ্যাম করি দিবে ইবার।

গর্জে ওঠে যতন—শালাকে দেখে লিব। তুইও থাকবি—

শীতল গোঁ ধরে—আমার ট্যাকা ফেলি দাও।

ঘনশ্যাম দেখছে ব্যাপারটা। ওদের ঝগড়া তখন তুঙ্গে উঠেছে। যতন মারতেই যায় শীতলকে, শালা বেইমান! মহেশ তুর বাপ্ নারে?

—খবরদার গাল দিবা। শীতল ফুঁসে ওঠে।

তার আগেই রতন ওকে একটা চড় তুলেছে, ঘনশ্যাম বাধা দেয়।

—রতন।

ওরা থেমে যায় ওই গর্জনে। ঘনশ্যাম এগিয়ে এসে টাকাটা দিয়ে বলে—শীতল, নে তোর ভাগের টাকা। একশো বাইশ টাকা আছে—নিয়ে চলে যা।

ঘনশ্যাম রতনদের বলে—কেউ যদি থাকতি না চায় জোর করি তাকে আটকি রাখবি? যেতে দে ওকে।

শীতল টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে এগিয়ে যায় পারঘাটের দিকে। এদিকে আর চাইল না।

বলে রতন—চল শালো। দীপে তোরে পালি গাং-এ চুবাইয়া মারবো, তখন তুর বাপ মহেশ মান্না কি করতি পারে দেখবো।

ঘনশ্যাম এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্ত বলে—চল। শুভকাজে ঝামেলা করিস না। চলো গো মদনবাবু—

ওরা ব্যাঙ্কের দিকে এগোলো। সেখানে সইসাবুদ করতে হবে।

দেরী হয়ে গেল অনেক সেখানেই। আর জালের হদিশও পেয়ে যায়। গাবতলির মহাজন নোতুন সাগরজাল বিচছে, নাইলনের মজবুত জাল। দামও অনেক সস্তা।

নিশাকর বলে—ঘনাবাবু আজ বৈকালে জাল দেখি দরদাম ঠিক করি এক্কেবারে নিই চাই গো।

মটরা বলে—রাত্তি ঘর যাবো নি?

ঘনশ্যামও নিজেদের জাল কিনতে চায়। কাল থেকে মহেশ মান্নার জাল ফেরৎ দেবে। ভাড়া আর দিতে হবে না। তাই ঘনশ্যাম বলে,—কেনে ঘরে কি শালার মাগ বসে আছে যে ফিরতি হবে?

মটরা থেমে গেল।

ইদানিং তিপ্‌লির সঙ্গে একটু ভাবসাব হয়েছে। দামাল মেয়েটা যেন তার মনেও নেশা ধরিয়েছে। ওর জুড়িদার পটলা বলে,—উতো তিপ্‌লির পেছনে ঘুরত্তিছে গো।

ঘনশ্যাম গর্জে ওঠে—মটরা, পোঁদে লাথি মেরে গাং ফেলি দোব, ফের যদি ওসব কথা শুনি।

মটরা পটলার উপর রাগ ঝাড়ে—থাম তো তু। ওসব মিছে কথা গো।

ওরা জাল দেখতে চলেছে।

আজ খুশী হয়েছে তারা। নিজেদের জাল হবে, নিজেরাই মাছ ধরে বিক্রী করে ভালো দর পাবে। যতনা বলে—জাল কিনি কাল বিহেনে মা কালী পূজা দিতে হবে ঘনাবাবু, শুভ কাজের আগে পূজো দিতি হয়।

ঘনশ্যাম জানে যতনার কালী ভক্তির কারণটা। তাই বলে,

—হ্যাঁ। নালি মাল খাবার যুৎ হবে কেন?

যতনা বলে—মা কালীর প্রেসাদ গ। উসব কেনে বলছো। পটলাও যতনার পথের পথিক। বলে সে।

—তা সব্বাই বলছে য্যাখন—পূজোই দ্যান ছোটবাবু। আর আজ রাতে য্যাখন থাকতি হবে গঞ্জে, একটুন মাংস ভাতই হোক। মাংস ক্যাদ্দিন খাইনি।

খেতে ওরা পায় না। রাতে দূর গাং-এর হিমে কাটে ওদের জীবন। ঘরের মায়া বন্ধন নেই। ওরা ফেরে গাং-এর বিপদ মাথায় নিয়ে।

আজ একটা দিন ছুটি পেয়েছে। ঘনশ্যাম বলে—ঠিক আছে মাংস ভাতই হবে, আর পূজোও। তবে বেশী মাল গিলে মাতলামী করলি এই শীতের রাতে গাং-এ চুবিয়ে ছাড়বো।

ওরা তাতেই রাজী হয়ে যায়।

মহেশ মান্না ভেবেছিল একদিন ঝগড়া করে ওরা মাছ তুলে নিয়ে গেছে। হয়তো কালই মাছ ঠিক আসবে আড়তে। আর ওদের সকলের টিঁকি বাঁধা আছে তার কাছে। তার জাল না পেলে মাছ ধরাই হবে না ওদের। একটা জালের দাম কম করে পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা। আর ওদের দাদনের হিসাব কোনদিনই মিটবে না।

তাই মহেশ মান্না নিশ্চিত জানে যে প্রতিবাদ করার শক্তি ওদের নেই। ওই জেলেপাড়ার জমিরও বেনামদার মালিক সে। জানে জেলেরা ওখান থেকে মহেশ তাদের বসত উঠিয়ে দিতে পারে।

সকাল হয়েছে। দূর গাং-এর বুকে সোনালী-আলোর ঝলকানি। গজেনও আড়তে এসে কাঁটা পাল্লা টাঙিয়ে তৈরী। মাছের নৌকাগুলো ফিরবে এবার। গুপীনাথ-এর মন মেজাজ ভালো নাই—মারটা সেও খেয়েছে। আর তিপ্‌লিও রাতের অন্ধকারে কালও কোথায় গেছল। ধরা পড়তে মেয়েটা বুনো বিড়ালের মত ফুঁসে ওঠে—থাম মরদ। যিথানে যাই তুর কি!

গুপীনাথ চুপ করে যায়। মেয়েটা তাকে যেন ব্যঙ্গের চোখে দেখে। গুপীনাথের মনে জাগে দুঃসহ কি জ্বালা। বিড়ি টানছে বালিয়াড়িতে বসে।

হঠাৎ শীতলকে আসতে দেখে চাইল গজেন।

আড়তে মাছের খরিদ্দার দু পাঁচ জন এসেছে এর মধ্যে। বালিয়াড়িতে শীতের সকালে রোদপিঠ করে তারা চা খাচ্ছে। মাছ এলে তাদের আবার সেই মাছ নিয়ে ছুটতে হবে। চালান যাবে। বরফও তৈরী।

শীতল এসে বলে—মাছ আর পাবেন নাই গ মান্নাবাবু।

মহেশ মান্না চমকে ওঠে—কেন রে? মহেশ মান্না খবরটা খরিদ্দারদের জানাতে চায়না তাই শীতলকে নিয়ে ঝাউবনের ওদিকেই চলে যায়।

গাং চিল-এর ডাক ভেসে ওঠে। হাওয়া কাঁপছে ঝাউবনে। কাল সকালে জেলেরা মারামারি করে চলে গেছে। সেই যে গেছে আজও ফেরেনি। বোধ হয় কাল অন্যত্র মাছ বিক্রী করে তারা দিনশেষের ভাটিতে গাং-এ নেমে গেছে, ফিরবে মাছ নিয়ে সকালে।

ক্ষুধার্ত—তৃষ্ণার্ত মানুষগুলো কাল সারাদিন বিশ্রাম পায়নি। তাই জেলে পাড়ার লোকজন মেয়েঝিরাও পান্তা ভাত—জলের পাত্র নিয়ে এসেছে। বালিয়াড়িতে বসে অপেক্ষা করছে—আর দেখছে দূর সাগর মেশা গাং-এর সীমারেখার দিকে। কোন নৌকার চিহ্ন দেখা যায় কিনা। কিন্তু কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। লোকগুলো কোথায় গেল কে জানে।

—ওই গো। হঠাৎ দেখা যায় এদিকের গাং থেকে ফিরে আসছে সাদা লঞ্চটা, পিছনের ডিঙ্গিতে ঢোল কাঁসি বাজছে। সেই শব্দটা ভেসে ভেসে আসছে গাং-এর বুকে।

কদম ছুটে আসে—কি পরব করে আসছে গো। কি সব মালা টালা—লাল কাপড় টাইঙেছে।

গজেন হাঁক ডাক শুরু করে—মাছের ডিঙ্গি আসছে। মাল খালাস কর গে। কাঁটা লাগা গুপী।

চোখের পলকে বাটথাড়াও বদলে যায়।

লোকজন গাং-এর দিকে চলেছে।

মহেশ মান্না ও পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। মনে হয় শীতলের কথাটা ঠিক সত্যি নয়। রাতের বেলায় জাল টেনে ওরা ফিরছে মাছ নিয়ে রোজকার মতই।

কিন্তু অবাক হয় মহেশ মান্না—মাছ কইরে!

ঢোল বাজছে, মালা জড়িয়ে নাচছে যতন—রতন—সকলেই। পটলা, যতন মা কালীর প্রসাদ একটু বেশীই টেনে বেটোর হয়ে নাচছে। আর চীৎকার করে—সাগর দ্বীপ ধীবর সমবায় কি—জয়।

লাল সালুতে ওই ফেষ্টুন লিখে ওরা নাচছে।

জেলে পাড়ার মেয়েছেলেগুলোও ছুটে যায়। রতন বলে—আর মাছ দিব নাই মহেশ মান্নাকে—মোদের ধরা মাছ মোরাই বেচছি। এ্যাই ছাথ—ঝম্ ঝম্ ট্যাকা। কত লিবিরে মাগী। লে—

বেশ কিছু টাকা ওর বৌটার দিকেই ছুঁড়ে দেয়।

মহেশ মান্না থমকে দাঁড়িয়েছে—মাছ দিবি না তাহলে?

ঘনশ্যাম, নিশাকর সর্দার এগিয়ে আসে। বলে ঘনশ্যাম—তোমার জাল নাও মান্নাবাবু। আর তার ভাড়া ওদের দাদন বাবদ এই টাকাটা জমা করে নাও। হাজার দেড়েক টাকা এগিয়ে দেয় সে। ঘনশ্যাম বলে—ওরা সমবায় করেছে। জালও কিনেছে।

—আমার দাদনের টাকা। গর্জে ওঠে মহেশ মান্না।

নিশাকর বলে—বাইশ ট্যাকা করে দিইছিলা, তিনমাস ধরি রোজ ট্যাকা শুধছি। তবু শোধ হবে নি? নাহলি আর হইয়া কাজ নাই।

যতন তুরীয় অবস্থায় ঘোষণা করে—তাহলে ট্যাকা নেহি দেঙ্গা।

অন্যদিন হলে লাফিয়ে পড়তো মহেশের দল ওদের উপর। ঘনশ্যামও রয়েছে। সারা জেলে পাড়ার লোকজন মেয়েরাও এসে পড়েছে। এ সময়

ওকাজ করা যাবে না। তাই মহেশ থামলো। বেশ বুঝেছে সে, আজ ঘনশ্যামই তার মাছের এমন ফলাও ব্যবসাটাকে শেষ করে দিল। তবু মহেশ বলে—টাকা তাহলে আর দেবে না, মাছও দেবে না?

নিশাকর বলে—আমরাই সমবায় করেছি। মাছ উথান থেকেই বেচা হবেক যিথানে দর পাবো।

মহেশ চুপ করে যায়। মনের ভিতর তার ঝড় উঠেছে। কিন্তু ঝড়টাকে চেপেই রইল সে। এর জবাব তাকে দিতেই হবে। দাঁত চিপে চলেছে মহেশ মান্না। বসন্ত পণ্ডিত, গজেন গদিতে বসে দেখেছে সব ব্যাপারটা। আজ তারও ভাবনায় পড়েছে। মাছের খরিদ্দার যারা বসেছিল এবার তারাও উঠে পড়ে মহেশকে ধরে—মাছ আসবে না তবে খামোকাই বসিয়ে রাকলেন। আগে বল্লে তবু কাকদ্বীপেই যেতাম মদনের আড়তে।

মহেশ মান্না ফুঁসে ওঠে—কে বসে থাকতি বলেছিল হে। যেথানে মাছ পাও—যাও। দেখছো তো ব্যাপার।

কোন খরিদ্দার বলে—তাই দেখছি মান্নাবাবু। ছুঁচোর গুও পব্বতে উঠলো। উ শালোরা করবে সমবায়।

অন্য খরিদ্দার শোনায়—পিছনে ঘনাবাবু আছে, দেখলা না। ওকে পারা দায়। মান্নার মাছের কারবার লাটে তুলেছে। এবার সাগর দ্বীপের অন্যসব কারবারও না গুটিয়ে দেয়।

কথাটা মহেশ মান্না শুনে চমকে ওঠে। তাহলে দ্বীপের অনেকেই ভাবছে এবার কথাটা। মহেশ মান্না তার প্রাধান্য হারাতে পারবে না। আর তার জন্য যা করার করবে। ঘনশ্যামকেও সে দেখিয়ে দেবে এবার তার প্রতাপ।

—গজেন।

গজেন কর্তার মেজাজ বোঝে। ডাক শুনে এগিয়ে আসে।

মহেশ বলে—পানসী ঘাটে আনতি বল গে। সহরে যেতে হবে জরুরী কাজ আছে।

গজেন বলে ওঠে—তালে আড়ত।

মহেশ বলে—যা মাল টুকটাক আসে পণ্ডিতকে ওজন করে বিচে দিতে বল। তারপর দেখা যাবে। যা পানসী আনতে বলগে।

হুকুম দিয়ে মহেশ এগিয়ে চলেছে ভেড়ির ধার দিয়ে।

ঢোলবাদ্য শব্দের কলরব শুনে কমলাও এসেছে। দেখছে ঘনশ্যামকে। ওদিকে জেলেপাড়ার মেয়ে বৌরা—আজ এতদিন পর কিছু নগদ টাকার মুখ দেখেছে।

নাচ গান হৈ চৈ চলেছে—আজ তাদের মনে দিনবদলের স্বপ্ন। নিশাকরদের ঘিরে ধরেছে তারা।

কদমও খুশিতে ফেটে পড়ে—তালি আমাকে মাছ কি দিবা হে সর্দার?

নিশাকর বলে—পাবি রে। তুকে সেরা মাছ দিব।

কদমের সম্পর্কে ঠাকুর্দা হয় সর্দার। কদম বলে,—মাছ কি লেবে, মন চাই গো বুড়া।

—উটো তো বুড়িকেই দিচ্ছি রে।

হাসছে সকলে। ঢোল, বাঁশী জুটেছে। লম্বা বিশাল নতুন কেনা জালটাকে ওরা সাগর বালিতে মিলে পরখ করছে। আজ গঙ্গামায়ি কপিলমুনির পুজো দিয়ে জাল নামাবে।

সকলেই সাড়া দেয়—হ্যাঁ হে! চলো সব্বাই।

কার খেয়াল হয়—ছুটবাবু কতি গেল হে? তাকেও নে গে সিন্দুর মাখাতি হবে।

কদম দেখেছে ব্যাপারটা।

কমলাও এসেছিল।

ঘনশ্যামকে দেখে বলে··কাল থেকে বাড়ি ফেরোনি, কাকাবাবু ভাবছে।

ঘনশ্যাম জানায়—দেখলি তো কি কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ওরা তবু এবার খাটুনির দাম পাবে। খেতে পাবে রে।

কমলাও খুশি হয়েছে। দেখেছে একটা লোক ওই মহেশ মান্না এ দ্বীপের মানুষগুলোকে যেন শেষ করে এনেছিল। আজ ঘনশ্যামই তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

কমলা দেখছে বলিষ্ঠ ছেলেটিকে। উস্কোখুস্কো চেহারা, মাথার চুলগুলো এলোমেলো। কমলা ওই ছেলেটিকে যেন নতুন করে দেখছে।

মহেশ মান্না চলেছে ভেড়ির পথে। সে ঝাউবনের ধারে ওদের দুজনকে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চাইল। মনে হয় ওরা নিজেদের কোন স্বপ্ন জগতে হারিয়ে গেছে।

মহেশ মান্নার দুচোখে কি জ্বালা ফুটে ওঠে। ঘনশ্যামের সব স্বপ্ন সে মুছে দেবে। মহেশ মান্না এগিয়ে গেল।

—ছোটবাবু গো। কমলাদিদি চল। মন্দিরে যেছে সব্বাই পুজো দিতে।

কদমের ডাকে চাইল ওরা।

ঘনশ্যাম বলে—বাড়ি যেতে হবে রে।

কদম বলে—যাবা গো। কমলাদির তো মানসিক থাকতি পারে, চলো বাপু মন্দিরে।

অবাক হয় ঘনশ্যাম—কিসের মানসিক রে কমল?

হাসে কমলা—ধ্যাৎ! কদমের যত্তো বাজে কতা। চলো—যাচ্ছি মন্দিরে।

ঢোল, কাঁসি, সানাই বাজিয়ে বালুচর ধরে জেলেদের শোভাযাত্রা চলেছে মন্দিরের দিকে। কমলা ঘনশ্যামও ওই শোভাযাত্রার সামিল হল।

লঞ্চে রয়েছে মটরা। লঞ্চ ফেলে যাবার উপায় তার নেই। ইঞ্জিন, গিয়ার এসবে তেল দিয়ে মুছতে হবে। ডেক ধুতে হবে। দু এক জায়গায় রং চটে গেছে, সে সব পালিশ করে রং দিতে হবে। ঘনশ্যাম নিজের চেয়ে লঞ্চটাকে ভালবাসে। যন্ত্রপাতি ঝকঝকে চাই—লঞ্চের ধোলাই ঠিকমত না হলে চলবে না। মারধোর করে।

মটরার নেশার ঘোরটা তখনও ঠিক কাটেনি, কটনওয়েষ্ট নিয়ে মুছছে ইঞ্জিনটা। বালুচর ফাঁকা—ঢেউগুলো ভাসছে বালুচরে। আড়তের টিনের চালায় আজ লোকজনও তেমন কেউ নেই।

লঞ্চটা হঠাৎ নড়ে ওঠে। চাইল মটরা। তার চোখে গোলাপী নেশার ঘোর কাটেনি। সামনে তিপলিকে দেখে অবাক হয়। মেয়েটাও যেন তার সন্ধানেই ছিল। দেখেছে তিপলি ঝাউবন থেকে ওই জেলেদের উৎসব-আনন্দ।

ওই উৎসবে যোগ দেবায় অধিকার তার নেই। গুপীনাথকে সে নিশাকরের ঘর থেকে সরিয়ে এনেছিল সেদিন এক নেশার ঘোরেই। কিন্তু মেয়েটার ক্ষুধার শেষ নেই। সারা বসতির মানুষগুলোকে মেয়েটা যেন নাচিয়ে কি আনন্দ পেতে চায়। তাই একা গুপীনাথে তার মন ভরে না।

বলিষ্ঠ উদ্দাম লাস্যময়ী মেয়ে তিপ্‌লি। বুনো গাং-এর মত মাতাল করা তার যৌবন। হাওয়ায় উড়ছে তার শাড়িটা, নিরাভরণ পুরুষ্ট বুকগুলো আধ আদুড় হয়ে যায়। নিটোল হাত—নাভির বেড়—নিপাট দেহখানা পুরুষের চোখের সামনে মেলে ধরে পুরুষের দেহে মনে আগুন জ্বালিয়ে সে তৃপ্তি পায়।

—তুই! মটরা নেশার গোলাবী আমেজ যেন ঘন হয়ে ওঠে। হাসছে তিপ্‌লি—কেন আসতে নাই? তুকে দেখতি এলাম।

মটরা কাজ বন্ধ করে চেয়ে থাকে। দুলছে লঞ্চটা ঢেউ এর দোলায়। গাং-এ জোয়ার আসছে।

তিপ্‌লি বলে—কিরে মরদ। কাল রাত্তি গেলাম তুর ঘরে—কত্তো খুঁজলাম—কত্তি ছিলি ?

—কাল আটকে রইলাম উদের সাথে।

পা মেলে বসেছে মেয়েটা, পেট আঁচল থেকে একটা বোতল বের করে বলে—তুর জন্যি নে এলম। নে মটরা যেন কি আহ্বান শোনে। তার শিরায় মাতন জাগে—মাল খাবো ?

হাসছে মেয়েটা—মাল খাবিনা। একটুন মেয়েছেলে ভালোবাসবি না—কি রে ?

—ম্যাষ্টার যে বকে। মটরা জানায়।

ও ঘনশ্যামকে জাহাজী ভাষায় ম্যাষ্টার বলেই ডাকে। মেয়েটার গা গতরে যেন ঢেউ খেলে যায়। বলে সে—তুর ম্যাষ্টার যে ওই বসন্ত ম্যাষ্টারনীর মেয়েটাকে নিয়ে কি করছে জানিস ? খুব পিরীত রে—

হাসছে মেয়েটা। মটরা চুপ করে থাকে। বোতলটা খুলে তিপ্‌লি নিজে এক ঢোক খেয়ে এগিয়ে দেয়—লে। খেয়ে লে।

দেখেছে ওই গুপীনাথ তিপলিকে লঞ্চে উঠতে। একাই বসেছিল সে শূন্য আড়তের চালায়। হঠাৎ তিপ্‌লিকে আসতে দেখে খুশী হয়েছিল গুপীনাথ। ভেবেছিল জেলেপাড়ার অন্য মেয়েদের মত তিপ্‌লিও তার জন্যেই খাবার আনবে। তার পথ চেয়ে থাকবে। ভালোবেসে সে তার বাবা মাকে ছেড়ে ওই বিজাত মেয়েটার ঘরেই গেছে। তবু আশা করেছিল ঠকবে না সে। কিন্তু অবাক হয়—তিপ্‌লি এদিকে এল না। জলে নেমে ওদিকের লঞ্চের গেরাপির শিকল ধরে উঠে গেল মটরার কাছে। অসহ্য রাগে জলছে গুপীনাথ। প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারে না। আজ মেয়েটাকে সে বেইজ্জৎ করবেই। গুপীনাথ এগিয়ে গিয়ে লঞ্চের ওদিকে দাঁড়ালো। বাইর থেকে কিছু দেখা যায় না। ওদের হাসির শব্দ ওঠে। মনে হয় লঞ্চে উঠে গিয়ে হাতের ডাণ্ডায় একটা ঘায়ে খতম করে দেবে মেয়েটাকে। কিন্তু মটরাকে ভয় হয় তার। কাল ওকে দেখেছে যমদুতের মত লড়তে। সেও তাকে ছেড়ে দেবে না।

লঞ্চের কোলে কিসের শব্দ ওঠে। অস্ফুটস্বরে মাতাল মেয়েটা যেন কৃত্রিম কোপে ওকে বাধা দিতে চায়—এ্যাই। এ্যাই মটরা। খবরদার গায়ে হাত দিবি না। হ্যাংলা কোথাকার—এ্যাই। ন্‌-না—ছিঃ ছিঃ কি বেহায়ারে।

মেয়েটার কামনা মাতাল দেহের জোয়ার এসেছে নদীতেও। দুজনে যেন সেই জোয়ারে তলিয়ে গেছে।

—উঃ, এ্যাই—

মটরার উন্মাদ নিঃশ্বাস-এর শব্দ মিশেছে গাং-এর হাওয়ায়।

গুপীনাথ চুপে চুপে লঞ্চের ছোট নোঙরটার শিকলের আংঠা খুলে লঞ্চটাকে ঠেলে দেয় গাং-এর দিকে। বাঁধনছাড়া লঞ্চটা এইবার ভেসে ভেসে চলেছে। তীরে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে গুপীনাথ—যা শালারা জাহান্নামে। মজা বেরুবে এইবার।

মটরা যেন অতলে তলিয়ে গেছে। তিপ্‌লির বিবশ দেহটা তার দখলে, ওর দেহের মাদকতা আচ্ছন্ন করেছে তাকে। তার অতৃপ্ত কামনা উন্মাদ করে তুলেছে ওদের দুজনকে।

কখন যেন হারিয়ে যায় তারা দুজনে কি এক অজানা জগতের অসীমে। হাঁপাচ্ছে মটরা। ওপাশে পড়ে আছে তিপ্‌লির তৃপ্ত দেহটা। মুখে ওর বিজয়ীর হাসি।

এমন সময় খেয়াল হয় মটরা, কারা চীৎকার করছে—হাঁকছে। চমকে ওঠে সে। চাইল বাইরের দিকে। অবাক হয় যে, তীরে আর নেই লঞ্চটা, বেশ দূরের গাং-এ ঢেউ-এর মাথায় গতিহীন লঞ্চটা অসহায়ের মত ভাসছে। দূরে মন্দিরের বালুচর থেকে হাঁকছে নিশাকর, ঘনশ্যাম—মটরা।

মনে হয় নোঙর ছুটে বের হয়ে গেছে লঞ্চটা। ঢেউ-এর মাঝে বেকায়দায় পড়লে বিপদই হবে।

নীচে ইঞ্জিন, উপরের ডেকে ষ্টিয়ারিং হুইল। একজন ইঞ্জিন চালায় অন্যজন চালায় উপর থেকে লঞ্চটা। কিন্তু একা সে। কোন কিছু করার উপায় নেই।

বেকায়দায় লঞ্চটা এইবার এ কাৎ ও কাৎ হচ্ছে ঢেউ-এর আঘাতে।

ওদিক থেকে ছুটে ডিঙ্গি নিয়ে আসছে ঘনশ্যাম, পটলা, নিশাকর আরও কজন।

কোন রকমে এসে ওরা লঞ্চে উঠেই অবাক হয়ে তিপ্‌লিকে দেখে, খোলা শূন্য বোতল—চাল কলাই ভাজাও রয়েছে। ঘনশ্যাম কিছু বলার আগে নিশাকর গর্জে ওঠে।—মুখপুড়ি—তু আবার ইখানেও এয়েছিস। শ্যাষ করবো তোকে।

ঘনশ্যাম বলে—ইঞ্জিন চালু কর পটলা।

ও গিয়ে ষ্টিয়ারিং-এ বসে ফেরার লঞ্চটাকে ঘাটে এনেছে। জেলেপাড়ার সকলেই ভিড় করে আসে।

মটরা কাঁপছে ভয়ে. নিশাকর সর্দারও চীৎকার করে।—কি হত জানিস?

গুপীনাথও ছুটে এসেছে। চীৎকার করে সে—আমার বৌটাকে নষ্ট করেছে মটরা। বিচার করতি হবেক।

তিপ্‌লিও হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়ে ছোটবাবুর ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। জনতাও স্তব্ধ। ঘনশ্যাম বোধ হয় মটরা আর তিপ্‌লিকে শেষ করে দেবে এইবার।

গুপীনাথ বলে—বিচার করেন ছোটবাবু।

ঘনশ্যাম লঞ্চ থেকে নেমে এসে গুপীনাথের গালে সপাটে একটা চড় কষাতে ছিটকে পড়ে গুপীনাথ।

গর্জে ওঠে ঘনশ্যাম—মরদ! ঘরের বউকে বশে রাখতি পারিস না আবার বলে কিনা বিচার চাই! এ্যাই ছুঁড়ি—

তিপ্‌লি নেমে এসেছে। বলে ঘনশ্যাম—বালুচরে নাক খৎ দিয়ে ওই পাড় অবধি যেতে হবে। তোর নাকটার ছাল চামড়া উঠে যাবে—যা। নাহলে নাক কেটে নোব।

—বাবু গো! তিপ্‌লি আর্তনাদ করে ওঠে।

—যা! লাগা নাকখৎ।

মেয়েটা প্রাণের দায়ে নাকখৎ দিয়ে চলেছে। পরক্ষণে একটা শব্দ ওঠে গাং-এর জলে, মটরা দাঁড়িয়েছিল—ঘনশ্যাম-এর এক লাথিতে ছিটকে পড়ে গাং-এর জলে—যা শ্লা পেরেম সাগরে হাবু ডুবু খেয়ে ওঠ। তারপর দেখছি তোকে। চলরে কমল। শালাদের জন্যে মরেও শান্তি নাই।

ভুবন মাইতি সমবায়ের খবরটা শুনেছে। ঘনশ্যামের পথ চেয়েছিল সে। রমণ ডাক্তার দেখতে এসেছে। ওষুধ পত্র দিয়ে বলে—একটু বিশ্রাম নিতে হবে মাইতি বাবু। আর এত চিন্তা ভাবনা করেন কেন?

হাসে ভুবন মাইতি। জমি জায়গাও গেছে অনেক। এখন পারঘাটাই ভরসা। ঘনশ্যাম সেদিকেও নজর দেয় না। বলে ভুবন—ওসব বলে লাভ নাই ডাক্তার। ঘনশ্যাম কি যে করছে। ওর ভাবনাতেই গেলাম।

রমন ডাক্তার চলে গেছে। ঘাটে অঘোর নেই। সে গেছে সদরে। জানে ভুবন—এসময় ঘাটের অন্য লোক জন যারা আছে তারা চুরি করবেই। এক সময় মনে হয় এসবে লাভ কি! তার নিজের ছেলে নেই। এ কথাটা এবার যেন মনে পড়ে। ঘনশ্যাম তাই তার মত বিনয়ী নম্র স্বভাব পায় নি। বেশ বলিষ্ঠ। আর সেই দূর অতীতে নদীর চর থেকে ভেসে যাওয়া ছেলেটাকে কুড়িয়ে এনে যেন বিপদেই জড়িয়েছে সে। নাহলে আজ তার এসব ভাবনারও

দরকার হতো না।

বোনকে বলে ভুবন—বুঝলি গিরি, সেদিন তোর বৌদির কথায় গাং-এ ডোবা ছেলেটাকে তুলে নে এলাম, নাহলে আজ সুখে শান্তিতে থাকতাম রে! কোন খবরও পেলাম না—কোথাকার কাদের ছেলে।

গিরি বলে—ওসব কথা আজ তুলছো কেন দাদা। ঘনশ্যাম তো অন্যায় কিছু করেনি। এতলোকের ভালোর জন্যই লড়ছে। ও সত্যি ভালো ঘরের ছেলে দাদা। নাহলে পরের জন্য এত করে।

চুপ করে থাকে ভুবন মাইতি। কথাটা সেও অস্বীকার করতে পারে না। তবু মনে হয় কোথায় ভুলই করেছে ঘনশ্যাম। আজকের এই রাজ্যিজোড়া অন্যায়ের বুকে বসে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কথা ভাবলে সমাজের কিছু স্বার্থপর মানুষ তাকে ছেড়ে দেবে না।

গিরিবালার কথায় বলে—না। ওদের কথা ভাবতে চাইনা রে। তবু মনে ঠেলে আসে। ওর পরিচয়টাও দিয়ে যেতে পারবোনা—আমি আর ক'দিন।

গিরিবালা বলে—ও যা জানে মানে সেই পরিচয় নিয়েই থাকতি দাও দাদা। এতে ও শান্তি পাবে।

ভুবন তবু ঘনশ্যামকে ঢুকতে দেখে চাইল—কোথায় ছিলি কাল থেকে। মহেশও কাল এসে কি সব বলে গেল।

ঘনশ্যাম চুপ করে থাকে।

গিরিবালা বলে—এই ফিরলো ছেলেটা। ঘনশ্যাম যা বাবা চান করে কিছু মুখে দিয়ে জিরুগে। ওসব কথা পরে হবে।

ভুবন বলে—মহেশ খুব রেগে গেছে রে। কি ক্ষেতি করবে আবার কে জানে।

ঘনশ্যাম বলে—যা পারে করুক ও। তবে ওকেও ছেড়ে দেব না বাবা।

বাবা! ভুবন মাইতির শূন্য বুকে কি বিচিত্র অনুভূতি জাগে। এই যেন অনেক শান্তির। হোক অর্থহীন—তবু এই পরিচয়টুকু নিয়ে ভুবনও তৃপ্ত থাকবে।

ঘনশ্যাম বলে—এ নিয়ে তুমি ভেব না।

ভুবন বলে—অঘোর সদরে গেছে। ঘাটের ইজারা ডাক-এর দিন আজ। ঘাটে কেউ নাই—তুই একবার যাবি। কেউ নাই।

ঘনশ্যামের ওই পারানির কড়ি সংগ্রহ করতে মনে চায় না। অন্যদিন হলে জবাবই দিত সে। আজ কি ভেবে বলে—ঠিক আছে। যাবো।

গিরিবালা এক কথায় আজ ঘনশ্যামকে রাজী হতে দেখে খুশি হয়। বলে

সে—চল বাবা। চান খাওয়া করে নে। কাল থেকে তো পথেই রইছিস।

বসন্ত পণ্ডিতের মন মেজাজ ভালো নেই। মেলার মরশুমে বেশ টাকা রোজকার করে মানুষটা রক্তের স্বাদ পেয়ে গেছে। টাকার গন্ধ পেয়ে বসন্তও তার আগেকার শান্ত স্বভাবটাকে হারিয়েছে। তখন বাড়িতে থাকতো, ধীর স্থির একটি মানুষ। মেলার মরশুমে মহেশ মামার ওখানে কাজ করেছে, তারপর মেলার পাট চুকিয়ে সে ভাবনায় পড়েছিল। কিন্তু দেখেছে মহেশবাবু তাকে জলে ফেলেনি। এনে মাছের আড়তে বসিয়েছিল। সেখানেও খাতাপত্র লিখতো।

দিনের বেচা কেনা হতো, মহেশ বলে—দুখানা খাতা করো পণ্ডিত।

একটায় শতকরা চল্লিশ ভাগ করে মাছ তুলবে। দর লিখবে অর্দ্ধেক করে।

মহেশের কথাটা বুঝে নিতে দেরী হয় না বসন্তের। ইদানীং এসব বুঝতে শিখেছে সে। বলে বসন্ত—আজ্ঞে তাই হবে।

মহেশ খুশী হয়—ঠিক আছে। আর এই কাজের জন্ম বাড়তিও কিছু পাবে।

বসন্ত পণ্ডিত ইদানীং ভালোই ছিল। চাকরীটা হারাতে হয়নি। আর হিসেবের কারচুপিটা কেনা করে? ওসব করতে হয়।

কিন্তু সেদিন ঘনশ্যাম যা করেছে তাতে চমকে উঠেছে বসন্ত। একেবারে গদির লোকজনদের মেরে গাং-এর জলে ফেলেছে, তারও ভয় হয়েছিল মহেশ বাবুর গায়েই হাত না তোলে। নেহাৎ তোলেনি সেটা। তারপর কাল আরও যা করেছে তাতে বসন্ত পণ্ডিতও ভাবনায় পড়েছে। আড়তের সব মাল আসা বন্ধ হয়ে গেছে। এমন চালু আড়ত তুলেই দেবে বোধ হয় মহেশ মামা। কাল শূন্য হাতে ফিরেছে। আরও দেখেছে বসন্ত ঘনশ্যাম আর কমলাকে। কমলাও জেলেদের ওই হৈ হল্লার মধ্যে এসে জুটেছে। ঘনশ্যামের সঙ্গে গেছে মন্দিরেও জেলেদের হয়ে পূজো দিতে।

বসন্ত পণ্ডিত বাড়ি ঢুকে তাই গর্জে ওঠে—তোমার মেয়েকে এইবার সামলাও।

বাসিনী স্বামীকে ঘরে পা দিয়ে ওই ভাবে চীৎকার করতে দেখে চাইল। শুধোয় সে—কি হল আবার।

বসন্ত পণ্ডিত বলে—আবার ওই জেলে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গেছে। ঘনাও রয়েছে।

বাসিনী বলে—ওদের পূজো দিতে গেছে বোধহয়।

—এইবার আমার ছাদ্দের পিণ্ডি দিতে বলো! বসন্ত গর্জে ওঠে।

বাসিনী চাইল স্বামীর দিকে।

বসন্ত গজগজ করছে তখনও—ঘনা এবার আমারও অন্ন মারবে বোধ হয়। মহেশ মান্নার মাছের আড়ত বন্ধ করে দিলে জেলে পাড়ার লোককে ক্ষেপিয়ে তাড়ানো। মহেশ মান্নারই দোষে সে নাকি সব খাচ্ছিল ওদের। তাই ওই বোকা মানুষগুলোকে কৌশলে তাড়িয়ে নিজেই সব খাবার তাল। শয়তান একটা। আর তোমার মেয়ে কিনা ওইখানেই যাবে। ওর ভাবনাতেই গেলাম।

বাসিনী কথাটা ভেবেছে অনেকদিন থেকেই। বলে সে—তোমাকেও বলি বাপু, দুজনে ভাবসাব। মাইতিকত্তাকে বলো। বিয়ে থা যদি হয়ে যায়, তাহলে এসব ভাবনা আর থাকবে না।

বসন্ত পণ্ডিত চাইল স্ত্রীর দিকে। বলে সে—ওই জানোয়ার মদো মাতালটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব? মহেশ মান্নাকেও বলেছি। ও বলে—অন্যত্র পাত্র দেখো বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর ওই ঘনার আছে কি?

বাসিনী বলে—সাগর দ্বীপে মাইতি কত্তার নাম একডাকে সবাই চেনে, মানীলোক। এতবড় ঘর।

মুখ ভেংচে ওঠে বসন্ত—এতবড় ঘর। ও নামেই তালপুকুর। ঘটি ডোবেনা বুঝলে: ঘ্যাখো এবার মহেশ মান্নার পিছনে লেগেছে। সাগর দ্বীপের বাস না তুলে ছাড়ে।

কমলা ফিরছে মন্দির থেকে। তখনও চোখের সামনে সেই ভাসমান লঞ্চ থেকে তিপ্‌সিকে নামিয়ে নাকখৎ দেবার কথাটা মনে পড়ে। দুজনে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। আর লঞ্চটা ভাসিয়ে দিয়েছিল গুপীনাথ। সেটা বের করেছে ঘনশ্যাম মারের চোটে।

নিশাকর তার ছেলেকেও মেরেছে বেদম।

মটরার সেই গাং-এ পড়ার দৃশ্যটা মনে পড়ে। হিমজলে সোয়েটার প্যান্ট পরে গাড়োলের মত ফুলে উঠেছে মটরা।

কমলা বলে ঘনশ্যামকে—ধন্যি যা হোক চ্যালারা তোমার। মটরাকে কম মারলে কেন?

ঘনশ্যাম বলে—মটরার দোষ কি? লঞ্চে এল মেয়েটাই আর ওই ব্যাটা গুপীনাথ একটা মাদী। ঘরের বৌ সামলাতে পারে না? ওরই তো দোষ।

কমলা হাসে—ওরে বাব্বা; ঘরের বৌ হলে তো তাহলে বিপদ। তাই ওসব হতে চাই নি বাবা!

ঘনশ্যাম দেখছে ওকে। ধমকে ওঠে—আর তোকে বিয়েই বা কে করবে? যা বাড়ি যা।

কমলা বলে—বিয়ে করার জন্যে কত লোক ঘুরছে।

হাসে ঘনশ্যাম—তাহলে করেই ফ্যাল। দিব্যি একপাত ভোজ খেয়ে আসবো।

কমলা দাঁড়ায় নি। চলে এসেছে বাড়িতে। এতক্ষণে খেয়াল হল বেলা হয়ে গেছে। কমলা বাড়ির ঢোকার মুখে বাবার চড়া গলা শুনে থমকে দাঁড়ালো। লোকটা ইদানীং বেশ জোরে জোরে কথা বলে। যেন ধমকাচ্ছে।

বাবাকে ঘনশ্যাম-এর সম্বন্ধে ওই সব কথা বলতে শুনে একটু অবাক হয় কমলা। বুঝেছে সে মহেশ মান্নার কাছে তার বাবাও নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে।

বাড়িতে পা দিতেই বসন্ত মেয়েকে দেখে গর্জে ওঠে—কোথায় গেছ্'ল? ওই ঘনার সঙ্গে মিশতে বারণ করেছি না, কেন গিইছিলি? ওটা মহেশ-বাবুর আড়ত তুলে দেবে। আমার ভাত ঘোচাবে। আর তুই কিনা ওই বখাটে বাঁদরটার সঙ্গে মিশবি?

বাসিনী এগিয়ে আসে। বলে সে—এখন এলে, চান টান করে খাও। পরে বুঝিয়ে বলো। যা কমলা, চান করে নে গা।

বসন্ত ভেবেছে কথাটা। সকালে গেছল বালিয়াড়ির আড়তে।

মাছেরও আমদানী নেই আর মহেশ মান্না গজেনও আসেনি। কাল সদরে গেছে। এখনও ফেরেনি। সকালে এসে গুম হয়ে বসেছে বসন্ত।

বাসিনী বলে—কি হ'ল?

খিঁচিয়ে ওঠে বসন্ত—হবে আর কি আড়ত উঠে গেল। এবার তোমার মেয়েকে বলো চরে খেতে।

বাসিনী দেখছে ক'মাসেই লোকটা বদলে গেছে। বলে সে—কি কথার ছিরি হয়েছে। তখন মাষ্টারি করতে আধপেটা খেয়েও শান্তিতে থাকতাম। এখন জ্বলে পুড়ে মরছি।

কমলা চুপ করে থাকে। দেখেছে বাড়ির পরিবেশও বদলে গেছে একেবারে। বাবার এই রূপ দেখে সেও বিস্মিত হয়েছে।

অযোধ্যাপ্রসাদ বহুকাল আগেই অযোধ্যা থেকে এখানে এসেছে। বয়স্ক লোকটা সেই অতীতে একবার এখানে এসেছিল তাদের মূল আশ্রম থেকে।

সন্ন্যাসীর নিঃস্ব রুক্ষতা তাঁর নেই। এখানে এসে সমুদ্র সঙ্গমের এই নির্জনতার মাঝে মন্দিরেই থেকে যান তিনি। ক্রমশঃ মানুষটি এই দ্বীপের মানুষদের জীবনের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছেন। সকালে পুজোর পর চাতালে বসেন। দ্বীপের অনেক মেয়ে—গিন্নী লোকজন আসে। কাউকে জলপড়া—কাউকে কিছু উপদেশ, কারোও কলহ বিবাদের মীমাংসাও করতে হয় তাঁকে—কিরে জগদীশ, বৌটাকে মারিস কেন ?

জগদীশ চুপ করে থাকে। মদ খেলেই তার মাথা বিগড়ে যায়। অযোধ্যাপ্রসাদ বলেন—মদ-টদ কম করে খা। আর কাল থেকে আশ্রমের মঠে তুই কাজ করতে আসবি। রোজ পাবি—

মাঝে মাঝে অযোধ্যাপ্রসাদ গঞ্জেও আসেন—কি ভুবনবাবু! কেমোন আছো ? আর যাও না উদিকে ?

ভুবন মাইতি পারঘাটার গদিতে বসেছিল। অঘোর সরকার কাল সদরে গেছে এখনও ফেরেনি। বোধ হয় আজই ডাক হতে পারে তাই রয়ে গেছে। অযোধ্যাপ্রসাদকে দেখে উঠে গিয়ে প্রণাম করে ভুবন। বলে—শরীর ভালো নাই।

হাসেন অযোধ্যাপ্রসাদ—নাই কেন ? দাওয়া করো। ঘনশ্যাম বহুৎ ভালো কাজ করেছে ভুবন। হিম্মৎদার লেড়কা। গঙ্গামায়ি ওকে দয়া করবে। গরীব দুখিয়োকি উপকার করলো।

ভুবন বলে—কিন্তু মহেশ মান্না খুব রেগে গেছে।

হাসেন অযোধ্যাপ্রসাদ। উদাত্ত হাসি। বলেন তিনি—সব উন্‌কি কৃপা সে ঠিক হোয়ে যাবে। মহেশ বিলকুল ঠিক কাম করছে না ভুবন!

অব চলি। মন্দিরকা সামান সব লিয়ে যেতে হোবে।

নরহরি ভট্‌চায—রমণ ডাক্তারের চালায় বসে ছিল। ইদানীং রমন ডাক্তারও মহেশের কাছে কিছু ধান জমি পেয়েছে ধবলাটে সস্তাদামে, তাই ওর অনুগত। নরহরি ভট্‌চায, ইস্কুলের মাষ্টার নটবর, মদন ওরাও আসে।

নটবর অযোধ্যাপ্রসাদের কথাগুলো শুনছে।

নরহরি ততক্ষণে মহেশ মান্নার মাছের আড়ত লুটের কথাই বলছে। বলে সে লুট করবে আড়ত। কিহে বসন্ত, তুমিতো ছিলে। বল না ব্যাপারটা নটবরদের।

নটবর মাষ্টার রুখে ওঠে—এতবড় সাহস ঘনশ্যামের আড়ত লুট করবে! আমরা খবর পেলে দেখে নিতাম।

নরহরি বলে—মহেশ এসব গোলমাল করতে চায়নি। অথবা মারপিট, রক্তপাত হবে এটা তো ভালো কথা নয় হে!

নটবর তবু বলে—অন্যায় কথা। ঘনশ্যাম আসুক। দরকার হলে আমরাও আন্দোলন করবো। বিডিও অপিসে ডেপুটেশনে যাবো। আড়ত উঠে গেলে আমাদের এখানের ক্ষতি।

বসন্তের কথাটা মনে ধরে। ক্ষতি তারও। আর নটবর ঠিক বলেছে। বলে সে—ঠিক বলেছো বাবা নটবর। বিদ্যার এই গুণ। তা বাবা আন্দোলন করতেই হবে।

নটবর আগেকার সেই আন্দোলন-এর কথা ভোলেনি। মদনও জানে আন্দোলন তারা কেমন করেছিল। তারজন্য চাষীদের ধান উঠেছে মহাজনের গোলায়, দু-চারজন বিদ্রোহী—চাষী মজুরের লাশ রাতারাতি গায়েব হয়ে গেছে। আর তারপরই নটবর, মদন এখানের ইস্কুলে চাকরি পায়। নটবর নাকি কিছু টাকাও পেয়েছে।

নরহরি আন্দোলনের কথায় বলে—তা বাপু, একদিন ধর্মোঘট করিয়ে দাও গঞ্জে! মাছের আড়ৎ চাই। এখানের মাছ বাইরে যাবে না।

অযোধ্যাপ্রসাদকে দেখে চাইল! তিনি বলেন—কি ভট্চায মোশাই পূজা পাঠ কি সাগর মেলার ক'দিন করো, বাকী সন্ধ্যা বেলায় এই পূজা করোজী? এ্যাঁ—ধরম করম করো।

নরহরির উদ্দাম লেকচার থেমে যায়। এই একটি মানুষকে সে ভয় করে। লোকটার প্রশান্ত হাসি, উদাত্ত কণ্ঠস্বরকে এড়িয়ে চলে সে। মহেশ মান্নাকেও যা তা বলে বসে।

নরহরি থেমে গেল। বলে সে,—এমনি কথাবার্তা বলছিলাম। দ্বীপে জুলুমই বাড়ছে বাবাঠাকুর। অযোধ্যানাথও দেখেছে, প্রথম যখন সে আসে তখন এত রকমারি মানুষ আসেনি। পরিবেশ ছিল শান্ত, সুন্দর। মহেশ মান্না তারপর এসেছে এখানে।

ক্রমশঃ ওই একটা লোক নিজের স্বার্থে আর কি দুর্বার নেশায় মেতে উঠে এই দ্বীপের মানুষের জীবনে এনেছে বিপর্যয়। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও কিছু বিচিত্র মানুষ।

অযোধ্যানাথ বলে—পানি জ্যাদা হলে মছলি থাকে—সাথ সাথ মগর ভি আসে। তাই হল। ক্যা পণ্ডিত—শোনলো। ইস্কুল পাঠশালা তুলে দিয়ে মহেশবাবুর কাম লিয়েছো! তা বিদ্যাদান সেই আচ্ছা হ্যায়। বিদ্যা সব আজ অবিদ্যা হয়ে গেলো। চলেজী।

চলে গেল সে।

নরহরি গজরায়—কথা শুনলে নটবর ভণ্ড ওই ঠাকুরের।

নটবরও বুঝেছে ওর কথাগুলো। বলে সে—মন্দিরের আয়ে বসে বসে খাচ্ছে আর সাধুগিরি ফলাচ্ছে। মেহনতি জনতার দুঃখ কি বুঝবে।

রমন ডাক্তার চায়ের ব্যবস্থা করে। চা আসতে ওরা আলোচনা থামিয়ে চায়ে চুমুক দিতে থাকে। বলে নরহরি—মান্নাবাবু ফিরলে অযোধ্যা ঠাকুরের কথাগুলো বলতে হবে। লোকটা কি বলে গেল শুনলে—বলে কুমীরও আসে জলায়। সব মাছ মেরে দেয় সে।

বসন্ত পণ্ডিত ভাবছে কথাটা। তার নিজের ভাবনাটাও বেড়েছে। দুদিন বেকার বসে আছে। মহেশবাবু ফিরলে এবার হাতে পায়ে ধরে একটা কাজ যোগাড় করতেই হবে, আর নটবর এখন হেডমাষ্টার। ওকেও খোসামুদি করে প্রাইমারী টিচারের কাজের জন্যও লেগে থাকতে হবে।

বসন্ত বলে—নটবর। তোমার কথা তোমার কাকীমা প্রায়ই বলে। আজ তো কাজ নেই, চলো যাবার পথে ঘুরে যাবে।

নটবরও কৌশলী। মহেশ মান্নার মত লোককে কায়দা করে সে ইস্কুলে এসে বসেছে। এর মধ্যে ইস্কুল ফাণ্ড গড়তে লেগেছে। আর মাসে মাসে বেহিসেবী কিছু টাকাও সরাচ্ছে। মনে মনে লোভটা এবার ঠেলে উঠেছে। কমলাকেও দেখেছে সে পথে ঘাটে। নটবর বসন্তের কথায় বুঝেছে তার দাম-এর স্বীকৃতি দেয় সে। নটবর কমলার কথা ভাবছে। তবু বলে সে—যেতে সময় কই পণ্ডিত মশাই।

—না বাবা। চলো গরীবের বাড়ি। কমলাও তোমার কথা বলে।

নটবর চলেছে বসন্তের সঙ্গে।

বসন্ত কথাটা বলে—বাবা। এতকাল যে পড়ালাম, ইস্কুলে প্রাইমারী টিচারের কথা হচ্ছে, যদি আমার কথাটা একটু ভাবো।

হিমগুড়ি রাত নেমেছে। বাতাসে ভেসে আসে সমুদ্রের গর্জনের শব্দ।

নটবর দেখছে কমলাকে। কমলা চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। বসন্ত বলে—নটবর এলো। কথাবার্তা বল। তুইও বাড়িতে পড়ে শুনে পরীক্ষা দে। নটবর না হয় দেখিয়ে দেবে দু'একদিন এসে।

কমলা বাবার দিকে চাইল।

নটবরকে চেনে কমলা। দেখেছে এর আগে দলবেঁধে সাধারণ মানুষের জন্য আন্দোলন করতে, আর সুযোগ বুঝেই দলমত বদলে আজ মহেশ মান্নার দলে মিশে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে।

নটবর বলে—আজ চলি।

বসন্ত হাঁক পাড়ে—কই গো, নটবর যাচ্ছে, একটু এসো।

বাসিনী এসে দাঁড়ালো। নটবর বের হয়ে আসে। বসন্ত ওকে এগিয়ে দিতে এসে গদগদ কণ্ঠে বলে—তাহলে কথাটা একটু ভেবে দেখো বাবাজী।

এককালে নটবর তার পাঠশালার ছাত্র ছিল। তেমন মেধাবী ছেলেও নয়। তার তুলনায় ঘনশ্যাম লেখাপড়ায় অনেক ভালো ছিল, কিন্তু নটবর তপশিলী সম্প্রদায়ের মানুষ। তাই বিশেষ সুবিধা কিছু পেয়েছিল আর সেটাকে গ্রহণ করেছিল নটবর। সুযোগ নিতে সে প্রথম থেকেই শিখেছে।

শান্ত গাং—স্তিমিত আলোয় ঘুম-নামা গঞ্জের দিকে চেয়ে দেখছে নটবর। আজ সে দেখেছে মহেশ মান্নাকে খুশী রেখে সেও এগিয়ে যেতে পারবে। তারপর এই আন্দোলন, রাজনীতির দিকটাকে বজায় রাখতে পারলে এই দ্বীপ থেকেই সে দাঁড়াবে ভোটে, মহেশ মান্না তাকে মদত দেবেই। আর মহেশকেও ছাড়িয়ে উঠবে সে। একটা জলায় অনেকগুলো কুমীরই ঢুকে গেছে অযোধ্যা প্রসাদের ভাষায়। সেই কুমীরগুলো একদিন গুঁতোগুতি করবেই।

নৌকা দু একটা ভেসে চলেছে গাং-এর বুকে, ওদের মিটি মিটি আলোর আভা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যায়। ঘাটের লোকজন আসা বন্ধ হয়েছে। রাত্রি নামে। খেয়াপারাপার এখন বন্ধ।

সকালে ভুবন মাইতি ঘাটে এসে বসেছে। অঘোর সরকার কালও ফেরেনি। ঘনশ্যাম গেছে গাং-এ লঞ্চ নিয়ে জেলেদের সঙ্গে। ফিরতে দেরী হবে। মাছ ধরে এখন ওরা কাকদ্বীপে মোহান্তের আড়তে যাচ্ছে।

একাই বসে আছে ভুবন। ক'দিন ধরে শরীরটা ভালো নেই। কাল রাতেও জ্বর এসেছিল। সকালে গিরিবালা বলে—দুর্বল শরীরে যেও না দাদা।

ভুবনের মন মানে না। দীর্ঘ পঁচিশ বছরেরও বেশি সে এই ঘাটে এসে বসছে। দ্বীপের জীবনে বহু মানুষ এসেছে—কেউ ফিরে গেছে এই পারঘাটা দিয়ে। অনেকে হারিয়ে গেছে। এ যেন জীবনের আনাগোনার মতই। একদিন মানুষ শেষ খেয়া পার হয়ে ফেরার হয়ে যায়। আর ফেরে না।

তার জীবনের খেয়াও হয়তো একদিন থেমে যাবে।

বোনের কথায় বলে ভুবন—ঘরে বসে মন খারাপ করে রে। গাং-এর ধারে বসলে তবু মনটা ভালো থাকে।

গিরিবালা বলে—চাদর মাফলার নে যাও। তোমার ওই কত্তা।

ভুবন পারঘাটে এসে বসেছে। সকালের কুয়াশা মুছে মুছে

গাং-এর বুক থেকে। আশপাশে দেখা যায় দু-দশটা নৌকা। খেয়ায় যাত্রীরা পার হয়ে শহরে চলেছে। সকলের প্রশান্তির মাঝে ছোঁ মেরে গাং-এর জলে মাছ ধরছে গাংচিলগুলো। গঞ্জের চায়ের দোকানের উনুনে আঁচ পড়েছে। ধোঁয়াগুলো বাতাসের ঝাপটায় এলোমেলো হয়ে যায়, ভুবনের মনের ভাবনাগুলোর মতই। হঠাৎ মহেশ মান্নার পানসিটাকে আসতে দেখে চাইল।

ঘাটের জেটিতেই এসে ভিড়েছে মহেশের পানসি। ঘাটের গহনার নৌকার মাঝি হেঁকে ওঠে— পানসি তফাৎএ বাঁধো। এ মাঝি।

মাঝির কথার আগেই মহেশ ভরাটি গলায় বলে—ঘাটের জেটিতে ভেড়া।

মহেশের কথায় ভুবন চাইল চালার নীচে থেকে। মহেশ ঘাটের জেটিতে নেমেছে, গজেনও রয়েছে। বলে সে—গজা, পানসি ওদিকেই রাখতে বল।

ভেড়িতে নেমেছে।

নরহরি সকালে এই সময় ঘাটের চালায় ভুবন মাইতির গণেশ-এর ঘট পুজো করতে আসে। মাসিক পাঁচ টাকা পায়। অবশ্য সকালে নরহরি গঞ্জের কিছু দোকানের গণেশ বাবাজীদের আতপ চাল ছিটিয়ে যায় পাইকেরী হারে। নগদ কিছু মেলে। এসময় নরহরি স্বয়ং মহেশ মান্নাকে দেখে ওই অবস্থাতেই এগিয়ে আসে—কত্তাবাবু। প্রাতঃ পেন্নাম।

মহেশ ওকে দেখে বলে—ভালোই হলো। একটু বাড়িতে এসো। কথা আছে। চলরে গজেন—ওদের খবর দিয়ে যাই। মধু বায়েনকে আসতে বলবি। একটা তোড়জোড় পড়ে যায় গঞ্জে।

ভুবন মাইতি চুপ করে বসে আছে ঘাটে। বেলা বেড়ে উঠেছে, অঘোরের তখনও দেখা নেই। ভুবন বলে সর্দার মাঝিকে—তোরা ছাখ, আমি বাড়ি যাচ্ছি। অঘোর এলে দেখা করতে বলবি।

ভুবন মাইতির বোধহয় আবার জ্বর আসছে। মুখটা বিস্বাদ লাগে। রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে সে। হঠাৎ অঘোর সরকারকে ঝড়ো কাকের মত ঢুকতে দেখে চাইল ভুবন। একরাতেই লোকটার দেহমনের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে—কি হল অঘোর? ডাক কবে হচ্ছে ঘাটের?

অঘোর সরকার আর্তনাদ করে ওঠে—সর্বনাশ হয়ে গেছে কত্তাবাবু।

ভুবন চাইল ওর দিকে স্তব্ধ চাহনি মেলে। অঘোর বলে ঘাটের ইজারা ডাকের নোটিশ চেপে রেখেছিল ওই মহেশ মান্না পয়সা খাইয়ে। আমাদের কাছে সে নোটিশ পৌঁছেনি। ঘাট-এর ডাক তলে তলে ওই মহেশই ডেকে নিয়েছে। ঘাট এখন আর আমাদের নাই—ঘাট ওর।

—এঁ্যা। ভুবনের মুখের শেষ রক্ত বিন্দুটুকুও যেন মুছে গেছে। অস্ফুট

স্বরে বলে ভুবন—সিকি। কোর্টে নালিশ করে এসেছো?

অঘোর বলে—আপত্তি দিয়ে এসেছি বাবু। কিন্তু এখন ওর হাতেই ঘাট থাকবে। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি।

এই ঘাট নিয়ে দীর্ঘ পঁচিশবছর এখানে রয়েছে ভুবন। লোকে জানে ভুবন মাইতির ঘাট। ধবলাটের পঞ্চাশ বিঘে জমি দখল করে নিয়েছিল মহেশ, সেদিনও ভয় পায়নি ভুবন। আজ মনে হয় মহেশ তার জীবনের শেষ অবলম্বনটুকুকেই কেড়ে নিয়েছে—তা হয় না অঘোর। ঘাটের দখল আমি দেব না। প্রাণ থাকতে দেব না। লাফ দিয়ে ওঠে জীর্ণ দেহ নিয়ে ভুবন মাইতি। কোনে রাখা লাঠিটা নিয়ে বৃদ্ধ এগিয়ে চলে জরাজীর্ণ দেহটাকে টানতে টানতে।

গিরিবালা চীৎকার করে—দাদা। যেও না দাদা। থামেনা ভুবন। গিরিবালা বলে ওঠে—ওকে যেতে দিও না সরকার মশাই।

অঘোর সরকার চলেছে—মাইতি কত্তা! শোনেন—শোনে না সে। শোনার সময় নেই। ভুবন মাইতি ভেড়ির উপর দিয়ে পারঘাটের দিকে চলেছে। অসহায় রাগে কাঁপছে তার সারা দেহ।

মহেশ মান্নার এই দিগ্বিজয়ের খবর এর মধ্যে সারা গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। মাইতি মশায়ের নাম মুছে দিয়ে এবার সাগর দ্বীপের পারঘাট-এর দখল নিয়েছে মহেশ মান্না।

মধু বায়েন তার ভাইপো আর ছেলেকে নিয়ে এসেছে। ঢাক-কাঁসি আর সানাই বাজছে। নরহরি ভটচায এর মধ্যে পেয়ে গেছে নোতুন পট্টবস্ত্র। তাই পরে পাথর বাটিতে লালশালু ঢাকা দিয়ে নারায়ণ শিলা নিয়ে এসেছে। মহেশ মান্নার ঘাট এর পুজো করতে। বসন্ত পণ্ডিতও এসে পড়েছে। আজ সকালের সব ভাবনাগুলো মুছে গেছে তার মন থেকে। নোতুন ঘাট কিনেছে মহেশ মান্না। এখানের খাতা-সরকারি পদই পেয়েছে সে। স্নান করে ধুতি ফতুয়া পরে এসেছে বসন্ত। নোতুন দোয়াত কলম—লাল খেরোর খাতা ঝুলিয়ে, আর গুপীনাথের মাথায় নোতুন ক্যাসবাক্স। এর মধ্যে ঘাটের রূপ বদলে গেছে। গাঁদা ফুল—পাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে চালাটা। নোনা মাটিতে আমগাছ হয় না। তাই সহর থেকে আমপল্লবও আনা হয়েছে। ভুবন মাইতির গদির উপর ছেঁড়া চাদরখানা টেনে ফেলে সেখানে নোতুন চাদরের উপর গালচে পাতা হয়েছে। আর ভেড়ির উপর নবা বাঁশের সঙ্গে ঝোলানো সাইন বোর্ডটা দেখে মহেশ বলে—ওটা ফেলে দিয়ে নোতুন সাইন বোর্ড লাগা গজেন।

বিজয়োৎসব করছে সে। আজ জব্বর ঘা দিতে পেরেছে মহেশ। এ বেলাতে পুজো আচ্চা দিয়ে দু'একদিনের মধ্যেই একটা ভোজ দেবে সন্ধ্যায়। ভোজ ঠিক নয়—সহরের পার্টির মত। মাঝে মাঝে থানার কর্তাদের, বিডিও অপিস—ফরেস্টের বাবুদের, মায় সহরের পেশকার দু একজন খুদে মাতব্বর, কর্তাদেরও আনে।

মহেশ বলে—আজ রাতেই ওদিকে কুঞ্জবনে ফিষ্টির ব্যবস্থা করেছি গজেন। ব্লক অপিস—থানা—সদরের দু-চারজন আসবেন।

গজেন জানে এসব ব্যাপার। বলে সে—সে সব ব্যবস্থা করেছি। নটবর মাষ্টারকে পাঠিয়েছে নেমতন্ন করতি। এ নিয়ে ভাবনা করতে হবে না।

বর্ষার রোখ তখনও যায় নি। ভাদ্রের শেষ। দখিনা বাতাস আর কাল মেঘে ছায়া নেমেছে। রোদের তাতও বেড়েছে। সবুজ মাঠ— নদী যেন তেতে উঠেছে সেই রোদে। ঘটা করে পুজো হচ্ছে।

ওই রোদের তাপে জীর্ণ শরীর নিয়ে এগিয়ে এসে ব্যাপারটা দেখে দাঁড়ালো ভুবন। সাদা চুলগুলো উড়ছে, দুটো চোখ-এর চাহনি লালচে। গর্জে ওঠে ভুবন —কি হচ্ছে এসব মহেশ।

মহেশ চাইল ওর দিকে। বলে সে—এ ঘাট-এর ইজারা আমি নিইছি।

ভুবন মাইতি দেখছে লোকগুলোকে। ওই নরহরি, বসন্ত পণ্ডিত, মাধব নস্করদের সেইই অতীতে এনে ঠাঁই দিয়েছিল। জমি দিয়েছিল। সেদিন বাদাবন কেটে এই গঞ্জ, এই ঘাটের প্রতিষ্ঠা করেছিল সে। আজ ওই মানুষ-গুলো সব ভুলে গিয়ে মহেশ মান্নার পায়ের তলে লুটিয়েছে। সে আজ একা—নিঃসঙ্গ। ভুবন গর্জে ওঠে—না। এ ডাক মানি না এ ঘাট আমার--

মহেশ বলে—কোর্ট কাছারি আছে সেখানে যান। এখানে মিছে ঝামেলা করবেন না। কইরে—লাগা সাইন বোর্ট।

গজেন নোতুন সাইন বোর্ডটা লাগাচ্ছে। এতকালের জীর্ণ পরিচিত সাইন-বোর্ডটায় লেখা আছে ইজারাদার—ভুবন মাইতি।

সেটা খুলে জীর্ণ টিনটা ফেলতে যাবে। বাধা দেয় ভুবন, খবরদার গজেন ভালো হবেনা। আমার ঘাট—ওটা থাকবে। না—খুলবিনা।

বৃদ্ধ সর্বশক্তি দিয়ে ওই অস্তিত্বটুকুকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। নড়বেনা সে। মহেশ গর্জে ওঠে—ওকে সরিয়ে দে—হঠিয়ে দে গজেন। হঠা বুড়োকে —গজেনও এক ধাক্কা মেরেছে ভুবন মাইতিকে। ভুবন এতক্ষণ যেন কি একটা ঘোরের মধ্যে ছিল, এ শক্তি উত্তেজনা তার জীবনীশক্তির শেষ বিন্দুকে যেন আচ্ছন্ন করেছিল। অতর্কিতে ধাক্কা মারতে ভুবন মাইতির ঘাড়েই

সাইনবোর্ডটা পড়েছে। আর ভুবন মাইতির জ্ঞানহীন দেহটা ছিটকে উঁচু ভেড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ছে নীচের শক্ত জমির উপর।

অঘোর সরকারের পিছু পিছু কমলাও আসছিল। ওবাড়িতে ঢুকতে গিয়ে সে দেখেছিল মাইতিকাকাকে ওই ভাবে বের হয়ে আসতে। গিরিবালার চিৎকারে কমলাও এসেছে। সে ভুবন মাইতিকে ওইভাবে গড়িয়ে পড়তে দেখে চিৎকার করে নীচের দিকে দৌড়ে গিয়ে ওর জ্ঞানহীন দেহটাকে ধরে ফেলে। ডাকছে তাকে—কাকাবাবু!

কিন্তু ভুবন মাইতির জ্ঞান নেই। অঘোর আর্তনাদ করে—একি সব্বোনাশ হল।

কমলা বলে—একটু জল।

জলের জায়গাও নেই। ভেড়ির উপর নরহরি, বসন্ত পণ্ডিত আরও অনেকে এসে দাঁড়িয়েছিল। মহেশ মান্না বলে—ওরে গজেন, একটু খাবার জল থাকেতো দে। এসময় মুখে জল দিতি হয়। আহা!

কমলা কথাটা শুনে চাইল। বলে সে—সব তো কেড়ে নিয়েছেন মান্নাবাবু, ওদের জমি—পারঘাটা সব। এবার ওর প্রাণটুকুও নিতে চান!

মহেশ মান্না থতমত খেয়ে সেটা সামলে নিয়ে কি বলতে যায়। তার আগেই বসন্ত পণ্ডিত ব্যাপারটা দেখে চটে উঠেছে। কমলাকে এভাবে এখানে এসে ভুবন মাইতির হয়ে কথা বলতে দেখে ধমকে ওঠে—থামবি তুই? এখানে তুই কেন এসেছিস? উঠে আয়। উঠে আয় বলছি। ও পড়ে থাক ওখানে।

কমলা বাবার দিকে চাইল। উৎসবের সাজে সেজে এসেছে ওরা। কমলা বলে ওঠে—ছিঃ বাবা। নিজেকে বিক্রী করেছো—মায় বিবেক ধর্ম সব বেচেছো, তাই বলে আমাকে ওটা হারাতে বলো না। আমি সে কথা শুনবো না।

বসন্ত গর্জে ওঠে—কমলা!

মহেশ মান্না বলে—আঃ যেতে দাও পণ্ডিত। এত বিদ্বান মানুষ হয়ে এত ছোট মন কেন? মানুষের বিপদে সেবা দয়া করাই তো মানুষের ধর্ম। কমলাকে সেটা করতে দাও। চলো—ওহে মদন, তোমরা বাপু মাইতি মশায়কে ওর বাড়িতে দিয়ে এসো। যাও কমলা—ওরা দিয়ে আসছে। হ্যাঁ—সাবধানে নিয়ে যেও। পরক্ষণেই হুকুম দেয়—কইহে নরহরি, পূজোয় বসো। অ মধু—তোদের ঢোল সানাইওকি বোবা মেরে গেল বাবা। বাজা—শুভকাজে ঢোল বাদ্যি যে চাই।

সজোরে ঢোল সানাই কাঁসি আর্তনাদ করে ওঠে।

ওরা পুজোয় বসছে। প্রসাদের লোভে এর মধ্যে বেশ কিছু লোকও জুটেছে।

ভেড়ির ওদিকে মহেশ গজেনকে ডেকে নিয়ে গেছে। মহেশ বলে—তাহলে তুই যা বল্লাম করে আয়। বলবি আমি বলেছি। আর কিছু টাকার দরকার হয় দিবি। নে যা।

গজেন এই ভিড়ের মধ্য থেকে বের হয়ে এগিয়ে যায় গঞ্জের দিকে।

রমণ ডাক্তার এই দ্বীপের মধ্যে একমাত্র ডাক্তার। শীর্ণ লম্বা চেহারা। দুপুরে কয়েকজন রোগী বিদায় করে বসে আছে। ওর ঘোড়াটারও ছুটি, সে কোন ডোবায় নেমে দললতা সংগ্রহ করে নিজেই স্বাবলম্বী হয়ে পেট ভরাবার চেষ্টা করছে। এমন সময় গজেনকে আসতে দেখে চাইল রমণ—

—কিহে গজেনবাবু। কি খবর?

গজেন বিনা খবরে আসে না। গজেন বলে—কত্তাবাবু বললেন ধবলাটের চাষবাড়ি থেকে খবর আসিছে আপনাকে এখুনি যাতি হবে। দু তিন জনের মায় ওখানের যে কাজ দেখে পেথম তারও বিজায় অসুখ। পেটের ব্যামা। আর দুতিন দিন ওখানে থেকে আসতি হবে।

রমন ডাক্তার ওর দিকে চাইল। শুধোয় সে—সেকিহে, দুতিন দিন থাকতি হবে! আজ শোনলাম রাতে জোর খাওয়া হবে এখানে।

গজেন বলে—তা শুনছেন ঠিক কর্তা। কিন্তু আপনার তো থাকা চলবেনি। বল্লে নৌকা রেডি করি ডাক্তারকে তুলিদিই আসবি। সব ঠিক করি এলাম। চলেন এখন। আর বাবু আপনারে পঞ্চাশ ট্যাকা দিয়েলো। লিন্!

পঞ্চাশ টাকা কম নয় রমেণের কাছে। যা পায় তার তুলনায় অনেক। তবু মনে একটা খটকা বাধে তার। শুধোয়—তিন দিন থাকতি হবে কেন? যাতায়াতে কাল লাগাৎ ফেরা যায়।

গজেন বলে—কাল ফেরবেন নি। তাই টাকা দিয়েন, ফেরবেন তিন দিন পর। ঐ নৌকা মাঝি সব্বাই ওখানে থাকবে। চলেন তো।

রমন ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। তবু মনে হয় এটার কোন কারণ আছে। সেও বাধ্য হয়েই এই নির্দেশ মেনে নেয়। জানে প্রতিবাদ করলে তারও বিপদ হবে। বলে সে—চল! তবে ব্যাপার তো বুঝছি না।

গজেন গম্ভীর ভাবে বলে—রোগী দেখতে যেছেন—যান। ইসব বোঝার জন্যি এত হাঁপাহাপি কেনে গো। ট্যাকা তো পেয়েলেন!

অমাবস্যায় জোয়ার বর্ষার গাং খাড়ির রূপই বদলে যায়। রাতের

অন্ধকারে ঢেউ ফাটছে—অসীম জলের বুকে কে হাজারো তারাফুল ছিটিয়ে দেয়। জাল টানছে ওরা। লঞ্চের সার্চলাইটের আলোয় দেখা যায় ছায়ামূর্তির দল ওই রাতের অন্ধকারে ঝিম ঝিম বৃষ্টির মধ্যে সাগরের ফসল তুলছে। লঞ্চ-এর খোল ভর্ত্তি হয়েছে। ভালো মাছ পড়েছে। নিশাকর সর্দার মাছের বহর দেখে বলে—কি রে অতন, শালো মাছের ঝাক গাং-এ ঢুকিছে মনে লয়।

ঝুড়িবন্দী ইলিশ, পমফ্রেট মাছ তুলেছে তারা। ওপাশ দিয়ে একঝাক ভেটকি জলে চাওলা করে জাল ছাড়িয়ে লাফ দিয়ে পালাচ্ছে। ফাকর বেশাল ঘিরেছে। হেঁকে ওঠে—সামলাবি!

জাল গোটাচ্ছে তারা। নিশাকর বলে—এত মাছের চাউর, ক্যামন লাগতিছে রে।

ঘনশ্যাম বলে—তোল মাছ, ভোর ভোর যাই কাকদ্বীপে। ভালোই হয়েছে যাত্রা তোদের।

লঞ্চের একটানা ভট ভট শব্দ ওঠে স্তব্ধ গাং-এর বুকে। ভোরের আলো ফুটছে, মেঘ ভাঙ্গা আলো। গাং-এর বিস্তীর্ণ বুকে তখনও বর্ষার মাতন আছে ফুসছে ঢেউগুলো।

হঠাৎ নিশাকর চীৎকার করে ওঠে—ছোটবাবু গো। ওই সে বাঁহাতি গ্যাখদিনি—

দেখেছে রতনও। সে চীৎকার করে—ও খুড়ো! ই শালো কত্থিকে এয়েলো গো—জলের বুকে মাথা তুলেছে একটা বিরাট পাথনা, ছোট ডিঙ্গির পালের মত। যেন একটা ভাসমান ডিঙ্গির আকারে লম্বা বস্তুটা জলের উপর জেগে উঠছে।

রতন বলে—কোন শালায় ডিঙ্গি কুড়েছে গো কাকা—লোকগুলানকেও দেখছি না। সব কি শ্যাধ হই গেল! অয় বাপ গো—রতন কথার স্বর থেকে বিষাদের স্বর মুছে ফেলে আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে—হাঙর গো!

ঘনশ্যাম দেখছে জীবটাকে। রতনের চীৎকার ধমকে ওঠে—চুপ কর।

হাঙরটাও খেয়াল করেনি প্রথমে। এরা স্রোতের নিচের দিকে রয়েছে। তাছাড়া সে তখন শিকারে ব্যস্ত। এক ঝাক ভেটকির সন্ধান পেয়ে তাদের পিছনে চলেছে, বিশাল দেহটা মুক্ত গাং-এর বুকে নিশ্চিন্তে ভাসিয়ে তুলেছে। নীলচে গা—উন্নত পিঠের রেখাটা চ্যাপ্টা মাথা থেকে ল্যাজের শেষ অবধি সুগঠিত। প্রায় পঁচিশ ফিট লম্বায়, যেন একটা আড়াইশো মনি ডিঙ্গি উলটে গিয়ে ভাসছে। গায়ে নীল শেওলা জমেছে, মাঝে মাঝে সাদাটে দাগ, একবার চিতেন দিয়ে ওর বিশাল মুখ বের করে একটা মাছকে চালান করে

দিল। এক ছলক রূপালী আভা ঠিকরে ওঠে নীল জলে। ওর মুখখানাও তেমনি—একসঙ্গে দুটো মানুষ ঢুকে যেতে পারে আর সেই গহ্বরের ভিতর সকালের আলোয় চিক চিক করে ধারালো দাঁতের পাটি। চোখ দুটো হঠাৎ স্থির হয়ে যায় তার। নীল কপালের দুপাশে লাল বগিথালা দুখানা যেন বসানো।

ঘনশ্যাম দেখছে ওটাকে। চীৎকার করে—ইঞ্জিনে ফুলস্পিড দে। টং টং করে তিনটে ঘণ্টা বেজে ওঠে। পটলা ইঞ্জিনটাকে ফুলস্পিডে তুলেছে।

নিশাকর বলে—করছো কি ছুটবাবু! এখন ওটাকে ঘা মেরোনা। সাথে মাল—এত ডিঙি রয়েছে।

ঘনশ্যাম সেটা বুঝে নিয়েই বলে—পরে দেখবো ওটাকে। কিন্তু ব্যাটা সমুদ্র থেকে খাড়িতে এসেছে, উৎপাত না করে সর্দার।

এমন উপদ্রব হয়েছে মাঝে মাঝে। ঘনশ্যামই তিনটে হাঙর মেরেছে আগে। তারাও এই গাং-এ উপদ্রব সুরু করেছিল। মনে হয় নোতুন আর একটা হিংস্র হাঙরই এসেছে।

নিশাকর বলে—এটা বাঘা হাঙর গো—

ওরা সরে আসছে তীরের দিকে। দূরে দেখা যায় গ্রামসীমা, হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে নিশাকর, একটা বাছাড়ি নৌকা কিছু মাছ নিয়ে এগিয়ে আসছে মাঝ গাং দিয়ে, হঠাৎ ওই হাঙরটা জল মাথায় করে ছুটে গিয়ে ডিঙিটার পেটেই লেজের ঝাপটা দিয়েছে। শূন্যে ছিটকে ওঠে ডিঙিটা, অতর্কিত আঘাতে একজন মাঝিও শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়। চীৎকার করছে সে।

হাঙরটা ওই অবস্থাতেই তাকে ধরে নিয়ে তলিয়ে গেল। অন্য দুজন জেলে জলে পড়ে হাবু ডুবু খাচ্ছে।

—ছোটবাবু!

লঞ্চটা একটা মোড় নিয়ে এগিয়ে যায় ওইখানে। মটরা, রতন লাইফ বেল্ট দুটো ছুড়ে দিয়েছে জলে ভাসছে গোলাকার লাল সাদা দাগ মারা বেল্ট দুটো।

নিশাকর বলে—ওঠ। ধরে ওঠ ডিঙি থেকে টেনে তোলে তাদের। ভয়ে বিবর্ণ লোকদুটো কঁকিয়ে ওঠে—খেয়ে ফেলাতে গো ছোটবাবু। সঙ্গীন একটা দৈত্যি গ—পেল্লায় হাঙর।

সঙ্গে এত মাছ রয়েছে! তাড়াতাড়ি গঞ্জে যেতে হবে। এমানতেই দেরী হয়ে গেছে। একটা লোকের মাথাও কেটেছে। হাঙরটার ঝাপটায় নৌকার হালে মাথা ঠুকে গেছে। জীর্ণ ডিঙিখানা ওই ঝাপটায় ভেঙে তলিয়ে গেছে।

ফিরছে ওরা আড়তে। কাকদ্বীপেও খবরটা ছড়িতে পড়েছে। ঘনশ্যামের আগে আরও দুতিনটে মেলার দল দেখেছে হাঙরটাকে। ওরা বলে—আবার গাং-এ যম আসিছে কত্তা। কুন পেকারে বাঁচি এসেছি। কি হবে কে জানে।

আড়তে ওই নিয়েই আলোচনা চলেছে। ভীত ত্রস্তভাব জেলেদের মধ্যে। এমন সময় ঘনশ্যামের লঞ্চ থেকে ওই আহত লোকটাকে নামতে দেখে এগিয়ে আসে সকলে। অন্যজন তখনও সঙ্গীর শোকে কাঁদছে। এবার সে ভেঙে পড়ে। কান্না ভেজা স্বরে বলে লোকটা—পাতুকে ব্যাটা যম তুলে নে গেল বাবু। ডিঙিখান চুরমার কার দেরেলো এক ঝাপটায়—আসমানে নাপিয়ে উঠে ধরে নেল পাতুকে।

হাঙরটা এবার যে উৎপাত সুরু করবে এই গাং-এ তা অনুমান করে অনেকেই। ঘনশ্যাম চুপ করে গেছে। তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে সেই অসহায় অন্তিম আর্তনাদ, বিশাল হাঙরটার ছবিটাই মনে পড়ে তার।

নিশাকর বলে—ইটা বাঘা হাঙর গো। মানুষের স্বাদ পাইছে ছাখো পেল্লায় কাণ্ড না বাধায়।

মদন মোহান্ত, কালো শশী নস্কর—ভূতনাথ কয়ালরা এখানের বনেদী আড়তদারও। তারাও জানে এমনি হাঙরের আতঙ্ক ছড়ালে তাদের কারবারও মন্দা হয়ে যাবে। প্রাণের ভয়ে জেলেরাও গাং-এ যাবেনা। আর স্থানীয় মানুষদের আনাগোনা ওই জলপথেই। তাও সীমিত হয়ে যাবে।

মদন বলে—ক্যামন দেখলে ঘনাবাবু, ওটাকে কায়দা করা যাবে?

ঘনশ্যাম দেখেছে হাঙরটাকে। এর আগে যে ক'টা হাঙর মেরেছে এটা তার থেকেও বড়। আর এটা যেন তেড়ে গিয়ে শিকার করে। হিংস্র।

ঘনশ্যাম বলে—কি করে দেখা যাক এটা। চরার পথটাকে দেখতি হবে। এক গাং-এ থাকে না—ঘুরি বেড়ায় তা জানা দরকার। এমনি এসে গেছে আবার ফিরে যাবে দরিয়ায়।

—নাহলে? কে প্রশ্ন করে।

ঘনশ্যাম বলে—না গেলে বিপদের কথা। তখন মারার চেষ্টাই করতি হবে। তবে তার তোড়জোড় চাই মোহান্ত, এমনি এটাকে কায়দা করা যাবে না। এটা বিরাট বড়—

সকলেই ভাবনায় পড়ে। আর হাঙরের নাম শুনেই মহাজনরা এর মধ্যেই মাছের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

মদন বলে—যা বিপদ এসতিছে তাতে দাম না পেলে কেউ গাং-এ যাবে না বাবু। দর বাড়াতি হবে।

বৈকালের আগেই ঘনশ্যাম ফিরছে। সেই ঘটনার পর থেকেই কথাটা ভাবছে ঘনশ্যাম। হাঙ্গরগুলোর চরিত্র সম্বন্ধে তার নিজের কিছু ধারণা আছে। নিশাকরও প্রবীণ জেলে। কত্তাদের কাছে শুনেছে অনেক কথা।

চুপ করে বসে আছে ওরা লঞ্চে। আজ মাছের দাম পেয়েছে দেড়া। বেশ লাভ করেছে ওরা। তবু মনে ফুর্তি নাই। ওই বিশাল গাং-এ কোথায় ওৎ পেতে আছে হিংস্র একটা দানব, যার আবির্ভাব জেলেদের শান্ত জীবনে এনেছে বিপদ আর বিপর্যয়ই।

—কোন দিকে চল্লা গো!

নিশাকর শুধোয় ঘনশ্যামকে। তারা সোজা পারমুখো যাচ্ছে না।

ঘনশ্যাম বলে—একটু দেখি সর্দার সেই ব্যাটা যদি চোখে পড়ে। ওই নীচের গাং-এ হানা দিয়েছিল। কে জানে ওদিকেই আছে বোধ হয়।

লঞ্চটা ছুটে চলেছে।

ভাদরের শেষ, তখনও আকাশের চেহারা ভালো না। কালো মেঘের দল গাং-এর বিস্তারে ছড়িয়ে আছে, জলে পড়েছে মেঘের ছায়া, ফেপে উঠছে, ফুঁসছে নদী। লঞ্চটাও দুলছে।

বিশাল গাং-এ ওর সন্ধান করা কঠিন। কে জানে কোথায় তলিয়ে আছে সে নীচের অতলে। হাঙ্গরটার কোন চিহ্নই নেই। জোয়ারের জলে চোখে পড়ে ভাঙ্গা নৌকার পাটাতন—হালের বাঁশ। ওগুলো ভাটিতে কিছু নেমে গিয়ে আবার জোয়ারের টানে দিশাহারার মত কোন করুণ কাহিনীর স্মৃতি হয়ে ভেসে চলেছে।

সন্ধ্যা নামছে। মেঘগুলো ঘনতর হতে থাকে। নিশাকর বলে—ছোটবাবু ঘরে ফেরা যাক। গাং-এর গতিক সুবিধের নয়। তাছাড়া কোথায় খুঁজবা তাকে।

হয়তো সত্যি!

ঘনশ্যাম-এর সামনে ওই লোকটাকে মেরে ডিঙ্গি ভেঙ্গে দিয়ে হাঙ্গরটা যেন ঘনশ্যামকে চ্যালেঞ্জ করে গেছে। ঘনশ্যাম বলে—ঠিক আছে। চলো। তবে ও শালাকে আমি ছাড়বো না সর্দার! ও একদিন ঘনার হাতেই নিকেশ হবে।

আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ জমেছে। ঢেউগুলো মুখর হয়ে ওঠে। ওরা ফিরছে গঞ্জের দিকে

ঝিম ঝিম বৃষ্টি সুরু হয়েছে। দূরে দেখা যায় গঞ্জের বাতিগুলো। বিশাল গাং—ওদিকে মুক্ত সমুদ্র, তার মাঝে একটি বিন্দুর মত এই দ্বীপের অস্তিত্ব,

ভীরু আলোগুলো কাঁপছে।

ঝাপটা আসে, মুখে গায়ে বৃষ্টির হিম হিম ঝাট লাগে।

লঞ্চটা এসে ভিড়েছে অন্য দিনের মত পারঘাটের জেটিতে, ব্যাক করে লঞ্চটা ভেড়াতে যাবে, পার থেকে কঠিন স্বরে কে হাঁক দেয়। —লঞ্চ এঘাটে ভিড়বে না। ওদিকে নে যাও।

ভাটির গাং, পলিকাদা বের হয়েছে, এ সময় নীচে নামা মুস্কিল। ঘনশ্যাম ওই হাঁক ডাকে কান না দিয়ে লঞ্চটা এগিয়ে আসছে। ওদিকে পানসি থেকে নামছে কারা। লঞ্চের ঢেউ-এ পানসিটা দুলে ওঠে। কে হাঁক পাড়ে।

— লঞ্চ হটাও।

ক্লান্ত ঘনশ্যাম এবার গর্জে ওঠে—তোর বাপের ঘাট রে? মটরা—গেরাপি কর।

লাফ দিয়ে ঘাটে নেমেছে ঘনশ্যাম, হঠাৎ একটু চমকে ওঠে। আজ হেসাক জ্বলছে ঘাটে, মালা ফুল পাতা দিয়ে গেট সাজানো হয়েছে, ওদিকে নোতুন সাইনবোর্ডটার উপর চোখ পড়তেই চমকে ওঠে। তাদের পুরানো সাইনবোর্ডটা নেই, ওদিকে দুমড়ে পড়ে আছে তার বাবার নাম লেখা বোর্ডটা। এখন সাইনবোর্ড-এ উঠেছে মহেশ মান্নার নাম।

ঘাটে তার বাবা—সরকার মশাই কেউ নেই। ঘাটের মাচানের উপর নোতুন ফরাস পেতে বসে আছে বসন্ত পণ্ডিত, নরহরি, নটবর মাষ্টার আরও ক'জন। গজেনকে দেখে চাইল।

গজেন বলে—এ ঘাটের মালিক এখন মান্নামশাই। কালই ইজারা ডাকে আমরা ডেকেছি।

স্তব্ধ হয়ে গেছে ঘনশ্যাম। এত শীঘ্রি এমনিভাবে অতর্কিতে আঘাত হানবে ওই মহেশ মান্না তা ভাবেনি ঘনশ্যাম। বাবা কি করেছে কে জানে—ঘনশ্যাম এগিয়ে যায় বাড়ির দিকে।

হঠাৎ পিছনে নরহরি ভটচাযের হাসির থ্যাক্ থ্যাক্শব্দ শুনে চাইল ওর দিকে কঠিন চাহনিতে, লোকগুলোকে চিনছে ঘনশ্যামকে ওইভাবে চাইতে দেখে তৎক্ষণাৎ হাসি থামিয়ে দিয়েছে নরহরি, যেন কেউ অদৃশ্য হাতে তার গলা টিপে ধরেছে।

ঘনশ্যাম বর্জায়—কুত্তার দল।

গজেন হাঁক পাড়ে—মটরা। লঞ্চ হঠা!

ঘনশ্যাম তখন ছুটছে বাড়ির দিকে। বৃষ্টি নেমেছে। পিছল হয়ে গেছে ভেড়ির পথ। ঘনশ্যাম-এর মনে ঝড় উঠেছে। দৌড়চ্ছে।

অঘোর সরকার বিপদে পড়েছে।

ভুবন মাইতির জ্ঞান ফেরেনি অনেকক্ষণই। গিরিবালা কাঁদছে। কমলাও যেতে পারেনি এই অবস্থায় ভুবনকাকাকে ফেলে রেখে। আজ সেও দেখেছে ওই মহেশ মান্নার নিষ্ঠুর ব্যবহার। নির্মম আঘাত হেনেছে সে। সব কেড়ে নিয়েছে ভুবন মাইতির।

সে অনেকের জন্য অনেক কিছু করেছে, কিন্তু আজ কেউ ওর পাশে নেই। সরে গেছে সবাই।

ঘনশ্যামও এখনও ফেরেনি। গিরিবালা বলে—ওই এক ছেলে হয়েছে বাছা। কারোও জন্য যদি কিছু দরদ থাকে। ওকি নেশায় গাং-এ ফেরে। ওখানেই একদিন বেঁচেছে—আবার ওখানেই কোন দিন হারিয়ে যাবে।

কমলা চাইল ওর কথায়। শুধোয় সে—গাং-এ কোন দিন তো ডোবেনি ঘনাদা।

চমকে ওঠে গিরিবালা চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের মেলা ফেরং নৌকা ডুবির পর চরভূমিতে পড়ে-থাকা ছোট ছেলেটার কথা।

ঘনশ্যামকে সেদিন মা গঙ্গার বুক থেকেই তুলে এনেছিল ভুবন। তার পরে তার ছেলে হয়েই রয়ে গেছে। এই তার বর্তমান পরিচয়। অতীতে সেই ঘটনাটা যেন অজানাতেই আজ বলে ফেলেছে কমলাকে গিরিবালা। কমলা দেখছে ওকে।

পরক্ষণেই গিরিবালা সামলে নেয়।

বিপদ হতে কতক্ষণ। এদিকে এত কাণ্ড—তার ফেরার নাম নাই কোথা আছে সে।

কমলা চুপ করে কথাটা শুনছে। বলে সে—ওকথা এখন থাক পিসি। অঘোর কাকা গেছে ডাক্তার ডাকতে?

গিরিবালা জানায়—হ্যাঁ মা। কি যে করবেন মা গঙ্গা, কে জানে? অঘোরও ফিরেছে শূন্য হাতে।

কমলা শুধোয়—ডাক্তার কই কাকা?

অঘোর বলে—সে নেই মা। মহেশ মান্নার ধবলাটের চাষবাড়িতে কার অসুখ, সে দুপুরের গোনেই চলে গেছে। ফিরবে তিন চার দিন পর।

চমকে ওঠে কমলা।—কি হবে সরকার কাকা?

অঘোর আরও কিছু খবর এনেছে। আজ সেও যেন ওই লোকটার ব্যবহারে জ্বলে উঠেছে। বলে সে—ওই মহেশমান্নারই এসব বদমাইশি মা,

নাহলে আজই ডাক্তারকে ওই ঘটনার পরই সরিয়ে দেবে কেন?

সব নিয়েছে, এবার মাইতি কত্তার প্রাণটুকু নিয়েই খুশি হবে সে।

কমলা কি ভাবছে। বলে সে—একবার ভূষণ কবরেজকেই ডাকুন। শুধু চিকিৎসার নামটা হোক। কোথায় যে যায় ঘনাদা?

ভূষণ কবরেজই এখানের শেষ আশ্রয়। অতীতে সেই ছিল এখানে চিকিৎসক আজ বুড়ো হয়েছে—তার কবরেজীরও ডাক নেই। এখন ভুবন মাইতির সেই যেন শেষ ভরসা।

গিরিবালা বলে—তাই ডেকে আনো অঘোরদা। লোকটাকে একটু দেখুক। এভাবে বেঘোরে মারা যাবে! বেইমান—সবাই এখানে বেইমান গো!

ভূষণ কবরেজ চোখেও তেমন দেখে না। বাড়িতেই থাকে। তবু অঘোরের মুখে ভুবন মাইতির অসুখের খবর শুনে এসেছে। সেও অবাক হয় —রমণ ডাক্তারকে সব জেনে শুনে সরিয়ে দিল মহেশ। আর রমণই বা গেল কি করে ডাক্তার হয়ে।

অঘোর বলে—হয়তো সব কথা জানায় নি ওকে।

হতে পারে। বুড়ো এখনও মানুষের বোধ হয় একটা বিশ্বাস করতে পারে না যে—একজন ডাক্তার এভাবে এড়িয়ে যাবে চিকিৎসা করতে।

ভুবন মাইতির চেতনা ফিরছে। অস্ফুট কণ্ঠে শুধোয়—ঘনশ্যাম, এলি বাবা!

আবছা কানে ভেসে আসে নদীর শব্দ, কাদের কথাবার্তার টুকরো।

ঘনশ্যাম তখনও ফেরেনি। কমলার মুখখানা ভেসে ওঠে।

—কাকাবাবু! ক্যামন আছো?

অঘোর কবরেজ নাড়ি দেখছে। ভুবনও ওকে চিনতে পারে। বলে সে—কি দেখছো ভূষণ, ডাক শুনতে পাচ্ছো না? ডাক এসেছে।

অঘোর-এর মুখে ভাবনার ছায়া নামে।

তার অভিজ্ঞতায় ভালো ঠেকেনা এটা। নাড়ির গতি অত্যন্ত স্তিমিত। বিলম্বিত—ক্ষীণ। যে কোন মুহূর্তে থেমে যেতে পারে ওইটুকুও। তবু বলে সে—না, না। ওষুধপত্র দিচ্ছি সেরে যাবে।

ভূষণ আর কিছু না বুঝুক তার অভিজ্ঞতায় এটা বুঝেছে যে সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে যে কোন মুহূর্তে। অঘোরকে ডেকে এনে বলে।

—আমার বিশেষ করার কিছু নাই অঘোর। পারো তো কাকদ্বীপে কাউকে পাঠাও ডাক্তার যদি আনতি পারে। আমি ওষুধপত্র দে গেলাম

বাড়াবাড়ি হলে মকরধ্বজ মধু দে মেড়ে খাইয়ো। রাতটা যদি কাটে তখন দেখা যাবে। যদি পারো তবে ডাক্তার আনো সরকার।

অঘোর সরকার ভাবনায় পড়ে।

ঝড়ো হাওয়া উঠছে গাং-এ, এসময় কাউকে নৌকা নিয়ে পাঠানো নিরাপদ নয়।

—কি হবে দিদি।

গিরিবালা ভাবনায় পড়ে। কমলা বলে—দেখে আসি জেলে পাড়ায় কেউ আছে কিনা।

গিরিবালা বলে—সারাদিন আছিস মা, এক ফাঁকে বাড়ি থেকে চান খাওয়া করে আয়।

কমলা বলে—সে তোমাকে ভাবতে হবে না পিসি। দেখি কি করা যায়।

বসন্ত ঘাটে বসে বুঝেছে এখানে পয়সা আমদানী আছে। নৌকা থেকে যাত্রীরা নামার মুখে ওঠার মুখে বেড়ার ফাঁক দিয়ে যাতায়াত করে পয়সা দিয়ে, আর বড় মাটির ভাড়ে সেগুলো ফেলা হয়। মাটির ভাঁড় একটা ভর্তি হয়ে গেলে সেটার মুখ বন্ধ করে আবার অন্য ভাঁড় রাখা হয়। দিনের শেষে মাটির ভাঁড়গুলো খুলে গুনতি করা হয়। তার থেকে দু'এক খাবলা তুলে নেওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। খুশী মনেই বসেছে বসন্ত। কিন্তু আজ কমলার ওই ন্যাকামি আর কথাগুলোতে হাড় পিত্তি জ্বলে। মহেশবাবুর মুখের উপর বলে গেছে কথাগুলো।

লজ্জায় বসন্তের মাথা কাটা যায়।

মহেশ মান্না বিচিত্র ধরণের লোক। রাগলেও তার মুখে ওই রাগের ছাপ পড়ে না। বলিষ্ঠ গোল চাকামত মুখে হাসিই ফুটে ওঠে। মহেশও ভাবছে কমলার কথা। ওই মেয়েটার মুখখানা রাগে টসটসে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। পুরুষ্ট নিটোল দেহের উদ্ধত রেখাগুলো সোচ্চার হয়ে মহেশের মনে কি নতুন আবেগ আনে। চকিতের জন্য মহেশের দৃষ্টিও বদলে গেছে। লোভী একটা মানুষ নতুন কোন সম্পদকে দখল করার কথা ভাবছে।

ভুবন মাইতিকে সে চরম আঘাতই হেনেছে। বাকী এবার বোঝাপড়া হবে তার ওই ঘনশ্যামের সঙ্গে। মহেশ মান্না ভাবছে আগেকার দৃশ্যগুলো। অনেক চেনা অচেনা মেয়ের ভিড় জমে, তাদের সবাইকে ছাপিয়ে জেগে ওঠে রৌদ্রতপ্ত—তেজী চাবুকের মত মেয়েটার দৃপ্ত যৌবন মদির রূপটা। প্রদীপ্ত শিখার জ্যোতি নিয়ে মহেশের মনের আঁধার উল্‌সে দিয়েছে। মনে পড়ে ঘনশ্যামের কথা। কমলা আর ঘনশ্যামকে অনেকদিন দেখেছে নিভৃতে ঝাউবনে,

বালিয়াড়িতে। দুজনে কি স্বপ্নে তন্ময় হয়ে থাকে।

মহেশ মান্না এবার নতুন করে কথাটা ভাবছে। বসন্তের কথায় চাইল মহেশ —ওই মেয়েটার কথায় কিছু মনে করবেন না মান্না মশাই। সত্যি—ও:কে এবার বকে দেব। আর কতো চেষ্টা করছি, বিয়ে থা দেবার। তেমন পাত্র পাচ্ছি না নাহলে কবে ওই আপদ ঘর থেকে দূর করে দিতাম। ছোট বড় জ্ঞান নাই—ছোট মুখে বড় কথা সাজে ?

নরহরি সায় দেয়—তা বাপু মেয়েকে এবার সামলাও। ঘনার সঙ্গে না কেলেঙ্কারী বাধায় কোনদিন।

মহেশ মান্না বলে—ও নিয়ে ভেবোনা বসন্ত। আরে ছেলেমানুষ—বলেছে আজে বাজে কথা, তাই নিয়ে মনে করার কি আছে। যেতে দাও। আর পাত্রের ব্যাপারে দেখছি আমিও—

বসন্ত ভরসা পেয়ে বলে—একটু দয়া করুন, নাহলে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হবো না। আপনার এত চেনা জানা··· মহেশ মান্নার রাগ পড়েছে জেনে বসন্ত খুশী হয়।

মহেশ বলে—আজ সন্ধ্যায় যেন অতি অবশ্যই আসবে বসন্ত, বাড়িতে একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করছি। আর তোমার বাড়ির ওদেরও আসতে বলো। গিন্নী—কমলাকে নিয়ে যেন আসে।

বসন্ত এই নিমন্ত্রণে খুশী হয়। বলে সে—যাবো বৈকি মান্নাবাবু। সবাই যাবে।

মান্নাবাবু বলে—তোমাকে একটু থেকে কাজ কর্ম উদ্ধার করে দিতে হবে।

মাথা নাড়ে বসন্ত, এই দায়িত্ব সে খুশী হয়েই স্বীকার করে।

গজেন খুব ব্যস্ত। বাড়িতে এর মধ্যে সামিয়ানা টাঙিয়ে উঠানটা ঢেকেছে, ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে। নাচের ঘরেই রান্নার আয়োজন হয়েছে। পাশেই কুঞ্জবনের ঘরগুলো সাফ করিয়ে টেবিল চেয়ার—ফরাস লাগানো হয়েছে। বাইরের অতিথিদের আপ্যায়ণ করা হবে এখানে। তাজা ভেটকি মাছের ফ্রাই, মুরগীর কাটলেট, মুরগীর কারি—আর পোলাও-এর আয়োজন হয়েছে এখানে। শেষ পাতে থাকবে সন্দেশ, রসগোল্লা। গঞ্জের নেপাল ময়রা এসে বসে গেছে ভিয়েন নিয়ে। ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। হাঁক ডাক করে—ভজা—সামিয়ানা টাঙা। বেঞ্চ চেয়ারগুলো লাগা—মুরগী কেটে বানিয়ে রাখ, মাছের পিস্ বানা—একা গজেনই হৈ-চৈ করে মাৎ করে রেখেছে। সদর থেকে কাঠের বাক্সে আনা হয়েছে বিলাতী মদের বোতলগুলো। গজেন ওগুলো রাখতে রাখতে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কি ভেবে একটা বোতল খুলে খানিকটা

গিলে নিয়ে খুশী হয়। না, জিনিস ভালোই এনেছে। এখানে তিপ্‌লির তৈরী দিশী চোলাই-এর মত বদ্ গন্ধ—বিশ্রী ঝাঁক নেই। খুশিমনে চীৎকার করে—হাত চালা নদে, সব আয়োজন যেন ঠিক থাকে। গ্লাসগুলো ধুয়ে রাখ।

মহেশ মান্নার নজর সবদিকেই। খোস মেজাজেই আছে সে। শুধু ঝিম ঝিম বৃষ্টিটাই কেমন বিশ্রী লাগে। তা' ক করা যাবে। সাগর দ্বীপের মানুষ ঝড় বৃষ্টিতে অভ্যস্ত। মহেশ সব দেখে শুনে বলে—গজেন, সাহেবরা এলে এ ঘরে বসিয়ে গরম কাটলেট ফ্রাই-এর সঙ্গে মালপত্র দিবি।

দেখিগে, এবার ঘাটে গে। ওনাদের আসার সময় হয়ে গেল।

নতুন ব্যাটারি দেওয়া রেকর্ডপ্লেয়ার কিনেছে মহেশ।

সেটাও বাজানো শুরু হয়ে গেছে। বিদেশী তুম্ দাম বাজনা, বিকট সুরে বিদেশী সেই বাজনার উগ্রতা কুঞ্জবনের পরিবেশকে মাতাল করে তুলেছে। হেসাক, ডেলাইট, জ্বলছে। আলোর রোশনী, ওদের কোলাহল আর উগ্র বিদেশী বাজনার সুর সাগর দ্বীপের এই রাতে কি মত্ত উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

কমলা বাড়িতে ঢুকেছে।

বাসিনিও শুনেছে খবরটা। বসন্ত পণ্ডিত দুপুরে বাড়ি এসে মেয়েকে না দেখে গর্জে ওঠে—কোথায় গেল সে? ওই ভুবন মাইতির বাড়িতে আছে বোধ হয়। এবার তোমার মেয়ের জন্য আমাকেই শেষ হতে হবে। সবিস্তারে বসন্ত এবার বর্ণনা দেয় মেয়ের কীর্তির কথা।

বাসিনী খবরটা শুনে চমকে ওঠে—সেকি! এতবড় অন্যায় করলো মান্নাবাবু?

—চোপ! বসন্ত রুখে ওঠে। বলে—মা মেয়েতেই দেখছি এক ধাতের। নাহলে মেয়ে এমনি সাহস পায়! ব্যবস্থা করছি এবার ওর। মান্না মশাইও কথা দিয়েছেন পাত্র তিনিই দেখে দেবেন। সে কদিন মেয়েকে একটু সমঝে চলতে বলো।

বসন্ত বলে—ভাত দাও। খেয়ে আবার ঘাটে বসতে হবে। ওদিকে আজ মান্নাবাবুর বাড়িতে কাজ। কথাটা মনে পড়ে তার।

বলে বসন্ত—আজ সন্ধ্যা বেলায় যেন বাড়িতে থাকে মেয়ে, মহেশবাবুর ওখানে পূজো দিয়ে আজ একটু খাবার ব্যাপার আছে। তোমাদেরও বার বার করে যেতে বলেছে। মেয়েকে বলো—যেন যান একটু। বুঝলে।

বসন্ত খেয়ে উঠে ছাতাটা নিয়ে চলে গেল। যাবার মুখে স্মরণ করিয়ে

মেয়—মেয়েকে বলো। সন্ধ্যার দিকে একবার বাড়ি হয়ে ওখানে চলে যাবো তোমাদের নিয়ে। বাসিনী চুপ করে থাকে।

ওদিকে ভুবন মাইতির মত লোকটাকে এভাবে শেষ করে ওরা যেন আনন্দ উৎসব করছে। সেই উৎসবে যেতে তার মন চায় না। কিন্তু উপায় নেই। বাসিনীকে যেতেই হবে। মহেশ মান্নার বৌকেও যেন সহ্য করতে পারে না। শীর্ণ রোগজীর্ণ কাঠি কাঠি দেহ, একরাশ চলচলে চুড়ি পরে—গহনায় গা মুড়ে দামী শাড়ি পরে নাক তুলে কথা বলে। বাসিনীকে তবু যেতে হবে।

মেয়েকে ঝড়ো কাকের মত ঢুকতে দেখে চাইল। শুধোয় সে—কেমন আছে মাইতি কত্তা? ডাক্তার কি বলে?

কমলা সবই শোনায় মাকে। ডাক্তারকে ওরা সরিয়ে দিয়েছে। ঘনশ্যাম এখনও ফেরেনি। কমলা বলে—ভূষণ কবরেজও জবাব দে গেল।

বাসিনী বলে—খেয়ে দেয়ে নে।

কমলার খাবার ইচ্ছা নেই। বার বার অসহায় মানুষটার মুখ মনে পড়ে। তাকে দুহাত ধরে বলে মাইতি কত্তা—তুই ঘনাকে দেখিস মা। ওর আর কেউ রইল না। কেউ নাই ওর। কমলা চমকে ওঠে। খাবারও রুচি নেই। কোনরকমে দুগ্রাস খেয়ে উঠে বলে—আমি ও বাড়িতে যাই মা। পিসী একা রয়েছে। এসময় ওদের পাশে কেউ নাই?

বাসিনী আপত্তি করতে পারে না। তবু বলে সে—আজ রাতে মান্নাবাবুর বাড়িতে কিসের ভোজ আছে। তোর বাবাকে বলেছে, আমাদেরও যেতে হবে।

মায়ের কথায় কমলা অবাক হয়। ভোজ! কিসের ভোজ দিচ্ছে ওই মান্না?

বাসিনী তা জানে না। চুপ করে থাকে। কমলা বলে—ওই ভোজ গিলতে পারবো না মা। ওই শয়তানকে আমি চিনেছি। বাবা যা করে করুক, যেতে হয় তুমি যেও। আমাকে যেতে বলো না মা। পারবো না।

বাসিনী মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে। আজ তার দুঃখটাও বোঝে সে। বাসিনী বলে—ঠিক আছে। আমি বুঝিয়ে যা হয় বলবো। ওখানে চলে গেলেও দেরী করিসনি মা। ঝড় বাদলের রাত। তুই বাড়ি চলে আসবি। চাবিটা কুলুঙ্গীতে রেখে যাবো।

কমলা এত সহজে মাকে এড়াতে পেরে খুশী হয়। বলে সে—না না। দেরী হবে না। আমি ঠিক চলে এসে বাড়িতে থাকবো। যা হয় মুড়ি চিঁড়ে খেয়ে

নেব যদি খিদে পায়। বের হয়ে গেল কমলা। তার মন পড়ে আছে ওই অসুস্থ লোকটার পাশে।

এখানে যেন মৃত্যুর স্তব্ধতা নামছে।

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় ঘরের মাঝে শুয়ে আছে ভুবন মাইতি, মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। হঠাৎ ঘনশ্যামকে দরজা খুলে বৃষ্টিভেজা অবস্থায় ঢুকতে দেখে চাইল কমলা। পিসীও কান্নায় ভেঙে পড়ে।

—এলি ঘনশ্যাম। দ্যাখ তোর বাপের কি হাল করেছে মহেশ, ছাখ। ঘাটের দখল নিয়ে নিইছে অধম্ম করে, জোর করে। লোকটা আটকাতি গেল। ওরে ধাক্কা মারি ভেড়ির নীচে ফেলছে। কমলা না থাকলি ওইখানেই শেষ হই যেত্তো।

ঘনশ্যাম গর্জে ওঠে—কি বললে পিসী! ধাক্কা মেরেছে বাবাকে? কে? কোন ব্যাটা। দেখে আসি তাকে—

কমলা বলে—এখন ওসব করার সময় নেই ঘনাদা। দেখছো না মানুষটা একরকম বিনা চিকিৎসায় পড়ে আছে। ওকে বাঁচাতে হবে, ডাক্তার আনতি হবে।

ঘনা শুধোয়—রমণ ডাক্তার আসেনি?

অঘোর সরকার শোনায় খবরটা, রমণকে পাওয়া যায়নি। ইচ্ছে করেই মহেশ তাকে সরিয়ে দিয়েছে। যাতে ভুবন মাইতি বিনা চিকিৎসায় ফুরিয়ে যায়।

ঘনশ্যাম রাগে ফুঁসছে। এতবড় অন্যায় অবিচার করে চলেছে লোকটা একটার পর একটা, এর প্রতিকার করবেই। অঘোর সরকার বলে—এখন ডাক্তার কোথায় পাই ছোটবাবু? বিনা চিকিৎসায় সর্বনাশ হবে।

ঘনশ্যাম দেখছে তার বাবাকে। জীর্ণ মুখে মৃত্যুর কালিমা। তাঁকে বাঁচাতেই হবে। সে কাকদ্বীপ যাবে। ডাক্তার আনবে।

ঘনশ্যাম বলে—আমি আনছি কাকা।

গিরিবালা শুধোয়—এই এলি, এখুনিই কোথায় যাবি এই ঝড় বাদলে?

ঘনশ্যাম বলে—কাকদ্বীপ থেকে বড় ডাক্তার আনছি পিসী।

—সেকি! অঘোর সরকার বলে—এই দুর্যোগে গাং পাড়ি দেবে?

ঘনশ্যাম বাইরের জমাট অন্ধকারের দিকে চাইল। ঝড়ো হাওয়ার মাতন উঠেছে। মেঘের গর্জন শোনা যায়। থরে থরে জমা মেঘগুলো এবার দুর্যোগ ঘটাবার আয়োজন করছে।

ঘনশ্যাম এমন দুর্যোগকে ভয় পায় না। তার সঙ্কের ভাষা সে বোঝে।

ঘনশ্যাম বলে—এই রাতে গাং পাড়ি দিতে ঘনশ্যামের আটকাবে না কাকা। ডাক্তার আমি আনছি—বের হয়ে গেল ঘনশ্যাম।

হাওয়ার দাপট চলেছে, গর্জন ওঠে গাং-এর, ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে বালুচরে। ঘনশ্যাম এগিয়ে চলেছে ঘাটের দিকে। ওদিকের অন্ধকার উদ্ভাসিত করে মহেশ মান্নার বাড়িতে ডেলাইট, হেসাকের আলো জ্বলছে। বাতাসে ওঠে বিজাতীয় গানের সুর। এই পরিবেশটাকে যেন বিষিয়ে তুলেছে।

পারঘাটের কাছে এসেছে ঘনশ্যাম। ঘাটের হেসাক জ্বলছে, বড় নৌকা থেকে নামছে থানার বড়বাবু, ব্লক অপিসের কর্ত্তা, সহরের দু' একজন। মহেশ মান্না মাননীয় অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য হাজির রয়েছে। কর্তাদের নামতে দেখে এগিয়ে যাবে গদগদ চিত্তে, হঠাৎ পিঠে কার হাতের ছোঁয়া পেয়ে চাইল বিরক্তিভাবে। এই দ্বীপে তার পিঠে হাত দিয়ে কথা বলতে পারে এমন সাহস কারোও নেই। তাই এভাবে বাধা পেয়ে চমকে ওঠে মহেশ।

আবছা অন্ধকারে ঘনশ্যামকে দেখে অবাক হয়। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে, সারা দেহে দুর্বার বলিষ্ঠতা। চোখ দুটো যেন জ্বলছে বাদাবনের বাঘের মত। মহেশ মান্না ধাক্কাটা সামলে নিয়ে বলে—ঘনশ্যাম।

মহেশ মান্না চতুর অভিনেতা। নিমেষের মধ্যে সে রূপ বদলে ফেলতে পারে দরকারমত। মহেশ বেদনার্ত সমবেদনার সুরে শুধোয়—মাইতি কর্তা কেমন আছেন ঘনশ্যাম? ওরা ঠিকমত বাড়িতে দিয়ে এসেছে তো?

ঘনশ্যামের মনে হয় ওই শয়তানের টুটিটা টিপে ধরবে। কিন্তু এখন তার সময় নেই। কোন মতে রাগটাকে সামলে বলে ওঠে—মাইতি মশায়ের জন্য খুব ভাবছো, না?

মহেশ বলে—তা ভাবতে হবে বৈকি। সাগর দ্বীপের বটবৃক্ষ হে।

ঘনশ্যাম বলে ওঠে—চুপ করো মহেশ। আর তোমার ভাবনার কথাটা জানা রইল, জবাবটা ঠিক সময়ে দেব। ঘনশ্যাম জবাব দিতে ভয় পায় না।

মহেশ দেখছে ওর দুচোখ আগুনের আভা।

ঘনশ্যাম লাফ দিয়ে ঘাটে গিয়ে ওপাশে গেরাপি করা লঞ্চে লাফিয়ে উঠে হাঁক পাড়ে মটরা—ইঞ্জিন চালু কর। অন্ধকারে গর্জে ওঠে ঘনশ্যামের লঞ্চের ইঞ্জিনটা। যেন ওর মনের অতলের সব রাগ গর্জে উঠেছে।

মহেশ একটু ঘাবড়ে গেছে। ঘনশ্যামের কানে তুলেছে এর মধ্যে সব কথাই। ঘনশ্যাম-এর রাগ জেদকে চেনে সে। ভয়ও হয়।

ওদিকে দাঁড়ানো থানার বড়বাবু, ব্লক অফিসারও দেখছে ব্যাপারটা।

ঘনশ্যাম বেশ সতেজেই শাসিয়ে গেল মহেশবাবুকে, আর ওর শাসানিটায় রীতিমত ভয় পেয়েছে, মহেশ সেটাও বড়বাবুর নজর এড়ায় না।

বড়বাবু শুধোয়—কি বলছিল ঘনশ্যামবাবু?

সুযোগ পেয়ে মহেশ বলে—ওর কথা আর বলবেন না স্যার। আমার ওপর ওর অযথা রাগ, আমি নাকি ওদের সব ঠকিয়ে নিইছি। সরকারী ডাক ডেকে ঘাট নিলাম—তাও দেখলেন তো স্যার শাসিয়ে গেল আপনাদের সামনেই! বলে—দেখে নোব তোমাকে! বড্ড অশান্তিতে আছি হুজুর।

বড়বাবু বলেন—দরকার বুঝলে থানায় একটা ডাইরী করিয়ে রাখবেন।

মহেশ খুশি হয়েছে বড়বাবুর কথায়। ওদের নজরে আনতে পেয়েছে ওর শাসানিটা। তাতেই কাজ হবে মহেশের। এবার মহেশ বেশ ভালো মানুষের মত বলে—আপনাদের দয়াতে চলে যাচ্ছে স্যার। জানি বিপদ আপদে আপনারা দেখবেন। বিচার করবেন। ওসব ডাইরী করা কেন!

যেতে দ্যান ওসব কথা। চলুন স্যার—ওরে মধু, মনোহরবাবুদের মাথায় ছাতা ধরে সাবধানে নে চল। যা বৃষ্টি নামলো, বড্ড কষ্ট হল স্যারদের।

শহরের কোন মাতব্বর বলে—না, না। কষ্ট কি। এমনি বৃষ্টি বাদল না হলে খাওয়াটা জমে না।

রসিকতায় মহেশ হাসে ঠা ঠা করে। বলে—কি আর এমন আয়োজন করতে পেরেছি স্যার। আপনাদের পায়ের ধুলো পড়লো এই আমার ভাগ্য। ওটা মহেশের কথার কথা। কারণ ধুলো আর ত্রিসীমানায় নেই। পায়ের জুতোয় এখন ওদের কাদা চট চট করছে। মহেশ মান্না আয়োজনের ত্রুটি কিছু রাখেনি। গজেন—মতিরামদের নিয়ে টেবিলে সাজিয়ে ফেলেছে। ব্ল্যাক নাইট—পেটার স্কচ—ম্যাকৃভাওয়েল হুইস্কি এসেছে, আছে 'রাম' আর সোডা বরফও এনেছে। সঙ্গে আছে গরম কাটলেট, তাজা ভেটকীর ফ্রাই!

বৃষ্টির রাতে অতিথিদের মেজাজ বদলে গেছে দু একপেগ পেটে পড়ার পর থেকেই। বেশ জমে উঠেছে আসর।

মহেশ মান্না বলে কাকে—গ্লাশ খালি কেন থাকবে ভাই, ওরে মতি—পূর্ণ পাত্র করতে হবে। দে—আপনাকে দুটো কাটলেট দিক। সামান্য একটু পান টান করে নিন। খাবার হয়ে যাবে তার মধ্যে!

বড়বাবু বলেন—দারুণ আয়োজন করেছেন দেখছি।

হাসে মহেশ: তার কুঞ্জবন আজ ধন্য হয়েছে এঁদের পদাস্পর্শে এই কথাটাই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। মহেশ জাল বুনে চলেছে নিপুণ ভাবে।

এই ফাঁকে বাইরে এসেছে, বসন্তও ব্যস্ত। ওদিকের বাড়িতে ইতিজনদের

খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। নটবর, মদন মাষ্টাররাও রয়েছে।

মহেশ শুধোয়—সব ঠিক আছে তো!

নটবর জানায়—হ্যাঁ দাদা।

—দেখো যেন অযত্ন না হয় কারো। মহেশ সামনে বসন্তকে দেখে খবর নেয়—তোমার বাড়ির সবাই এসেছে?

এই ভয়ই করছিল বসন্ত। এই নিয়ে সন্ধ্যার মুখেই বাসিনীর সঙ্গে বেশ একচোট হয়ে গেছে তার। ওই অবাধ্য কমলা বাড়ি ফেরেনি। বাসিনী বলে—ওখানে গেছে, ওখান থেকে বাড়িতে ফিরে এলে—আমিও আসবো। তখন ও যাবে বলেছে। এই রাতে ফাঁকায় বাড়ি খালি রেখে যাওয়া ঠিক হবেনা।

বসন্ত বাসিনীকে নিয়ে এসেছে। ভেবেছিলাম মান্নাবাবু সাতকাজে ভুলে যাবে কথাটা। কিন্তু ওকে খবর নিতে দেখে বলে বসন্ত—কমলার মা এসেছে।

মহেশ শুধোয়—কমলা আসেনি?

বসন্ত বলে—ওর মা খেয়ে ফিরলেই ও আসবে।

তারপর মিথ্যা কথাটাই জানাতে হয় তাকে। বলে বসন্ত—বাড়ি খোলা রেখে আসতে চাইল না কমলা, ও ফিরে গেলেই কমলা আসবে, নাহয় তার জন্য কিছু নিয়ে যাবো।

মহেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ে কথাটা শুনে। বলে সে—তাই কি হয়। রাত হয়ে যাবে সে আসবে কখন? আমি বরং কাউকে বাড়ি দেখতে বলে ওকে ডেকে আনছি।

বসন্ত অবাক হয়—সেকি! আপনি আবার কষ্ট করে যাবেন?

হাসে মহেশ—আরও দু একজনের আসার কথা আছে, ঘাটে যেতে হবে। ওখান থেকেই হয়ে আসবো।

গজেন তৈরী ছিল।

মহেশ মান্না এই কর্তাদের হাজির রেখে আয়োজন করেছে ভোজের তার কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে তা জানে সে। আর তার জন্য সেও তৈরী। মহেশ মান্নার অনেক গোপন কাজের নায়ক সে। বৃষ্টি ভরা রাত, দুর্যোগ-এর হাওয়া হাঁকছে সমানে।

মহেশের ডাকে গজেন এগিয়ে এল বাড়ির পিছনের বাগানে। আবছা অন্ধকারে মহেশের দুচোখ জ্বলছে। গলা নামিয়ে শুধোয়—সব আয়োজন ঠিক আছে? গজেন ঘাড় নাড়ে। মহেশ আজ সাঁড়াশী আক্রমণ হানতে চায়। জেলেদের অবাধ্যতার শাস্তি সে দেবে। তাকে ওরা অপমান করেছে। মাছের

আড়ত তুলে দিয়েছে। দাদন সুদ সব বন্ধ করেছে।

মহেশ বলে—তাহলে চলে যা। হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবি। যেন কেউ জানতে না পারে।

গজেন এসব কাজে খুব অভ্যস্ত। ঘাড় নাড়ে সে—সে ভাবতি হবে নি। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল গজেন। তার দু'একজন অনুচর নিয়ে, হাতে দুটো টিন।

মহেশ চলেছে রাতের অন্ধকারে বসন্ত পণ্ডিতের বাড়ির দিকে। আকাশে বৃষ্টি ধরেছে, কিন্তু মেঘ গর্জন থামেনি। বিদ্যুতের তীব্র ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নির্জন পথ, পিছনের ঘর বসত—বালিচরের ঝাউবন। ঝড় চলেছে।

মহেশ মান্না এগিয়ে চলে। তার মনেও ঝড় উঠেছে। ঘনশ্যামের ওই শাসানি সে ভোলেনি। আজ সে দেখিয়ে দেবে মহেশ মান্না ভুবন মাইতির সর্বস্ব কেড়ে নেয় নি, ঘনশ্যামের সব স্বপ্নকেও মুছে দিতে পারে। সেই হিংস্র শপথ নিয়েই এগিয়ে চলেছে মানুষটা।

অঘোর সরকার দেখছে ভুবন মাইতিকে। কোন উন্নতিই হয়নি। মনে হয় একটা প্রদীপের তেল যেন নিভে নিভে আসছে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে জ্যোতিটুকু।

গিরিবালা বলে—এখনও ঘনশ্যাম ফিরলো না। এই ঝড়ে বেরুলো।

কমলা বৈকাল থেকেই এসে বসে আছে। কানে ভেসে আসে মহেশ মান্নার বাড়ির সেই উৎকট বাজনার শব্দ।

মানুষটাকে শেষ মুহূর্তেও যেন শান্তি দেবেনা ওরা।

পিসীর কথায় বলে—ফিরবে পিসী। ডাক্তার নিয়ে সে আসছে।

—কে জানে বাছা। অদৃষ্ট যখন মন্দ হয় তখন সব দিকেই বিপদই ঘনিয়ে আসে।

অঘোর সরকার বলে—একটু মকরধ্বজ খাইয়ে দিতে বলেছিল কবরেজ। নাড়িটাও ভালো ঠেকছেনা। মকরধ্বজই দাও দিদি। মধু দিয়ে ভালো করে খলে মেড়ে দাও, জিবে দিয়ে দিই। তবু ধাত রক্ষে হবে। ততক্ষণে ঘনশ্যাম নিশ্চয়ই ফিরে আসবে ডাক্তার নিয়ে। ওরা শেষ অবধি আশা হারায়নি। তাই এখনও চেষ্টা করে চলেছে। গিরিবালা ওষুধ আনতে গিয়ে অবাক হয়। মধু একটু ছিল, কিন্তু কোথায় রেখেছে এই সময় খেয়াল করতে পারে না সে। চারিদিক হাতড়াচ্ছে, কিন্তু মনে পড়ে না। মধুর দরকার। গিরিবালা বলে—অ-দাদা। কতি রাখলাম মধু খুঁজি পাইনি। মন মেজাজেরও ঠিক নাই।

এখন কি হবে। এই রাতে মধু পাই কোথায়? ভাবনার কথা। তবু মকরধ্বজ খাওয়াতে পারলে রোগী কিছুক্ষণ বুঝতে পারতো, কিন্তু মধুর সন্ধান নেই।

কমলা বলে—আমাদের বাড়িতে মধু আছে, আমি নে আসছি।

অঘোর সরকার তবু আশা পায়। বলে সে—তাই দেখো।

কিন্তু বাধা দেয় গিরিবালা—শোনো কথা। এই ঝড় বাদলের রাতে তুই একা যাবি নাকি এ্যাতখানি পথ!

ভুবন মাইতির জীবন মরণ প্রশ্ন।

তাই কমলা বলে—বৃষ্টি একটুন কমেছে, যাবো আর আসবো। কোন ভয় নাই পিসী, কমলার সামনে যমও আসবে না। মেয়েটা বের হয়ে গেল। ওই ঝড়ো হাওয়া আর বাজ-গর্জনের মাঝে দৌড়চ্ছে সে। ভয় ভয় করে, কিন্তু ভয় করলে চলবে না। দূরে মান্না বাড়িতে আলো জ্বলছে, লোকজনের সাড়া আসে। একটু ভরসা পায়। সেই ভরসা নিয়েই ডাকাবুকো মেয়েটা দৌড়ে চলেছে। জানে মা বাবা হয়তো বাড়িতে নেই। কুলুঙ্গিতে চাবিটা আছে, তার ঘরের তাকে তোলা আছে মধুর শিশিটা, নিয়েই চলে আসবে। দূরে শোনা যায় লঞ্চের শব্দ, এখনও দূরেই আছে। ওই শব্দ সে চেনে, ঘনশ্যামদার লঞ্চ। ডাক্তার আনছে সে বোধ হয়। খুশি মনে কমলা ভেড়ি থেকে নেমে ওপাশে তাদের বাড়ির দিকে দৌড়লো। অন্ধকারে আকাশ উল্সে ওঠে বিদ্যুতের আভায়। নির্জন বাড়িটা যেন থম থম করছে। দরজার শিকল খুলে শূন্য উঠানে পা দিয়েছে কমলা। কোথায় একটা বাজ পড়েছে। কেঁপে ওঠে চারিদিক। পাশের ঝাউ গাছে দু চারটে পাখী আশ্রয় নিয়েছিল, কঁকিয়ে ওঠে তারা। আতঙ্কে। কমলা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে কুলুঙ্গীটা। ঘরের দেওয়ালে তিন চারটে কুলুঙ্গী আছে এটা সেটায় বোঝাই হয়ে। কোনটায় চাবি রেখে গেছে তা সঠিক জানে না, তাই অন্ধকারে সে হাতড়াচ্ছে। বিরক্ত হয় নিজেই। কোনটায় রাখবে সেটা সে জেনে যায় নি। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে, খেয়াল করেনি। হাঁপাচ্ছে ক্লান্তি আর উত্তেজনায়। চাবিটা পেয়েছে হাতে, নিশ্চিন্ত হয় সে। ঘরের দিকে এগোতে যাবে হঠাৎ সদর দরজার কপাট খোলার শব্দে চাইল। দরজাগুলো বেশ শব্দ করে খোলে। বিশ্রী কর্কশ ওঠে। মনে হয় মা বাবা ফিরছে। বলে ওঠে কমলা—কোথায় যে চাবি রাখো কখন থেকে খুঁজছি মা! চোখ তুলেই চমকে ওঠে কমলা। টর্চের আলো জ্বলে ওঠে। এক ঝলক বিদ্যুতের আলোয় দেখেছে কমলা লোকটাকে। অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে—আপনি! একটা কর্কশ হাসির শব্দ ওঠে।

কমলা দেখছে ওকে। লোকটা উঠান ছাড়িয়ে দাওয়ার কাছে এগিয়ে আসছে। অজানা বিস্ময় আর ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে সে। এমনি নির্জনে এক ঝড়ের রাতে ওই লোকটার এত কাছে এসে দাঁড়াতে হবে, তা ভাবেনি। ভয় পেয়েছে সে। এক ঝলক টর্চের আলো ফেলে লোকটা তার বৃষ্টি ভিজে প্রায় নিরাভরণ দেহটাকে দেখছে, দেহের রেখাগুলো উদ্ধত সোচ্চার। এতখানি পথ ভিজে দৌড়ে এসেছে, বুকের কাপড় জামারও ঠিক নেই। হাঁপাচ্ছে সে। বুক-দুটো ওঠা নামা করে। তার দেহটা যে এমনি দর্শনীয় তা আবিষ্কার করে চমকে ওঠে মেয়েটা। ওই আলোর সামনে—লোকটার বিচিত্র চাহনির সামনে অসহায় কণ্ঠে বলে ওঠে কমলা—আলোটা নেভান।

হাসছে লোকটা। আলোটা অবশ্য নিভিয়ে দিয়েছে।

গজেন তার সাকরেদদের নিয়ে অন্ধকারে জেলে বসতির সামনে এসে চারিদিকে সাবধানী দৃষ্টি মেলে দেখছে। কোথাও কেউ নেই। ঘাড়ে ঘাড়ে লাগানো জমাট বসতির চালগুলো। বাইরে গাছের নীচে—ডিঙিগুলো টেনে তোলা রয়েছে। চারিদিক নির্জন।

ঝড়ো হওয়া কাঁপছে ঝাউবনে।

গজেনের হাতে সময় বেশী নেই। ওদিকে অতিথিরা জানার আগেই সেখানে গিয়ে হাজির হতে হবে। কর্তার নির্দেশ। যেন তারা সন্দেহ না করতে পারে। মনে হবে তাদের গজেন সর্বদাই কাছেই রয়েছে। গুপীনাথ-এর রাগটা ছিল আগে থেকেই। সেও এসেছে। গজেন বলে—কেরোসিন তেলগুলো আগে বেশ যুৎ করে ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে নিয়ে চালের এদিক ওদিক, নীচের দিকে গুঁজে দিয়ে জ্বালাবি আগুনটা।

মাথা নাড়ে গুপীনাথ আর অন্যজন। নিপুণ হাতে তারা কাজ করে চলেছে। বসতির চাল-এর নীচের দিকে ওই তেল ভেজানো ন্যাকড়াগুলো বসিয়ে বাকী তেল ছিটিয়ে চলেছে।

কোথাও কোনও সাড়া শব্দ নেই।

ঘুমুচ্ছে ক্লান্ত মানুষগুলো সারাদিনের পরিশ্রমের পর। লাগাতে দেশাইকাঠি ওই ঝড়ো হাওয়ায় নীচেকার শুকনো হোগলা-পাতা খড়গুলো দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। চারিদিকে বেশ কয়েকখানা ঘরে টানা আগুন জ্বলছে। ওরা ছুটে গিয়ে ঝাউবনে ঢুকে যায়।

কদমের রাতে ঘুম ঠিক আসেনি। মনমেজাজও ভালো নেই। এমনি বাদলা দুর্যোগের রাতে তার মরদটাও জালে গেছল। সে রাতে ছিল দারুণ

দুর্যোগ। রাত জেগে কাটিয়েছে জেলেপাড়ার মানুষগুলো।

আজ ঘনশ্যামের লঞ্চ হওয়ায় এদের ভাবনা কিছুটা কেটেছে। কদম আজও এমনি দুর্যোগের রাতে কান পেতে থাকে। সে জানে তার মরদটাও হয়তো কোথায় ভেসে গিয়ে আশ্রয় পেয়েছে, ফিরে আসবে। ডাকবে তাকে। বড় ডাকাবুকো ছিল মরদটা! কদমের ঘুম আসে না। কি খেয়াল বশে ঝাঁপটা খুলে বাইরে এসে ঝাউবনের নীচে কাকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চাইল। অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করে। এক ঝলক বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ মনে হয় গজেনই দাঁড়িয়ে আছে।

কদমের সারা গা জ্বলে ওঠে।

রাতের অন্ধকারেও ওরা আসে এ পাড়ার বৌ-ঝিদের সন্ধানে। লোভী কুকুরগুলোর জন্য দিনরাত যেন শান্তি নেই তাদের। কদম পড়ে থাকা একটা কাঠের টুকরো নিয়ে চুপে চুপে এগিয়ে যায়। পিছন থেকে গিয়ে গজেনকে দেখবে একবার। তাক মত পেলে হালভাঙা কাঠের টুকরো দিয়েই এক ঘা বসিয়ে দেবে।

এগিয়েছে ঝুপড়ি ছেড়ে, হঠাৎ পিছনে তাদের বসতির দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। দমকা বাতাসে আগুনটা ততক্ষণে ওই ভিজে চালকেই গ্রাস করেছে। কয়েকখানা ঘর জ্বলছে।

চীৎকার করে ওঠে কদম—আগুন! আগুন—

কারা তীর বেগে দৌড়ে গিয়ে ঝাউবনে ঢুকছে। ওদিকের ছায়ামূর্তিটা দৌড়াচ্ছে, কদম বুঝেছে ওরা কারা, কেন এসেছিল এখানে। আগুন লাগিয়ে তাদের পুড়িয়ে মারার জন্য তৈরী হয়ে এসে কাণ্ডটা বাধিয়ে পালাচ্ছে। কদমও বাদাবনের বাঘিনীর মত দৌড়চ্ছে উপরের বালিয়াড়ি দিয়ে, নীচে দিয়ে লোকটা দৌড়চ্ছে, বালিতে পা বসে যায়, তবু কদম ওকে ধরবেই।

বালিয়াড়ির উপর থেকেই লাফ দিয়ে পড়েছে ওর ঘাড়ে। গজেন এ ধরনের আক্রমণের জন্য তৈরী ছিল না। আচমকা ওই ভাবে লাফ দিয়ে তার উপর কে পড়েছে। নরম স্পর্শ লাগে, মেয়েটা ধারালো নখ দিয়ে তার মুখ, কপাল হাঁচড়ে চলেছে, গজেনও ওকে ধাক্কা মেরে বালিতে ফেলে দিয়ে উঠে পালাচ্ছে। সামনে জ্বলছে বসতিগুলো। কোন মতে পালাতে না পারলে ওই ঘুমভাঙা জনতা তাকে ধরে ওই আগুনেই ফেলে দেবে।

মেয়েটাও তাকে ধরে রাখতে চায়, গজেন সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে লাথি মেরে ছিটকে ফেলেছে, হাত দুটো আলগা হয়ে যায় ওর। গজেন ছাড়া পেয়ে লাফ দিয়ে গিয়ে ঢুকে গেল ঝাউবনের গভীরে। আর দেখা যাবে না তাকে।

গজেন হাঁপাচ্ছে। দূরে দেখা যায় জলছে জেলেবসতি। কলরব—আর্তনাদ ওঠে।

গজেন গজরায়—মর শালারা। পুড়ে ছাই হয়ে যা। উঃ মেয়েটা কে তা চিনেছে গজেন। ওর দেহটার উপর লোভ তার ছিল, কিন্তু ওই মেয়েটা যে বাঘিনীর মত তাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে তা জানতো না। আজ জেনেছে। গলায় কাঁধে তখনও ওর নখের দাগ। জ্বালা করছে নুনছাল উঠে গিয়ে। হঠাৎ চমকে ওঠে সে! ধস্তাধস্তিতে নাহয় পথে কোথায় তার গলার সোনার মাদুলিটা পড়ে গেছে। বেশ কিছু টাকা চলে গেল! ওসব ভাবার খেয়াল নেই। গজেন দৌড়চ্ছে কুঞ্জবনের দিকে। সেখানে গিয়ে কর্তাদের মদের গ্লাশ ভরে দিতে হবে!

ঘনশ্যাম ফিরছে কাকদ্বীপ থেকে ভব ডাক্তারকে নিয়ে। ভব ডাক্তার প্রথমে আসতে চায়নি এই ঝড় জলের রাতে। ঘনশ্যামকে চেনে সে। কি ভেবে ওর অনুনয় বিনয়ে রাজী হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে শুধোয়—ঠিক যেতে পারবো তো। হাসে ঘনশ্যাম—আমার লঞ্চ ঠিক নে যাবে ডাক্তারবাবু।

ফিরছে ওরা। গঞ্জের ধারে এসেছে। মটরা চীৎকার করে ওঠে—ও কি গো! এাঁ—জেলেপাড়া যে বেড়া আগুনে জলছে গ!

লঞ্চের উপরের ঘর থেকে এদিকে চেয়ে চমকে ওঠে ঘনশ্যাম—তাইতো রে। নিশাচর, রতন, যতনদের কি হ'ল।

কলরব আর্তনাদ ওঠে। দেখা যায় জলছে জীর্ণ গোলপাতা—বাঁশের বেড়ার ঘরগুলো। বাঁশ-এর গেরো ফাটছে—দুম্ ফটাস! হাউই-এর মত জলন্ত বাঁশের টুকরোগুলো ছিটিয়ে অন্য ঘরে, তার চালও আগুনের তাপে শুকিয়ে গেছে, ফলে আগুন জলে উঠতে দেরী হয় না! লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে আগুনটা, সারা জেলেপাড়ার বসতিকে দেখতে দেখতে ছাই করে দেয়।

ওরা এই ফাঁকে হাঁড়ি কলসী—জাল—কাপড় চোপড় মায় খাবার অবধি সামান্য কিছু সরাতে পেরেছে, বাকী সব গেছে।

ঘনশ্যাম-এর সঙ্গী এরা। মনে হয় গুরুতর বিপদই ঘটেছে এখানে।

ঘনশ্যাম বলে—মটরা, তুই ডাক্তারবাবুকে বাড়িনে যা, আমি একবার এদের পাড়ার খবর নিয়েই যাচ্ছি।

মটরা বলে—বাড়িতে বেপদ, তুমি আবার যাবে উথানে? ঘনশ্যাম তা জানে। তবু বলে দেরী হবে না। ভব ডাক্তারকে বলে ঘনশ্যাম—ডাক্তারবাবু, ওর সঙ্গে চলে যাবেন। ওই লোকগুলোর খবর নিয়েই আমি যাচ্ছি। এসময়

একটু না গেলে ওদের আর যে কেউ নাই।

ভব ডাক্তার শুনেছে ঘনশ্যামের কথা। এত বড় বিপদে যাওয়া দরকার। ডাক্তারবাবু বলেন—ঠিক আছে। তুমি দেরী করোনা।

লঞ্চটা একটু ধারে এসেছে। যোয়ারের গাং—ঘনশ্যাম লাফ দিয়ে নেমে দৌড়লো জেলে পাড়ার ধ্বংসস্তূপগুলোর দিকে।

কালো ছাই মাথা মুখ, সারা গা। রতন ছুটে আসে। ওর বৌটা কঁকিয়ে ওঠে—ছোটবাবু গ। সব্বোনাশ হই গেল গো।

মেয়েদের কান্নার শব্দ ওঠে। সব গেছে ওদের। কালকের খাবারও নেই। পরণে যার যা ছিল সেটুকু ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নাই।

নিশাকর বলে—ই আগুন লাগিয়ে দিইছে কারা তা জানি।

ফটিকের বৌটা বলে—যাও, তখন বলেছিলাম সর্দার, জলে বাস করে কুমী-রের সঙ্গে বাদ করা যাবে'নি। তা শোনলনি। এখন দ্যাখো—ক্যামন সব্বনাশ করিছে। রতন গর্জে ওঠে—এর জবাব দিব।

কিন্তু কি জবাব দেবে তারা জানে না। আর কে আগুন দিয়েছে তারও কোন সাক্ষী প্রমাণ নেই। ঘনশ্যাম চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে এই সর্বনাশটা। সেও বুঝেছে কার কীর্ত্তি এসব। কিন্তু এইভাবে সর্বনাশ করতে পারে কেউ তা ভাবেনি।

আজ এদের এই দুর্ভাগ্যের জন্ত নিজেকেই দায়ী বলে মনে হয়। বলে সে রাত পোয়াক। কাল সকালে যা হয় করা যাবে সর্দার। আমি চলি। ডাক্তার গেছে বাড়িতে, বাবা কেমন রইল কে জানে। এগিয়ে চলেছে ঘনশ্যাম ভেড়ির এদিকের পথ দিয়ে। দূরে গঞ্জের একপাশে মামাবাবুর বাড়ির উৎসবের আলো দেখা যায়। এ দিকটা অন্ধকার। হঠাৎ এই অন্ধকারে কার চীৎকার শুনে থমকে দাঁড়ালো। জলে পিছল পথ। কান পেতে শোনে কোন দিক থেকে চীৎকারটা আসছে। ওদিকেই বসন্ত পণ্ডিতের বাড়ি। পিছনের দিকটা নির্জন। এই দিকের এক পাশে বাড়িটা।

চমকে ওঠে ঘনশ্যাম। ওই গলা তার চেনা। কমলা—একবার চীৎকার করেই থেমে গেল। কে যেন জোর করে ওর গলা টিপে ধরে থামিয়ে দিয়েছে চীৎকারটা। বসন্ত পণ্ডিত এত নীচে নামবে ভাবেনি। তার মেয়েকে যাতা বলে তা জানে ঘনশ্যাম। গায়ে হাত তুলবে—এভাবে গলা টিপে ধরতে পারে তা ভাবেনি।

তাহলে। অস্ফুট আর্তনাদ একবার ধ্বনিত হয়। ঘনশ্যামের সারা মনে ঝড় ওঠে। দৌড়ে যায় সে বাড়িটার দিকে। সদর দরজা ঠেলতে বোঝা

যায় ভিতর থেকে বন্ধ। একটা ধস্তাধস্তির শব্দ কানে আসে। ভিজে মাটিতে কি যেন আছড়ে পড়লো।

ঘনশ্যাম ভাবছে। পাচীরের একটা বাঁশের সাজা ধরে লাফ দিয়ে পাচীরে উঠে পাচীর টপকাতেই হবে তাকে।

কমলা রাতের অন্ধকারে তাদের বড়িতে মহেশ মান্নাকে আসতে দেখে চমকে ওঠে। ওর আবির্ভাব—ওই বিশ্রী হাসিটা আর টর্চের আলো জেলে তাকে দেখাটা বিশ্রী লেগেছে কমলার।

কমলা বলে—বাবা মা বাড়িতে নেই।

মহেশ মান্না দাওয়ায় বসে পড়েছে একটা মোড়ায়। বলে সে—নেই জেনেই তো এসেছি।

কমলাকে বেরুতে হবে। ঘরের দরজা খুলে মধুর শিশিটা হাতড়ে নিয়ে বাইরে এসে বলে সে—আমাকে এখুনিই যেতে হবে।

মহেশ মান্না শোনায়—তোমাকে নিতেই তো এসেছি। সবাই গেছে তুমি যাবে না তা কি হয়।

কমলা বলে—আপনার ওখানে যাওয়া আমার হবে না।

মহেশ মান্না ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। বৃষ্টির নির্জন রাত্রে কমলাকে দেখে তার মনের অতলের আদিম লোভী পশুটা জেগে উঠেছে। মহেশ মান্না অবাক হয়—সেকি। আমার ওখানে যাবে না?

—না। আমাকে যেতে হবে ভুবন কাকার বাড়িতে। ওষুধ দিতে হবে মধু দিয়ে, তাই নিতে এসেছিলাম।

মহেশ মান্না যেন ক্ষেপে উঠেছে। তার সামনে এই ভাবে প্রতিবাদ করে কেউ পার পায়নি। ওই মেয়েটা তা জানে না। তার কুঞ্জবনে কতো মেয়ের সর্বনাশ করেছে সে খবরও জানে না কমলা। আজ ওর সব স্বপ্নকে সে ব্যর্থ করে দেবে।

মহেশ মান্না বলে ওঠে—ভুবন মাইতিকেই দেখবে আমরা কি দোষ করলাম কমলা? একটু দ্যাখো আমাকে। তোমার বাবাকে তো চাকরী দিইছি।

কমলা চমকে ওঠে—কি বলছেন এসব কথা?

হাসছে মান্না—ঠিকই বলছি। সব ব্যবস্থা করে দেব। পাত্রের অভাব হবে না। সুপাত্র। শুধু আমাকে একটু দেখবে। মানে—চমকে ওঠে কমলা।

মহেশ মান্না ওর হাতটা ধরেছে। সারা মনে অসহ একটা ঘৃণায় সারা মন

জলে ওঠে। লোকটার লোভ-সাহস দেখে চমকে উঠেছে কমলা।

বেশ চড়া স্বরে বলে—হাত ছাড়ুন।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে এগোতে যাবে সে, মহেশ মান্না এবার বাধা পেয়ে ক্ষেপে উঠেছে। চাপা স্বরে গর্জে ওঠে—দাঁড়াও। শোন।

কমলাও রুখে ওঠে—শোনবার কিছুই নেই। বাবাকে কিনেছেন—তাই বলে আমাকে কিনতে পারবেন না। যান—এখান থেকে।

কমলার কথাটা শেষ হয় না।

মহেশ মান্নার মুখোসটা খুলে গেছে। সে কমলাকে জোর করে ধরে কাছে টেনে নেয়, কমলাও হকচকিত হয়ে গেছে। মহেশ মান্নার সারা শরীরে ওই স্পর্শটুকু আগুন জলেছে।

স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল জলে ওঠে।

—ছাড়ুন।

কমলা অস্ফুট আর্তনাদ করছে, মহেশ মান্নাও ক্ষেপে গেছে। ওকে দুর্বার শক্তিতে কাছে টেনে নেয়, দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে ওকে। কমলার মনে হয় ওই শয়তানটা পিষে ফেলবে—লুট করে নেবে তার সব কিছু। প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলেছে লোকটাকে—দৌড়চ্ছে কমলা।

মহেশ মান্না এবার আঘাত পেয়ে দুর্বার হয়ে ওঠে। কমলাকে ধরে ফেলে গর্জাচ্ছে—মহেশ মান্নার হাত থেকে তোর বাপ এলেও তোকে বাঁচাতে পারবে না। তেজ—তোর তেজ এবার শেষ করে দেব।

প্রবল চাপে তাকে পিষে ফেলতে চায়, কাপড় চোপড়ও ছিঁড়ে ফেলছে শয়তানটা। দুহাত দিয়ে টিপে ধরেছে, চীৎকার করে ওঠে কমলা কি জমাট আতঙ্কে।

—আবার চীৎকার। চোপ্। গলা টিপে ধরেছে, চুপ করে যায় কমলা। ভয়ে আতঙ্কে সে নির্বাক হয়ে গেছে। শয়তানটা এবার যেন গ্রাস করবে তাকে। কোথায় বাজ পড়লো। ঝলসে ওঠে দিকদিগন্ত, গর্জাচ্ছে লোকটা।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল মহেশ।

পাঁচিল টপকে লাফ দিয়ে নেমেছে ঘনশ্যাম। সে চমকে ওঠে ওই বিদ্যুতের আলোয় মহেশকে অসহায় কমলাকে এভাবে আক্রমণ করতে দেখে।

গর্জে ওঠে—মহেশ। মহেশ ভাবতে পারেনি এখানে এই সময় ঘনশ্যাম এসে পড়বে। কমলা নিজেকে মুক্ত করে অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে। ছড়ানো মধুর শিশি, কৌটোর মোড়াটা। সর্বত্র একটা লড়াই-এর চিহ্ন।

মহেশ মান্না গর্জে ওঠে—এখান থেকে চলে যাও ঘনশ্যাম।

ঘনশ্যাম অনেক সহ্য করেছে। তাদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। বাবাকেও চরম আঘাত দিয়েছে অন্যায় ভাবে। লোভী শয়তান আজ রাতের অন্ধকারে এখানে চড়াও হয়ে কমলার সর্বনাশ করতে এসেছে।

ঘনশ্যামের মাথায় রক্ত উঠে যায়। মহেশকে সহ্য করেছে এতদিন। আজ তাকে ক্ষমা করবে না। সপাটে একটা লাথি কসেছে। ছিটকে পড়ে মহেশ। ওর ধরাশায়ী দেহটার উপর লাফ দিয়ে পড়েছে ঘনশ্যাম।

মহেশও তৈরী হয়েছিল। ঘনশ্যামের দেহে সেও লাথিটা মেরেছে। দুজনে ছিটকে পড়ে। ঘনশ্যাম যেন ক্ষেপে গেছে। মহেশও নিজেকে বাঁচাতে চায়।

কমলা থামাবার চেষ্টা করে। ঘনশ্যাম সামনে দা টা দেখেছে, মহেশও ওটা তুলে নেবার চেষ্টা করে। দুজনে হাঁপাচ্ছে। এতদিনের পর দুই শত্রু যেন আজ মুখোমুখি হয়েছে। ওদের শেষ মীমাংসা করতে চায়।

কমলা চীৎকার করে—ঘনাদা!

ঘনশ্যাম দা টা তার হাতের নাগালে পেয়ে সেটাকে তুলে নিয়েছে।

আগুন লাগার খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে।

গজেন যথাসময়ে পৌঁছে হুজুরদের আপ্যায়ণ নিয়ে পড়েছে—পরম ব্র্যাণ্ডি আন। কাটলেট—মুরগীর রোষ্ট হ'ল রা।

এমন সময় খবরটা আসে।—জেলেপাড়ায় আগুন লেগেছে।

কর্তাদের অনেকের অবস্থা তখন তুরীয়। কে বলে—গোটা কতক মুরগী নে যা, রোষ্ট করে আনবি। অন্যজন কষ্ট করে চোখ খুলে বলে এখানে কিছু হয় নিতো? ব্যস। কিন্তু বড়বাবুর কর্তব্যজ্ঞান আছে। তিনি এত সহজে বেকায়দা হন না। ওই খবর পেয়ে বলেন—একবার সারজমিনে দেখে আসি। গজেন—

গজেন এক পায়ে খাড়া। বলে সে—যাবেন। তাহলে কাউকে সঙ্গে দিই নে যাবে। ওরে মধু, ছাতা আর হ্যাসাক নে যা স্যারের সঙ্গে।

বড়বাবু বলেন—ওসব লাগবে না। কাউকে সঙ্গে দাও, টর্চ নিয়ে চলুক। তুমিও চলো গজেন।

ওরা বের হয়ে যায়। গজেনকেও যেতে হয় বাধ্য হয়েই।

মহেশ মান্না তখনও ফেরেনি। গজেন ঠিক বুঝতে পারে না কোথায় গেল লোকটা।

চলেছে তারা নির্জন পথ দিয়ে। ভেড়ির ওদিকে জেলেপাড়া। এদিক থেকে তেমন কিছু দেখা যাবে না। বাঁধের আড়াল হয়ে যায়। বাঁধে ওঠার মুখে বসন্ত পণ্ডিতের বাড়ি। হঠাৎ ওখান থেকে মহেশ মান্নার চীৎকার শুনে গজেন চমকে ওঠে।

—বড়বাবু। ওখানে কার চিৎকার শোনলাম গ।

—তাই নাকি! ওরা এগিয়ে যায়। জীর্ণ দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। উঠানে কিসের শব্দ—কাদের চাপা গর্জন, কমলার চিৎকার শোনা যায়। বড়বাবু লাথি মেরে দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকে টর্চের আলোয় ওই দৃশ্য দেখেছে।

মহেশ মান্নাকে মাটিতে ফেলে তার উপর বসে দা তুলেছে ঘনশ্যাম, দু' চোখ জ্বলছে। মারের চোটে মহেশ মান্নার মুখ কেটে গেছে। কমলার কাপড় ছেঁড়া—ত্রস্তবাস। জামাটা ছিঁড়ে ঝুলছে। চুলে কাপড়ে কাদা, কাপড়খানা কোনমতে কোমরে জড়ানো। বাকীটা লুটোচ্ছে। চুলগুলো পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে।

মহেশ চিৎকার করে ওঠে—বাঁচাও—বাঁচাও।

ঘনশ্যামও চাইল। বড়বাবু এগিয়ে আসে। ওকে ধরেছে, সামনে খোলা রিভলবার। মহেশও ভরসা পেয়ে এবার উঠে বসে। আহত রক্তাক্ত মুখ তার। বলে সে—খুন করতো স্যার ঘনশ্যাম। আমাদের বাড়িতে কমলার নেমন্তন্ন, ওকে ডাকতে এসে দেখি ওই শয়তানটা মেয়েটাকে একলা পেয়ে সর্বনাশ করতে যাচ্ছে। চিৎকার করছে বেচারা। দেখুন বেচারার কি হাল করেছে ধনশ্যাম।

আমি এসে পড়ে বাধা দিতে গেলাম—তা এইভাবে মারলে। দা তুলে কেটে ফেলতো স্যার। নেহাৎ আপনারা এসে পড়লেন তাই এযাত্রা মা গঙ্গা, বাবা কপিলমুনি বাঁচিয়ে দেলেন।

ঘনশ্যাম গর্জে ওঠে—মিথ্যেবাদী, শয়তান, মুখ ভেঙে দেব। দুজন ধরে রেখেছে ঘনশ্যামকে। বন্দী জানোয়ারের মত গর্জাচ্ছে সে। খবর পেয়ে এর মধ্যে দৌড়ে এসেছে বসন্ত পণ্ডিত আর বাসিনী।

বসন্ত হাউমাউ করে ওঠে—ওরে মা, আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল রে! কমলাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে—দারোগাবাবু, ওই ঘনা আমার মেয়ের সর্বনাশ করেছে, ওকে জেলে দ্যান।

মহেশ মান্না হাঁপাচ্ছে—খুন করতো স্যার, স্বচক্ষে দেখেছেন। একটু আগে পারঘাটে স্বকর্ণে শুনেছেন আমাকে শাসিয়ে গেল। তারপরই এই কাণ্ড,

বিচার করুন স্যার।

বাসিনী কাঁদছে। হতচকিত হয়ে গেল কমলা। সে কি বলার চেষ্টা করে। বাসিনী বলে—ভিতরে আয় মা। ওসব কথা পরে হবে। চল।

দারোগাবাবুও বলেন—ওকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করুন। পরে সব শুনবো ওর মুখে।

—ঘনশ্যাম চাইল বড়বাবুর দিকে। বড়বাবু বলে—স্বচক্ষে যা দেখেছি, আর মান্নাবাবুর কথাও শুনেছি। আপনাকে থানায় যেতে হবে এখুনি।

চমকে ওঠে ঘনশ্যাম। বুঝতে পারে এবার বিপদের গুরুত্ব। ওদিকে তার বাবা মৃত্যুশয্যায়। ডাক্তার এনেছে এত কষ্ট করে। সেখানকার কোন খবর জানে না। ঘনশ্যামকে বলে, ডাক্তার এনেছি—একবার খবর নিতে হবে।

নরহরি বানের আগে ভেসে আসা খড়কুটোর মত এখানে এসে হাজির হয়েছে। সেও ছিল কুঞ্জবনে। অবশ্য তার মতলব ছিল অন্যরকম। রসগোল্লা পরিবেশন করতে করতে দুহাঁড়ি বাড়িতে চালান করে সবে ফিরছে তখনই খবরটা শুনে দৌড়ে এসেছে। নরহরি বলে—এতক্ষণ রাসলীলে করতে এসেছিল বাবার নাম ভুলে গিয়ে, এখন মনে পড়েছে। আহা কি পিতৃভক্তি রে!

ঘনশ্যাম গর্জে ওঠে—থামবে ভটচায। চিনছে সে ওদের।

নটবর বলে—ওকে এ্যারেস্ট করে নে যান স্যার।

অঘোর সরকারের ডাকে চাইল সবাই। ভিড় ঠেলে ঢুকেছে অঘোর। ব্যাপার দেখে সে চমকে ওঠে—ছোটবাবু!

ঘনশ্যাম চাইল ওর দিকে।

অঘোর সরকার এই অন্ধকারে হন্ত দন্ত হয়ে এসে ঘনশ্যামকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে! কান্নাভিজে স্বরে বলে সে—একি সব্বোনাশ হয়ে গেল ছোটবাবু।

—বাবা কেমন আছে? ডাক্তার কি বল্লেন!

অঘোর আর্তনাদ করে ওঠে—ডাক্তারের করার কিছু নাই গো। কত্তাবাবু আর নাই। একটু আগেই সব শেষ হয়ে গেল। মরার আগে কতো খুঁজলো তোমায়—

ঘনশ্যাম আর্তনাদ করে ওঠে—বাবা নেই! ওর ব্যাকুল কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত শোনায়। স্তব্ধতা নামে উঠানে। বসন্ত পণ্ডিতের গোঙানি শোনা যায়—ওই পাপে তোর সব যাবে!

ঘনশ্যাম বের হতে যাবে বাধা দেয় ওরা। মহেশ বলে ওঠে—ওকে ছেড়ে দিলে আর পাবেন না বড়বাবু। পালাচ্ছে ও!

বড়বাবু বাধা দেন—যেতে পাবেন না ঘনশ্যামবাবু।

—সেকি! বাবাকে শেষ দেখা ও দেখতে পাবে না! অঘোর সরকার বলে ওঠে। ঘনশ্যাম যাবার চেষ্টা করতে ওকে ধরে ফেলে বড়বাবু।

—এভাবে দিতে পারি না ওকে।

—কেন? কি আমার অপরাধ? গর্জে ওঠে ঘনশ্যাম।

বড়বাবু বলেন—এ্যাটেম্পট টু মার্ডার—রেপ। দুটোই কঠিন অপরাধ ঘনশ্যাম। ইউ আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট। তোমাকে যেতে দিতে পারি না। যেতে হয় আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। এভাবে নয়।

—বড়বাবু! অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে ঘনশ্যাম। বলে সে—এসব মিথ্যা। সব মিথ্যে ওই মহেশ মান্নাই এসেছিল কমলার সর্বনাশ করতে, করতোও। কমলার চিৎকার শুনে আমি এসে পড়ে ওকে বাধা দিতে এই হয়েছে—

মহেশ মান্নাকে কিছু বলতে হয় না।

অনেকেই বলে—সাধু তুই! ওকে টেনে নে যান বড়বাবু। কসে ধোলাই দিলি সব স্বীকার করতি পথ পাবে না।

ঘনশ্যাম আজ দিশাহারা হয়ে গেছে এই চরম বিপদের মধ্যে। সব চিন্তা ভাবনা তার ঘুলিয়ে যায়। সারা আকাশখানা যেন ভেঙে পড়েছে তার সামনে। বলে ঘনশ্যাম—কমলাকে শুধোন!

বসন্ত পণ্ডিত বলে—কি শুধোবে। ওসব পরে হবে। এখন যাও শ্রীঘরে। তারপর দেখা যাবে। উঃ—নিজের বাড়িতে শান্তিতে থাকতি পারবো না।

কমলাকে ওরা যেন সামনে আসতে দিতে চায় না।

নিয়ে চলেছে তাকে ওরা আজ ঘৃণ্য খুনী আসামীর মত, তার মৃত বাবাকে দেখতে চলেছে সে। চোখের জলও শুকিয়ে গেছে সব। ঘনশ্যামের কাছে চারিদিকে মানুষগুলোর রূপ বদলে গেছে। ওই নরহরি, বসন্ত পণ্ডিত, ভূধর জানা—সকলেই তার বাবার দয়ায় এখানে ঠাঁই পেয়েছিল। আজ ওদের বিবেক ন্যায়বোধকেও কিনে নিয়েছে মহেশ মান্না। ওরা ঘনশ্যামের কেউ নয়।

গিরিবালা আর্তনাদ করে ওঠে—একি করলি ঘনা?

ঘনশ্যাম দেখছে ভুবন মাইতিকে। ওর প্রাণহীন দেহটা আজ স্থির—সুন্দর হয়ে উঠেছে। কোন যন্ত্রণা নেই। ঘনশ্যাম বলে—কোন দোষ—কোন অন্যায় আমি করিনি পিসী। বাবার পা ছুঁয়ে বলছি, আর কেউ বিশ্বাস নাই করুক, অন্তত তুমি জেনে রাখো তোমার ঘনশ্যাম একাজ করেনি।

কমলাকে বাঁচাবার জন্তই মহেশকে মেরেছি—হয়তো খুনই করতাম। ওই শয়তানকে এর জবাব দেবই।

পিসী ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। আজ তার পাশে কেউ নেই। ঘনশ্যামকেও নিয়ে যাবে ওরা। বলে সে—আমার কি হবে?

ঘনশ্যাম বলে—অঘোর কাকা, সবাই বেইমানি করেছে, তুমি করোনি। তুমি পিসীকে দেখো যতদিন না ফিরে আসি।

অঘোর সরকারের দুচোখে জল নামে। তার সান্ত্বনা দেবার ভাষা জানা নেই এই দুঃখে। তবু বলে সে—আমি রইলাম ঘনশ্যাম। দরকার হয় মামলা লড়বো—কোর্ট ঘর করবোই। তোকে ছাড়িয়ে আনবো। ধর্ম্মো এখনও আছে রে। বিচার হবেই।

ঘনশ্যাম চুপ করে থাকে। তেমন কোন বস্তু এই জগতে আছে কিনা জানে না সে। তবে এইটুকু বুঝেছে সে বিচারের নামে একটা কিছু হবে, আর তার ফলাফল কি হবে জানে সে। শুধু কমলাকে ভরসা করে সে। জানে কমলা সত্যি কথাই বলবে।

কয়েকটা ঘণ্টা কোনদিকে ঝড়ের বেগে কেটে গেল। সকাল হয়েছে, মেঘলা গাং—আকাশে ছড়ানো মেঘের দল। গাং-এর বুকে উথাল পাতাল চলেছে। ঝড়ো বাতাসে চিতার আগুনটা নিভে এল। শেষ হয়ে গেল সবকিছু। ভুবন মাইতির নামটাই রইল কিছু লোকের মুখে, আর একজনের বুকে। ঘনশ্যাম শেষকৃত্য করলো বাবার।

বড়বাবু এর মধ্যে থানা থেকে আরও পুলিশ এনেছেন আসামীকে জোর পাহারায় রাখবার জন্য। কারণ সাগর দ্বীপের সাধারণ মানুষ খবরটা জেনেছে। জেলেপাড়ার মানুষগুলো এসে ভিড় করে, রাত্ জেগে তারা আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, সর্বাঙ্গে পোড়া ছাই মাখা। চোখগুলো লাল। আজ তাদের সব গেছে। ঘর বাড়িই নয়, বাঁচার পথও আর নেই। ঘনশ্যামবাবুই ছিল তাদের বল ভরসা—তার লঞ্চ নিয়ে ওরা নিরাপদে মাছ ধরে সমবায় তৈরী করেছিল। আজ সব হারিয়ে গেল। ওরাও এসে দাঁড়িয়েছে গাং-এর ধারে।

মহেশ মান্না তাড়া দেয়—বড়বাবু, লোকজন বেশ জমলে গোলমাল হতি পারে আসামীকে ওরা জোর করে ছাড়িয়ে নিতে চাইবে। তাই আসামীকে নে যান এখান থেকে।

বড়বাবু দেখছে ওই মূক—নীরব জনতাকে। বলেন তিনি—কিছু গোলমাল দেখলেই গুলি চালাবো। শুইয়ে দেব ব্যাটাদের।

ঘনশ্যাম ওই জনতায় ভিড়ে একজনকে খুঁজছিল। সে কমলা, আজ

তাকেই ওর বেশী দরকার। কমলা সব সত্যি কথা বলবে, আবার ফিরে আসবে সে। মহেশ মান্নার আসল স্বরূপ জানবে সকলে। ঘনশ্যাম দারোগাবাবুকে ওই গুলি চালানোর কথায় বলে—ওসব করে কাজ নাই। ভগবান ব্যাটা ওদের মেরেছে। আধমরা করে রেখেছে মহেশ মান্না, আর মড়ার উপর গুলি গোলা নাইবা চালালেন স্যার। চলুন—কোথায় নে যাবেন।

ওকে নৌকায় তুলছে।

অঘোর সরকারের চোখে জল। নিশাকর সর্দার, রতন, মটরা কান্নাভেজা স্বরে বলে—চললা ছোটবাবু, আমাদের কি হবে? না খাই মরতি হবে গ্যাযে।

ঘনশ্যাম দেখছে ওদের। সামনে তার লঞ্চটাকে দেখে থামলো। রাজ-হাঁসের মত সাদা লঞ্চটা গেরাপি করা, ওর দূর গাং-এর সাথী। বলে ঘনশ্যাম —মটরা, লঞ্চ ঠিক ঠাক রাখবি নালে ফিরে এসে পেঁদিয়ে বেন্দাবন দেখিয়ে দোব।

কদম কাল রাতে বেশ কিছুক্ষণ ওই ধস্তাধস্তি মারধোরের পর বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। বৃষ্টি আর বাতাসে ক্রমশ জ্ঞান ফিরে আসে। চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু আসল মালটিকে ধরতে পারেনি। তাকে মারধোর করে পালিয়েছে যমটা। তারপর মাইতি কত্তার মৃত্যু আর ঘনশ্যামের খবর শুনে দৌড়ে এসেছে সে—ছোটবাবু গ—

ওকে ভিড় ঠেলে আলু থালু বেশে ছুটে আসতে দেখে গজেন চাইল। ওর ভয় হয় কাল চিনে ফেলেছে কিনা মেয়েটা।

নরহরি ভটচায বলে—এ আবার কোন সখীরে? এ্যা—ধনার জন্যে সখীদের চক্ষে জল বইছে। আহা কেষ্ট ঠাকুর, মথুরা ছেড়ে যেতে হচ্ছে কিনা। কদম ফুঁসে ওঠে—থামো তো ঠাকুর। তুমি কি গা—খুবতো অং বং করো নামাবলী গায় দে, আর সাঁঝ বেলায় তিপ্‌লির ঘরে যাও কেনে এ্যা—

প্রকাশ্যে ওই কথা বলতে দেখে নরহরি গর্জে ওঠে—এ্যাই। যা তা বলবি না।

কদম শোনায়—যা তা লুক তোমরা, ওই ঘনাবাবু হ'ল পাপী আর তুমরা সব দেবতা, ওই মান্নাবাবু অবধি। ধরম এর বিচার করবে। ছোটবাবু গ— মেয়েটা চিৎকার করে। অনেকেরই চোখে জল নামে।

ঘনশ্যাম খুঁজছে কমলাকে। সে আসেনি। হয়তো লজ্জায় সে বের হতে পারেনি।

হঠাৎ চিৎকার ওঠে। নিশাকর ভেড়ির উপর থেকে হাঁক পাড়ে—হুঁসিয়ার। বড়বাবু, মহেশ মান্নার দল তৈরী হয়। বড়বাবু মনে হয় ওই লোকগুলো

এবার লাফিয়ে পড়বে তাদের উপর। বড়বাবু চিৎকার করে—কোম্পানি রেডি! বন্দুকধারী কনেষ্টবলরা তৈরী!

এখানে নয় দূর গাং-এ দেখা যায় ছোট ডিঙিটা এক ঝাপটায় শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, আর জলের বুক থেকে বিশাল একটা জীব, সেই লোকটাকে ধরে ফেলে মুখের মধ্যে। চীৎকারটা ভেসে আসে, তারপরই তলিয়ে যায় গাং-এর অতলে। শূন্য ডিঙিটা কাৎ হয়ে পড়ে ভেসে ভেসে চলেছে।

নিশাকর হাঁক পাড়ে—সেই শালো গো ছোটবাবু।

মহেশ মান্না—বড়বাবু ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। তীরের জনতাও অবাক হয়ে দেখছে কাণ্ডটা। কিন্তু তাদের চোখের সামনে ঘটে গেল সেটা।

গুপীনাথ বলে—করাত মাছ গো—সাঁয়া মাছ।

মহেশের ওদিকে দেখার সময় নেই। গাং-এ এমন বিপদ আপদ প্রায়ই ঘটে। তবু চলাচল বন্ধ হয় না। মরণ জেনেও এদের গাং-এ যেতে হয়।

মহেশ বলে—নে যান বাবু!

ঘনশ্যামকে ওরা গহনার নৌকায় তুলে পুলিশ পাহারায় নিয়ে চলেছে সাগর দ্বীপের থেকে সহরের থানায়।

সামনে ওই মৃত্যুদূতের আনাগোনা, এদিকে মহেশ মান্নার কঠিন অত্যাচার। আর অনাহারের দুঃস্বপ্নের মধ্যে পড়েছে জেলেপাড়ার মানুষগুলো। এই বিপদ থেকে মুক্তির পথ জানে না তারা।

মহেশ মান্না এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। দেখছে সে জেলেপাড়ার উদ্ধত মানুষদের। আজ তাদেরও সব সাহস, নির্ভর সে কেড়ে নিয়েছে। মুছে ফেলেছে ভুবন মাইতির নাম, পরিচয়। টিকে আছে ঘনশ্যাম। তাকেও একটা কায়দায় ফেলে ঘৃণ্য অপরাধে জড়িয়ে চালান করেছে। এবার তাকে আটকে দেবার জন্য পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে হবে। সে সব তার হাতেই। ওই অপরাধটাকে প্রমাণ করতে পারলে ঘনশ্যামের বেশ ক'বছর জেল হয়ে যাবে। মহেশ মান্না হবে এই দ্বীপের সবকিছুর প্রধান। সেই প্রমাণগুলোকে এবার গেঁথে তুলতে হবে। আর মামলা সাজানের কাজে মহেশ দক্ষ।

ঘনশ্যামের মামলা কোর্টে ওঠবার আগে থেকেই মহেশ কাজে নেমে পড়ে। গজেন এবার নিশাকর সর্দারকে বলে—কি গো সর্দার। ছুটবাবু তো গেল। ওদিকে ধরও গেল তোমাদের। তা সমবায় থাকবে না যাবে?

করবেটা কি?

নিশাকর ভাবছে কথাটা। ওদের করার কিছুই নেই।

রতন বলে—নিজেরাই যা পারি ধরবো সর্দার। আর ওখানে যাবো নাই।

কি করবে সেটা ওরাও জানে না। জাল কিছু বেঁচেছে, কিছু ফেঁসে গেছে। নাইনলের জাল। আগুন ঠেকতেই পুড়ে গেছে। ওদের সামনে অনাহার, ছেলেগুলো শুকনো মুখে গাং-এর ধারে ঘোরে।

নিশাকর বলে—ঠাণ্ডা মাতায় ভাব রতনা। ইখন মাথার ওপর ভগমান ছাড়া কেউ নাই।

ফটিক গর্জে ওঠে—শালো ভগমানের পাছায় লাথি মারি। ভগমান আর নাই গ! নালি এইসব কাণ্ড ঘটিয়েও কুন বিচার হবে নাই।

গজেন তবু বলে—ছাখ ভেবে চিন্তে। যা হবার হয়ে গেছে। এমন নটঘট হয়ই। তাই বলে কাজ কারবার বন্ধ থাকবে কেন? নিশাকর চুপকরে কি ভাবছে।

বালিচরে রোদ ম্লান হয়ে আসে। পেটের নাড়িগুলো পাক দেয়। জলা-ভূমিতে জাল টেনে কচি বাচ্চাগুলো কিছু মাছ পেয়েছে, তাই পোড়াবার আয়োজন করছে। ওই ওদের আহার্য আজ।

গজেন কেন মহেশ মান্নাও ভেবেছিল জেলেরা আবার তার কাছেই আসবে। গজেনকে তাই পাঠিয়েছিল। গজেনরাও চায় আড়ত চালু হোক, নাহলে তাদেরই লোকসান। কিন্তু তেমন কোন কথা পায়নি উল্‌টে দেখেছে অনেকেই তাকে অন্য চোখে দেখে। কদম এগিয়ে এসে বলে—তুমার কাঁধে, গালে কিসের আঁচড় গ?

একটু চমকে ওঠে গজেন। রাতের অন্ধকারে কার দুটো হাত তাকে আটকাতে চেয়েছিল। গজেন বলে—আর বলিসনি। একটা বেড়াল বেকায়দায় পেয়ে আঁচড়ালো রে—

কদম কথা বলে না। দেখছে সে। গজেনের গলায় এতকালের সোনার তাবিজটাও নেই। চমকে ওঠে মেয়েটা!

চুপ করে গেল। গজেন বলে—তাহলে তোরা ভেবে ছাখ, যদি রাজী থাকিস, ঘর ঝুপড়ি বানাতে কাঠ খড় পাবি, খোরাকি ধান—

ফটিক কি ভাবছে।

নিশাকর বলে—শলা করে দেখি, পরে জানাবো।

মহেশ মান্নার চালটা অন্যদিকে চলেছে। নটবর এর আগে চাষী জেলেদের নিয়ে আন্দোলন করতো। তার ঘরের দেওয়ালে যেন নানা নীতির, পাথর মুখোস দু' একটা টাঙানো থাকে। দরকার মত সেই মুখোস পরে সে নেমে যায় আসরে।

নিশাকর—রতনরা এসেছে ব্লক অপিসে। বাবুরা কর্মব্যস্ত। ওদের কথা

শোনার অবকাশ নেই। কোন রকমে মরীয়া হয়ে নিশাকর বি-ডি-ওর ঘরে ঢুকতে চাইলেন তিনি।

—কি চাই?

নিশাকর, রতনরা হাঁউমাউ করে ওঠে—বাঁচান স্যার। ক'দিন আগে সাগর দ্বীপের জেলেবসতিতে আগুন লেগে সর্বস্ব গ্যাছে আমাদের। ঘর নাই, খাবার নাই, জাল নাই—

বি-ডি-ও সাহেব তখন নেতাদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। কোথায় টেষ্ট রিলিফের টাকায় রাস্তা হবে—দুতিনটে। তার ঠিকাদারও এসেছে। এখন তাঁর কি আসবে হাতে—সেই সব হিসাব নিকাশের আলোচনা হচ্ছে—এসময় ওই লোকগুলোকে এসে গোলমাল করতে দেখে বলেন।

—দরখাস্ত করো, ওখানের অঞ্চল প্রধানকে দিয়ে লিখিয়ে আনো, তারপর সদরে পাঠাতে হবে। স্যাংশ্যান হলে তখন কিছু সাহায্যের কথা ভাবা যাবে।

অবাক হয় নিশাকর।

তাদের অঞ্চল প্রধান কন্দর্প মাহাতো। সে মহেশবাবুর কথায় ওঠে বসে। ওসব সে লিখে দেবে না। তাছাড়া এত কাঠ খড় পুড়িয়ে কি পাবে কবে পাবে তাও জানে না। তবু অনুনয় করে নিশাকর—বাবু, কিছু একটা বিহিত করেন। এতগুলোন লোক—বাচ্চা বাচ্চা নে কি করি আমরা?

বি-ডি-ও সাহেব বলেন কড়া স্বরে—যা বল্লাম করো গো। নাহলে আমাদের কোন হাত নাই।

বড়বাবুও বলে—যাও এখন। আমাদের কাজে বাধা দিও না।।

বের হয়ে আসছে তারা হতাশ হয়ে। এমন সময় নটবর মাষ্টারকে দেখে চাইল। নটবর মাষ্টার দ্বীপের ইস্কুলের মাষ্টার। কিন্তু সে মাষ্টারী ছাড়া অনেক কিছুই করে। নটবর বলে—কোথায় এসেছিলে সর্দার? ওই সাহেবের কাছে সাহায্যের জন্যে? ঘাড় নাড়ে নিশাকর।

নটবর শুধোয়—কিছু হল?

ঘাড় নাড়ে ওরা। নটবরও জানে সোজা পথে এখানে কিছুই হয় না। তাই তারও কিছু রোজকার হয়। দ্বীপের অনেক চাষীদের কৃষিঋণ, সারের পারমিট, পাম্প কেনার টাকা, দোকানদারদের চিনি-আটার পারমিট এসবের দরখাস্ত নিয়ে সেইই যাতায়াত করে। আর নগদ প্রণামী দিয়ে করিয়ে নিজেও বেশ রোজকার করে! সেটা গোপন পথের ব্যাপার। ইদানীং ওই সব অপিস টপিস হয়ে মানুষকে পদে পদে পারমিট-এর যাঁতাকলে ফেলে এক শ্রেণীর বেশ কিছু রোজগার হয় গোপনে। আর প্রকাশ্যে ওই রোজকার যারা করে তারা জাহির করে সমাজের লোকদের সেবা করছি। নটবর মাষ্টার

সেই সমাজসেবীদের তকমা পরে মাষ্টারিটা কায়েম রেখেছে। জনদরদী সেজেছে। নটবরও হিসাব করে নেয় এদের সাহায্যের অঙ্কটা। তার কি থাকবে তাও ভেবে নেয়। বলে সে—আহা! বুঝলে সর্দার, এই বি-ডি-ও সাহেব মায় সরকার অবধি তেলা মাথায় তেল ঢালে। তোমাদের সত্যিই বিপদ এসময় কিছু করা দরকার।

রতন দেখছে মাষ্টারকে। নিশাকরও একজন দরদী লোকের সন্ধান পেয়েছে। বলে সে—

—তোমরা চলো ঘরে, দরখাস্ত আমি লিখে দিই অঞ্চল প্রধানের সই করি নে আসবো। দরকার হয় সর্দার নিজে নে যাবো, তোমাদের সাহায্য করতেই হবে। আমি দেখছি।

ভরসা পায় নিশাকর। রতন বলে—তাই করেন মাষ্টারবাবু, নালি না খাই মরতি হবে মোদের।

নটবর তখুনিই ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে জব্বর একখানা দরখাস্ত লিখে ওদের শোনায়।

ঠিক আছে?

নিশাকর খুশী হয়—হ্যাঁ বাবু।

মহেশ মান্না গজেনের মুখে খবরটা শুনে হতাশ হয়। গজেন বলে—জেলেরা রাজী লয়। শালারা ভাঙবে তবু মচকাবে না। মহেশ মান্নার আড়ত বন্ধ। রোজগারও হয় বেশ ওর থেকে, সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। বলে সে—দেখা যাক! তবে খবর রাখিস ওরা মদনের ওখানে যায় কিনা? ব্যাটাদের আটকাতি হবে।

গজেন বলে—ক'দিন সবুর করেন বাবু, ব্যাটারা যাবে কোথায়? আরও জেলে আসতি চায় ধবলাট, কচুবেড়িয়া, প্রতাপনগরের দিক থেকি, তাদের নিই আড়ত খুলি। দেখবেন ওরাও আসতি পথ পাবে না।

কথাটা ভাবছে মহেশ মান্না। ইদানীং সাগরদ্বীপ ছাড়াও এবার নিজেই বাদাবনের আর গভীরে নোতুন একটা দ্বীপ-এর পত্তন নিয়ে সেখানে বসতি করিয়ে কিছু জমি হাসিল করাচ্ছে। লোকের তার দরকার। মহেশ মান্না এমনি করে নিজের অধিকার কায়েম করতে চায়। সেই নোনা আবাদের নাম রেখেছে মহেশগঞ্জ।

একটার পর একটা দ্বীপকে গ্রাস করবে সে। সাগরদ্বীপের প্রতিষ্ঠা তার কায়েম হয়ে গেছে। একটু বাকী। তাই গোবিন্দ মোক্তারকে দেখে শুধোয়

—মামলার দিনগুলো দেখেছো মোক্তার।

ইদানীং বিষয় আশয় নিয়ে মামলা বাড়ছে, হাতে হাতে ঘনশ্যামের মামলাও রয়েছে। গোবিন্দ মোক্তারকে তাই এখানের সেরেস্তায় রেখেছে। লোকটা বেশ চালু, আর দেওয়ানীই নয় ফৌজদারী মামলাগুলোও বেশ বোঝে।

গোবিন্দ বলে—ঘনশ্যামের মামলাটা নে একটু সাক্ষীটাক্ষীদের তালিম দিতে হবে বাবু। ফৌজদারী মামলা জানেন তো—আসামী থেকে ফেরারি হওয়া আরও ঠ্যালার। মামলা প্রমাণ করাতি হবে।

মহেশ মান্না মাথা নাড়ে—হবে হে মোক্তার। মূল সাক্ষী ত' হাতেই আছে। রিপোর্ট যা যা দিয়েছে পুলিশ সেই দৃষ্টে তৈরী করিয়ে নিতে হবে। ঠিক আছে—দেখছি। আর গজেন, ওই জেলেদের নিয়ে ছোট করে আড়ত খোল। নাহলে বদনাম হবে। তারপর, দ্যাখ নিশাকররা আসে কিনা। নালে ব্যাটাদের এবার উৎখাত করে দেব ওই বসতি থেকে। ও জায়গার দখল নে গুদাম বানানো বলে দিবি।

সাগরদ্বীপের শান্ত জীবন আবার নিজের গতিতেই চলেছে। রমণ ডাক্তারের ডাক্তারখানায় বৈঠক বসে। হাটের ব্যাপারীরা আসে খেয়া পার হয়ে, বাজার বসে। আবার দিন শেষের খেয়ায় ফিরে যায় তারা। গাং-এর বুকে তুফান আসে জোয়ারের সাথে, ফিরে যায় ভাটার টানে। কোন গতিতেই বাধা পড়েনি। শুধু এখানের জীবন থেকে একজন সরে গেছে।

বসন্ত পারঘাটায় বসে পারানি আদায় করছে। ইদানীং সে বুঝেছে এখন মহেশ মান্নার দরকারী লোক সে। সকালে বাজরাওয়ালাদের কাছে থেকে পারানীর পয়সা ছাড়াও তরিতরকারী, মাছ-এর তোলা আদায় করে, নগদও কিছু মেলে।

হঠাৎ মহেশ মান্নাকে গোবিন্দ মোক্তারের সঙ্গে আসতে দেখে চাইল। আপ্যায়ন করে—আসুন মান্নাবাবু হঠাৎ—

মহেশ বলে—একটু দরকারে এলাম বসন্ত। ওহে মধু, তুই ঘাটে থাক। একটু বাড়িতে চলো বসন্ত। কথা আছে।

বসন্ত অবাক হয় মহেশবাবুকে ওভাবে কথা বলতে দেখে। কি এমন দরকার থাকতে পারে জানেনা সে। মহেশ ওকে চেয়ে থাকতে দেখে বলে—অবশ্যি আজ না গেলেও চলবে। তুমি যদি এসব ভার নিতে পারো আমার যাওয়া লাগবে না। মোক্তারবাবু, কি করতে হবে বুঝিয়ে বলে দাও বসন্তকে। আমি বরং একটু দেখে আসি নোতুন আড়ত খুলেছে ওদিকে। গোবিন্দ

মোক্তার বলে—ওসব বুঝিয়ে বলছি বসন্তকে। আপনাকে লাগবে না। দরকার হয় কমলাকেই আমিও বলে আসবো।

কমলা ওই ঘটনার পর স্তব্ধ হয়ে গেছে। দামাল হাসিখুশি মেয়েটি একেবারে বদলে গেছে। ক্রমশ ভেবেছে কথাটা। সেই দুঃস্বপ্নের রাতের ঘটনাটাকে সে ভুলতে চায়, কিন্তু পারে না। মহেশ মামার দানবের মত মুখখানা যেন কি পৈশাচিক বিভীষিকা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ওর শক্ত হাতের মুঠোয় ওর দেহটা, নরম বুক—তার মসৃণ উরুতে গরম সিসের মত স্পর্শটাকে ভোলেনি সে। ঘুমের ঘোরে রাত্রির অন্ধকারে অস্পষ্ট ভাষায় আর্তনাদ করে ওঠে।

—কমল। ওরে কমল।

মায়ের ডাকে ধড়মড়িয়ে ওঠে। বাসিনী মেয়ের এই আতঙ্কের কারণটা জানে। মেয়েকে কাছে টেনে নেয়—কি রে।

কমলা ভীত চকিত চাহনিতে অন্ধকার ঘরের চারিদিক দেখছে, তখনও মনে হয় সেই শয়তানটা যেন কোথায় এসে ঢুকে আছে। নিশ্চিত হয়ে বলে সে—কি যেন স্বপ্ন দেখছিলাম মা। বাসিনী মেয়েকে কাছে টেনে নেয়।

কমলা বের হতে চায় না। মা বলে—একটু ঘুরে আয়।

কমলা চুপ করে থাকে। মনে হয় তার জন্যই ঘনশ্যাম আজ ঘৃণ্য মিথ্যা অপরাধে হাজতে রয়েছে। মহেশ মামা কলকাঠি নেড়ে তাকে জামিন দেওয়ায় নি।

কমলা মনে মনে গুমরে ওঠে। সারাদিন ঘরে মন টেকে না। বের হয়েও শান্তি নেই। কমলা নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে, মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা, ঘনশ্যাম যেন সারা বালুচরে, ঝাউবনে আজ মিশিয়ে আছে। দূরে দেখা যায় ঘনশ্যামের নৌকাটা, আজ ওটাও যেন তার মতই কূলহীন নদীর তীরে পড়ে আছে। হাওয়া বয়, হাহাকার ওঠে ঝাউবনে।

একাই চলেছে কমলা। ওদিকে গঞ্জে যেতে মন চায় না। পিসীর ওখানেও যায়নি। দুঃসহ লজ্জা বোধ হয়। মহেশ মামার সব নীচতা—পাপের কালিমায় ওরা ঘনশ্যামের মুখখানাকে কালো করে দিয়েছে। আর তার জন্য দায়ী কমলাই।

বর্ষার মেঘগুলো মুছে মুছে যাচ্ছে। ঝাউবনের রং-এ এসেছে ঘন সবুজ আভা। গাংচিলগুলো ছোঁ মেরে মাছ ধরছে। শান্ত সবুজ পরিবেশে কমলা নিজেকে যেন ফিরে পায়।

—এ মাঝি। তুই।

কমলা চমকে ওঠে সামনে অযোধ্যাপ্রসাদজীকে দেখে। মন্দিরের পুরোহিত, ওদিকে কিছু জমিতে ধান কাটা চলছে, তারই তদারক করে ফিরছে। নীল সমুদ্রের বুকে সাদা একটি পবিত্রতার স্বরূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটা।

অযোধ্যাপ্রসাদকে দেখে কি লজ্জায় বেদনায় কেঁদে ফেলে কমলা। অযোধ্যাপ্রসাদ ওদের দুজনকেই দেখছে এখানে। ঘনশ্যাম সেবার কুমীরটাকে মারতে অযোধ্যাপ্রসাদ ওকে জড়িয়ে ধরে বলে—তুতো ঘনশ্যাম, কিষণ মহারাজ রে, তার মতোই কালীয় নাগকে দমন করলি। কি রে মাঝি?

অযোধ্যাপ্রসাদ সবই শুনেছে। তার যুক্তিবাদী মন দিয়ে সে বিশ্বাস করে এর মূলে কোন সত্যি নেই। কোথায় একটা মিথ্যা চক্রান্তে জড়ানো হয়েছে ঘনশ্যামকে।

আজ কমলাকে দেখে বলে—বো মৎ বেটি। চল—মন্দিরে চল। গঙ্গা মাঝি—কপিল মুনিকে প্রণাম করে যাবি। শান্তি পাবি মনমে।

কমলা আজ এই একটি লোককে বিশ্বাস করে। জোয়ারের জল তীর ভূমি ছাপিয়ে এসে মন্দিরের চাতালে ঠেকেছে। ঢেউ-এর গর্জন ওঠে বাতাসে। এরপর মাটি আর নেই—দিগন্তপ্রসারী সমুদ্র।

কমলা বলে চলেছে অযোধ্যাপ্রসাদকে সেই রাতের ঘটনাটা। মাকে ছাড়া আর কাউকে সে জানাতে পারেনি। বাবা কোন কথাই শুনতে চায় নি। সে মহেশ মান্নার সব কথা মেনে নিয়ে গর্জায়—ঘনাকে জেলে পাঠাবো।

কিন্তু তা সত্যি নয়। অযোধ্যাপ্রসাদ চুপ করে কি ভাবছে।

কমলা বলে—ঘনশ্যাম দোষী নয় ঠাকুর। সে আমাকেই বাঁচাতে এসেছিল। সেদিন ও না এসে পড়লে ওই শয়তানটা আমার সর্বনাশ করতো। এখন তাকেই ওই মহেশ মান্না দোষী সাজিয়ে শাস্তি দিতে চায়।

অযোধ্যাপ্রসাদ বলে—এ তীরথ ভূমি মা। কত যুগ আগে ভগীরথ এখানে এনেছিল গঙ্গার অমৃত ধারা, সত্যের আলো। তুই সত্য কথাই বলবি মাঝি। যা যা ঘটেছে তাই বলবি, ঘনশ্যাম খালাস হয়ে যাবে উ কোন গলদ কাম্ করেনি।

কমলা যেন পথের সন্ধান পায়। সে প্রকাশ্যে এই কথাই বলবে সকলের সামনে। ঘনশ্যামের জন্ম তাকে বাঁচাবার জন্য কমলা এই পথই নেবে। মনটা অনেক হাল্কা হয়ে যায়। জোর পায় মনে মনে।

অযোধ্যাপ্রসাদ বলে—এই সত্যই সবসে বড় মাঝি।

সাচ্ বরাবর তপ্, নেহি ঝুট বরাবর পাপ।
যাকে হৃদে সাচ্ হ্যায়, তাঁকে হৃদে আপ।

সত্যই জীবনে সবসে বড় তপস্যা, মিথ্যা সবচেয়ে বড় পাপ। যার অন্তরে সত্য তার অন্তরেই ভগবান মায়ি। সেইই ভগবানকে বিশ্বাস করে, তার উপর ভরোসা রেখে সার সার সব বলবি মায়ি।

ফিরছে কমলা। মনে হয় ওই মন্দিরের অস্তিত্বটা তার মনের অতলেও একটি বিশ্বাস এনেছে, নির্ভর এনেছে।

—দিদি।

কমলা চমকে ওঠে কদমকে দেখে। কদম গাং-এর ধারে কাঁকড়া ধরছিল। চেহারাও ক'দিনে খারাপ হয়ে গেছে। কপালে সেই রাতে অদৃশ্য জানোয়ারটার আঘাতের চিহ্ন। ওদিকে জেলেপাড়ার মানুষগুলোকে দেখেছে। জাল ছেঁড়া —নৌকাগুলো কিছু ভাসেনি, ওরা ঝাউবনে কাঠ কুটো এনে ছেঁড়া তালাই চট চাপিয়ে কোন রকমে ঝুপড়ি বানাচ্ছে।

কেমন আছিস কদম?

কদম বলে—আর কেমন। সারা জেলেপাড়ার মানুষের অন্ন নাই—ঘর নাই। ছোটবাবুর মামলার কি হ'ল দিদি? তোমাকে নাকি সাক্ষী মানছে ছোটবাবু, বলছিল অঘোর কাকা?

কমলাও জানে।

কদম বলে—এতগুলো মানুষের জন্যে, ঘনাবাবুকে ফিরাই আসতি হবে দিদি। ঘনাবাবু উ কাম করতি পারে না।

কমলা বলে, আজ আমি সেই কথাই বলবো রে। বিনাদোষে একটা ভালো মানুষের এতবড় বদনাম কেনে হবে।

কদমের শীর্ণমুখে হাসি ফুটে ওঠে—তা জানি দিদি। নিশাকর খুড়োও বলছিল, কমলাদিদি সব সত্যি বলবে। দেখিস—দোষী কে? ওই মান্না হারামজাদাই?

কমলার মন চায় পিসীকে দেখতে যেতে, সেই বিপদের পর আর যেতে পারেনি সে। আজ মনে হয় তার যাওয়া দরকার। পিসীকে এই আশ্বাস তাকে দিতে হবে।

সারা বাড়িটা আজ প্রাণহীন হয়ে গেছে। বাইরের ঘরটায় ভুবন মাইতি বসতো। একদিন দ্বীপের সব মানুষ এসেছে এখানে তাদের বিপদ আপদে, আজ কেউ নেই। স্তব্ধ পাচীলগুলো যেন এ-বাড়ির একটা নিঃস্বতার মর্ম বেদনাকে কোন রকমে আগলে রেখেছে। অঘোর সরকার ক'দিন জামিনের

জন্য দৌড়াদৌড়ি করে বুঝেছে, মহেশ মান্না টাকার জোরে সব দিকের পথই বন্ধ করেছে, ফলে জামিন হয় নি, ঘনশ্যামকে জেল হাজতেই থাকতে হয়েছে।

গিরিবালা সব শুনে চোখের জল ফেলে। বলে সে—তাহলে কি হবে অঘোর দাদা?

অঘোর সরকার বলে—উকিল দিয়েছি দিদি, কোর্টে মামলা উঠবে এবার।

গিরিবালা বুঝেছে কোথায় একটা কালো হাত তাদের ঘনশ্যামকে আটকে রাখতে চায়। সবই প্রায় গেছে। এখন কিছু জমি রয়েছে। গিরিবালা বলে—সবইতো নেছে মহেশ, আর ঘনাকে নিয়ে টানাটানি কেন? ওটুকুকে ছেড়ে দিক। তুমি না পারো, আমি গে ওকে বলবো সরকার। অঘোর চাইল ওর দিকে। অবুঝ মহিলা জানে না আইনের মার প্যাচ।

এখন মামলা জোর সাজিয়েছে মহেশ। আর ঘনশ্যামের উকিলবাবুও বলেন—বড় বিশ্রী চার্জ এনেছে অঘোরবাবু, প্রমাণ করতে পারলে জেল বাঁচানো যাবে না। এ সুযোগ মহেশ মান্না ছাড়বে না।

সরকার বলে—ওসব করেও কিছু হবে না দিদি। এখন যদি কমলা সত্য কথা বলে, তাহলেই ঘনশ্যাম খালাস পাবে।

গিরিবালা ভাবছে। ক'দিন কমলা আর আসেনি—আর কমলার বাবা এখন মহেশ মান্নার হাতের লোক। তাকেও পাওয়া যাবে না।

গিরিবালা বলে—তবু বসন্ত এতকাল দাদার আশ্রয়ে ছিল। কমলাও চেনে ঘনশ্যামকে। তারা কি এটুকু করবে না? আমি জানি দাদা, ঘনশ্যাম একাজ করেনি। করতে পারে না। এমনি করে দিনকে রাত করবে মহেশ?

চুপ করে কি ভাবছে অঘোর। হঠাৎ কাকে দেখে চাইল।

গিরিবালাও অবাক হয়—ওমা তুই। কমলা। আয় বাছা। ওরে আজ বাড়ি শূন্যি হই গেছে, পাশে কেউ নাই। তোরাও ভুলি গেলি এই অনাথারে; দুচোখে জল নামে পিসীর।

ভুবন মাইতি নেই—ঘনশ্যামও হাজতে। সারা বাড়িটায় ছড়িয়ে আছে অনেক দিন, অনেক মুহূর্ত—স্মৃতি। এবাড়িরই যেন একজন হয়ে গেছল সে। আজ তাকেই উপলক্ষ্য করে এবাড়িতে নেমে এসেছে চরম সর্বনাশ।

কমলা এই সর্বনাশ থেকে এদের বাঁচাবে। বাঁচাতেই হবে। কমলা বলে—মামলার দিন তো এগিয়ে এল কাকা।

অঘোর জানায়—হ্যাঁ মা। এখন তোমার উপরই সবকিছু নির্ভর করছে।

কমলা আজ ভেবেছে। সে জানায়—আমি সত্যি কথাই বলবো পিসী। ঘনাদা এসব কাজ করেনি। ও না এলে আমাকেই শেষ করতো শয়তানটা। আমার মান ইজ্জৎ বাঁচিয়েছে ঘনশ্যামদা, আজ তার মান সম্মান আমাকেই বাঁচাতে হবে পিসী। তাকে বলে দিও কাকা—আমি আদালতে দাঁড়িয়ে সেই কথাই বলবো। অঘোর নিশ্চিন্ত হয়। বলে সে—বাঁচালে মা। ঘনশ্যামকে আমি বলবো তোমার কথা।

গিরিবালা ওকে কাছে টেনে নেয়। বলে সে—ঘনশ্যাম কেন, এ-বাড়ির মান সম্মান তোর হাতে মা। এত মানুষের ভাত ভিত-এর ভারও তোর উপর। তুই একথা বলবি তা জানিবে।

কমলা আজ নিজেকে তৈরী করেছে মনে মনে। তার জন্য যদি ওবাড়ি থেকে সরে আসতে হয়, জানে এখানে তার ঠাঁই হবেই।

ঘনশ্যাম তাকে ফেলতে পারবে না। আজ সেই পথই নেবে সে।

গোবিন্দ মোক্তার এসেছে বসন্তকে নিয়ে ওর বাড়িতে।

বসন্ত হাঁক ডাক করে—ওগো। চা করো। আর কমল আছে। তাকে ডেকে দাও। মোক্তারবাবু এসেছেন—সামনে মামলার দিন। কোর্ট ঘরে তো যেতে হবে। সব বুঝে পড়ে নিক। হ্যাঁ—টাকাগুলো রাখো। বসন্ত স্ত্রীর দিকে কিছু টাকা এগিয়ে দেয়। পারঘাটের এখন রমরমা চলছে। বসন্ত প্রতিদিনই একটা মাটির ভাড় খুচরো সিকি—টাকা সরায়, সেগুলো নিজেদের মধ্যে বখরা করে নেয়। গজেনও বখরা পায়। দিয়ে থুয়ে যা থাকে তা মন্দ নয়। বসন্ত বলে টাকাগুলো রাখো, গঞ্জের ওদিকের মাঠে পাঁচ বিঘে ভালো ধানজমির বায়না করেছি, বাকী টাকা সামনের মাসে মিটিয়ে দিতে হবে। তারপর আর খোরাকির চালের জন্যে ভাবতি হবেনা। স্বপ্ন দেখছে বসন্ত আজ। জমি—টাকার স্বপ্ন।

বাসিনীর এটাকা হাত পেতে নিতে কেমন বাধো বাধো ঠেকে। এর আগে পণ্ডিতি করে যা পেতো তা সামান্যই। কিন্তু সেটা নিতে বাধেনি তার। আজ বাসিনীর মনে হয় কোথায় একটা অন্ধকার চক্রেই জড়িয়ে পড়েছে লোকটা তার মুখ চোখের শুচিতা নেই—এসেছে কাঠিন্য।

বসন্তও দেখেছে স্ত্রীর এই পরিবর্তন। বলে সে—রাখো টাকাটা। আরে বাবা মা লক্ষী চঞ্চলা, তানাকে বেঁধে রাখতে হয়। যা করার এই বেলা করে নাও। মায়াবাবুর দয়ায় তবু দুমুঠো জুটেছে—কই গেল কমলা।

এ্যাই যে—কমলা এসেছে সামনে। বসন্ত বলে—মুখ বুজে থাকলে চলবে?

এখন সামনে বৃহৎ কাজ। চল্, ওকে নিয়ে যায় বসন্ত।

বাসিনীর ব্যাপারটা ভালো লাগেনা। সেও ওপাশের জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল্লো।

গোবিন্দ মোক্তার সাক্ষী পড়াতে ওস্তাদ। সে বলে চলেছে—বুঝলে কমলা, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চলফ্ পড়তে হবে? ওসব কিছু না। যা বলবে তাই আওড়ে যাবে। তারপরই আসল কথা। ঘনশ্যামবাবু এসে রাতের অন্ধকারে তোমাকে ইয়ে মানে আক্রমণ করেছিল। তুমি একা—বাড়িতে বাবা মা নেই, তুমি চিৎকার করছো, এমন সময় মহেশবাবু এসে তোমাকে ওর হাত থেকে বাঁচাতে গেলেন আর ওই ঘনশ্যাম দা দিয়ে ওকে কাটতে গেল।

বসন্ত বলে—হ্যাঁ। স্রেফ এই কথাই বলবি। তাহলেই ঘনশ্যামের জেল—

কমলা চমকে উঠেছে। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাই বলতে হবে তাকে। অযোধ্যাপ্রসাদের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে গিরিপিসীর চোখের জল। সেই রাত্রের বীভৎস আক্রমণ। সেই দানবটার কোন শাস্তি হবে না। শাস্তি হবে তার যে লোকটা তাকে বাঁচাতে এসেছিল।

কমলা বলে ওঠে—না।

চমকে ওঠে গোবিন্দ মোক্তার—সেকি।

কমলা বলে—যা সত্যি ঘটেছিল তাই বলবো। ওই মামাবাবুই আমাকে আক্রমণ করেছিল, ঘনাবাবুই বাঁচালো আমায় ওর হাত থেকে। দোষী মহেশ মান্না। ঘনাবাবু নয়।

বসন্ত গর্জে ওঠে—মুখ ভেঙে দেব এক লাথিতে।

গোবিন্দ মোক্তার থামায় ওকে—আহা। থামো বসন্ত। ওকে বুঝতে দাও। বুঝিয়ে বলো। ওসব কথা বল্লে মামাবাবুর বিপদ হবে। জেনেশুনে তা করা যাবে না।

কমলা রুখে ওঠে—যা ঘটেছে তাই বলবো। তাতে যার যা হয় হবে। আজ বাঁচাতে হবে ওই মামাকে, কই সেই রাতে একটা অসহায় মেয়ের ধর্ম নষ্ট করতে এল তখন কোথায় ছিলে বাবা? আজ মনে হয় এসবের মূলে তুমিই। তুমিই জেনেশুনে এসব সয়ে গেছো।

—খবরদার। বসন্ত গর্জে ওঠে।

গোবিন্দ মোক্তার হতাশ হয়। বলে সে—এখন একথা থাক বসন্ত। তুমি একটু বুঝে দেখো কমলা, যা বল্লাম সেই কথা না বল্লে বিপদ হবে। ঠিক আছে চলি। গোবিন্দ মোক্তার চলে গেল।

বসন্ত গর্জাচ্ছে—মুখ বন্ধ করে দেব।

বাসিনী বাধা দেয়—তার চেয়ে খুন করে ফেলো মেয়েটাকে—ও বাঁচে তোমরাও বাঁচবে। ছি ছি তোকেও বলি বাছা—এত ছিল তোর অদৃষ্টে।

কমলা নিজের ঘরে চলে গেছে।

বসন্ত গজরায়—ওসব চলবে না। যা বলছি—তাই বলতে হবে।

বাসিনী অবাক হয়ে দেখছে লোকটাকে। আজ মনে হয় এত টাকা ও পায় কেন? মা হয়ে মেয়েকে তার চরম বিপদে সান্ত্বনা দিতে পারেনি। জীবনটাকেই বিশ্রী করে তুলেছে। আজ আর এক বিপর্যয়ের মুখে ফেলেছে। বাসিনী নিজেকে যেন অপরাধী মনে করে মেয়ের কাছে। শুধু বাবাকেই নয়—কমলা বোধ হয় তার সম্বন্ধেও এই সব বিশ্রী কথা চিন্তা করে।

কথাটা শুনেছে—মহেশ মান্না।

গোবিন্দ মোক্তার বলে—মেয়েটা মহা পাজি স্যার। নাম্বার ওয়ান ত্যাঁদড়। বলে কিনা যা সত্যি তাই বলবো।

মহেশ মান্না ঘাবড়ে গেছে। সত্যি কথা বললে ঘনশ্যাম নয়, ফেঁসে যাবে মহেশ মান্নাই। এ কেসে জেল অবধারিত। তার সাম্রাজ্য চলে যাবে, এ-জীবনের মত তার ঘাড়েই চেপে যাবে এতবড় বদনামের বোঝা। মহেশ এ হতে দিতে পারে না।

তার সারা মনে ঝড় ওঠে। এর আগেও এমন কাজ দু'একটা করেছে। এতবড় গাং-এ কোথায় হারিয়ে যায় মানুষ, রটে যায় গাং-এ ডুবে গেছে।

একটা মেয়েকেও সে মুছে দিতে পারে। কিন্তু তাতে আরও জড়িয়ে পড়বে সে। সাক্ষীর অভাবে ঘনশ্যামই বের হয়ে আসবে। আর তারপর ঘনশ্যাম তাকেও ছাড়বে না।

গোবিন্দ মোক্তার বলে—ওসব কথা বললে সাংঘাতিক ডেঞ্জার হবে স্যার। উল্টে শাক হয়ে যাবে। ক্লিন ব্যাম্বু।

ধমকে ওঠে মহেশ। ওসব কথা ভাবতেই পারে না সে। বলে—থামো তুমি। ওই হারামজাদি মেয়েকে দেখছি আমি। ওকে বলতে হবে যা যা বলেছো! নাহলে—

পথটা পেয়ে যায় মহেশ। একটা পথ সে পেয়েছে। এপথেই তাকে চলতে হবে। মহেশের স্বার্থ আগে। তার জন্য যা করার সে করবে।

বৈকাল নামছে জেলখানায়। ক'দিনেই ঘনশ্যাম পুলিশ থানা হয়ে এসেছে জেল হাজতে। তার জামিনের দরখাস্ত গ্রাহ্য করেনি ওরা। আদালতে গেছে। কিন্তু সেই এস-ডি-ও সাহেবকে দেখেই চমকে উঠেছে ঘনশ্যাম।

টাকওয়ালা সেই ভদ্রলোক—যার বাংলোয় আগে একদিন ঘনশ্যাম গেছল মেলার ঠিকাদারির জন্য দরবার করতে। তিনি অবশ্য তার আবেদনে কান দেননি। ঘনশ্যামেরও মেজাজের ঠিক ছিল না। রাগের বশে দু চারটে কথা শুনিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। আজ সেই ভদ্রলোকও দেখছেন তাকে। হাতে মামলার নথি। বড় দারোগা স্বয়ং সাক্ষী। দা নিয়ে খুন করতে গেছল মহেশকে। আর অন্য অভিযোগ ওই মেয়েটির সর্বনাশ করা, সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ। তবু জামিন তার হয়নি। জেলখানার উঁচু প্রাচীরের মধ্যে আটকে রেখেছে তাকে। মনে পড়ে সাগর দ্বীপের মুক্ত অবাধ পরিবেশ, ওই গাং-এর কথা। নিশাকররা কেমন আছে কে জানে? ঝাউবন—বিস্তীর্ণ বেলা-ভূমিতে আজ যাবার অধিকার তার নেই। কমলার কথা মনে পড়ে।

অঘোর সরকার এসেছে। তবু ওকে দেখে মনে হয় আপনজন। আর তার কেউ নেই এতবড় পৃথিবীতে। অন্যের জন্য করেছে সে অনেক কিছু। মদন মোহান্ত তবু আসে।

অঘোরের ডাকে চাইল। গরাদের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে অঘোর সরকার। আজ তাদের পরিবারের ওই একমাত্র আপনজন। অঘোর সরকার বলে—এত ভাবনার কিছু নাই ঘনশ্যাম। কমলা নিজে এসেছিল কাল। নামটা শুনে চাইল ঘনশ্যাম। একটি দূরের বাঁশির সুরের মত কানে আসে। ঢেউ-এ আছড়াচ্ছে লঞ্চটা—তীর থেকে ডাকছে তাকে।

অঘোর সরকার বলে—কমলা বলে গেছে আদালতে দাঁড়িয়ে সে যা সত্যি তাই বলবে। তুমি কোন দোষ করোনি, দোষী ওর মহেশ মামা। এই কথাই সে বলবে।

চমকে ওঠে ঘনশ্যাম। আজও একজন তাকে ভোলেনি, ওই সাগর দ্বীপের কমলা। আর আজ সেই পারে তাকে এতবড় বিপদ, অপবাদ থেকে বাঁচাতে।

অঘোর সরকার বলে—এই দিন আদালতে ওই কথা বললে মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে, তাই বললেন উকিলবাবু।

—তাই নাকি! ঘনশ্যাম ভাবতেই পারে না সে আবার মুক্তি পাবে, ফিরে পাবে তার হারানো সুনাম। আবার ফিরে যাবে গঞ্জে। সেই লঞ্চ নিয়ে উধাও হবে দূর গাং-এ জেলেদের সঙ্গে। রাত্রি নামবে—তারা জলা রাত্রি। বর্ষা শেষ হয়েছে। আসছে শরতের হাওয়া। জেলখানার মধ্যে কোথায় ঘাসবনে অজান্তে কাশ জন্মেছে। ছোট্ট সাদা ফুলকোগুলো এসেছে। ওরা ঘনশ্যামের মনে এনেছে সুদূরে হারিয়ে যাবার ডাক।

অঘোর সরকার বলে—এ মামলা ডিসমিস হলে ওই মহেশের নামেই

মানহানির মামলা রুজু করবো।

ঘনশ্যামের মনে ওসব ভাবনা নেই। সে জানে কি করে এর জবাব দিতে হয়। বলে সে—ওসব ভেবে লাভ নাই কাকা। মামলা মিটে যাক। খালাস হই—আবার কাজকর্ম শুরু করবো। আর একটা কাজ আছে—

চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই দিনের দেখা হাঙরটা, বিশাল—বিরাট। তার মুখখানাও তেমনি। এর মধ্যে হয়তো গাং-এ আরও মানুষ মেরেছে, নৌকা ডুবিয়েছে। সেটাকেই মারতে হবে। হঠাৎ মনে হয় ওই হাঙরটার মুখখানার সঙ্গে মহেশের মুখের দারুণ মিল আছে। দুজনের স্বভাবও এক রকমের। হাঙর ওরা। একজন জলের রাজ্যে মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে, যা পাবে তাই গিলবে। অন্যজন ডাঙাতেই সেই নিষ্ঠুরতম পরিচয়েই বিরাজমান। সকলের সবকিছু লুঠ করে—শেষ করে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে চায়। একজন জলে এনেছে আতঙ্ক—মৃত্যু, এই মহেশ এনেছে সাগর দ্বীপে আতঙ্ক, আর মৃত্যুর ছায়া। কি অজানা শপথে ঘনশ্যামের হাত দুটো কঠিন হয়ে ওঠে। মুক্তি চাই তার। এই হাঙরদের মোকাবিলা করার জন্যই বাইরে যেতে হবে তাকে।

বলে সে—কমলা বলবে তো এসব কাকা। তাকে আমার নাম করে বলো, আমি বলেছি। তার এ উপকারের কথা জীবনে ভুলবো না।

অঘোর সরকার আশ্বাস দেয়—নিশ্চিন্ত থাকো ঘনশ্যাম, সে নিজে এসে আমাদের বলে গেছে। তোমার পিসীকেও বলেছে।

—টাইম হো গিয়া বাবুজী! ব্যস।

পিছনে পাহারাওয়ালার ডাকে চাইল অঘোর। তার দেখা করার সময় শেষ হয়েছে। অঘোর বলে—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো ঘনশ্যাম।

ঘনশ্যাম খুশী মনে ওর ওয়ার্ডের দিকে ফিরছে। দুতিনজন কয়েদী ওদিকে জল তুলছে, রাতের রান্নার জন্যে। ঘনশ্যামকে তারা চেনে। শুনেছে ঘনশ্যামের কেসের কথাও।

তাদেরই একজন হরিহর বলে—দেখা হল ছোটবাবু? মামলার কিছু শুনলেন?

ঘনশ্যাম বলে—দেখা যাক। দিনতো সামনের সপ্তাহেই। কি বিচার হয় দেখা যাবে।

জগদীশও কোন মহাজনকে মেরে ফৌজদারী কেসে আড়াই বছরের মেয়াদ খাটছে।

ও বলে—দুনিয়া বড় খারাপ জাগা বাবু। কুন শালোর কতায় ভরসা নাই।

তবু ঘনশ্যাম ওদের কথা বিশ্বাস করে না ও জানে কমলা তাকে বাঁচাবার জন্ত সত্যি কথাই বলবে।

মহেশ মান্না তৈরী হয়েই এসেছে সন্ধ্যার মুখে। বসন্ত ভাবেন আজই মান্নাবাবু এসে হাজির হবে এবেলায়। সারাদিন বসন্ত বকেছে। সংসারে শুধু অশান্তিই বেড়েছে। কমলাও সারাদিন খায়নি। বাসিনীও মেয়েকে ফেলে খেতে পারেনি। আজ বাসিনীর মনে হয় এতটুকু জায়গা থাকলে সে চলেই যেতো এখান থেকে মেয়েকে নিয়ে। এতবড় মিথ্যা বলার প্রশ্ন থাকতো না। আজ বাসিনীও স্তব্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ মহেশ মান্নাকে দেখে বসন্ত অবাক হয়—আসুন কত্তাবাবু! বসন্তের মনে হয় গোবিন্দ মোক্তার সাতখানা করে যা তা লাগিয়েছে তাই নিজেই এসেছে মান্নাবাবু। আজ বোধ হয় তার চাকরীও খতম করে যাবে। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে মোড়াটা এগিয়ে দেয়।

মহেশ বলে—একটু দরকারে এলাম বসন্ত। মানে কাল মামলার তারিখ—যেতে হবে। তা গোবিন্দ কি সব বলে গেছে কমলাকে, বেচারা ঘাবড়ে গেছে।

বসন্ত মনে মনে একটু আশ্বস্ত হয়। বলে সে—ছেলে মানুষ। কোর্ট কোর্ট তো যায়নি এখনও। তাই—

মহেশ হাসে তা জানি। তাই তো নিজে এলাম। ওকে একটু ডেকে দাও।

কমলার সাবধানী মন বুঝেছে লোকটা কেন এসেছে। একদিন রাত্রে ওই শয়তানটা এসেছিল তার সর্বস্ব লুঠে নিতে, আজও এসেছে তেমনি কোন মতলবে। তবু ওদের চিনেছে কমলা। তাই সাহস ভরেই এগিয়ে আসে। জেনেছে সে এই দ্বীপে মান-সম্মান নিয়ে বাঁচতে গেলে ঘনশ্যামকে ফিরিয়ে আনতে হবে, না হলে মহেশ মান্না তাকে ছেড়ে দেবে না। আর ওর আক্রমণ থেকে বসন্ত তার বাবা হয়েও তাকে বাঁচাবে না, বাঁচাতে পারবে না। মুখ বুজে কমলা এসে দাঁড়িয়েছে।

মহেশ বলে চলেছে—গোবিন্দ মোক্তার যা বলেছে সেই মত বলবে আদালতে হুজুরের সামনে।

কমলা লোকটাকে দেখছে। সেই রাতের স্বরূপটাকে ভোলেনি সে। কমলা বলে আমি যা সত্যি তাই বলবো।

চমকে ওঠে বসন্ত—কি বলছিস কমলা?

কমলা ঘৃণা ভরে বলে—ঠিকই বলছি।

মহেশের রাগটা ঠেলে উঠছে। সেবার ধবলাটে এমনি এক অবাধ্য সাক্ষীকে সে গাং-এর জলে ডুবিয়ে শেষ করছিল। প্রতাপনগরে পাসু সেখ-এর সর্বস্ব জ্বালিয়ে পথের ভিখারী করেছিল। তাদের তুলনায় তুচ্ছ একটা মেয়ের এই ঔদ্ধত্যে মহেশ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠতে চায়।

মহেশ কঠিন স্বরে বলে—তোমার ভালোর জন্যই বলছি মিথ্যা কথাই বলতে হবে।

কমলা জ্বলে ওঠে—আমার ভালোর আর কি বাকী রেখেছেন? সেই রাত্রে আপনিই সর্বনাশ করতে এসেছিলেন। আজও শেষ করে যান। মরতে আমি ভয় পাই না। শেষ করে দিন আমায় আমি শান্তি পাই। এ কালো মুখ আর কাউকে দেখাতে হবে না।

মহেশ দেখছে ওকে। মেয়েটা জেদী আর তেজীও। আজ চরম অপমানে সে মরীয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওকে মরতে দিলে মামলা চলবে না। লোকসান মহেশের। ঘনশ্যামও খালাস পাবে।

তাই মহেশ এবার নিজমূর্তি ধরেছে। বলে সে—তোমার জীবনের দাম কি। কিন্তু তা হতে দেব না কমলা। তোমার বাবা-মাকে যদি আজ রাতেই কেউ শেষ করে দিয়ে যায়।

চমকে ওঠে কমলা—কি বলছেন?

ওই লোকটা সব পারে। মহেশ মান্না বুঝেছে ভয় পেয়েছে কমলা। মহেশ বলে—এই বাদাবনে মহেশ মান্না এমন দু' চার জনকে শেষ করতে পারে কমলা। এ তার কাছে তুচ্ছ কাজ। আজই—

বসন্ত চমকে ওঠে—সেও তা জানে। বসন্ত জীবনে অনেক কিছু পেতে চায়। আরও অনেক। সে ভয় পেয়ে যায়—কি বলছেন মান্না মশায়। একজনের পাপে অন্যকে মারবেন?

মহেশ মান্না ব.ল—সগুষ্ঠী শেষ করতে হয় তাই করবো বসন্ত।

বাসিনীও বের হয়ে এসেছে। এভাবে লোকটা তাদেরও শেষ করে দেবার কথা ভাবছে জানে না সে। আজ কমলাও আশ্চর্য হয়।

মহেশ বলে—নিজেকে শেষ করলেও আমার হাত থেকে তোমার বাবা মা কারও রেহাই নেই। আর সেটা ঘটবে আজই।

গজেন—গজেন নয় আরও তিন চার জন ছায়া মূর্তিকে দেখা যায়। ওদের ঠিক চেনে না বসন্ত। অন্য কোন জায়গা থেকে আনা হয়েছে তাদের। মহেশ বলে—আজ রাতে বসন্ত পণ্ডিত, আর এবাড়ির গিন্নীকে নৌকায় তুলে নিয়ে মনসাতলির মাঝ দরিয়ায় নে গলা টিপে শেষ করে

ছালার মধ্যি পুরি পাথর বাধি গাং-এ ফেলে দিবি।

বসন্ত আর্তনাদ করে ওঠে—মান্নাবাবু! বাঁচান! ওরে কমলা—মেয়ে হয়ে মা বাবাকে এভাবে শেষ করতে দিবি! ওগো—

বাসিনী অজানা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। তবু লোকটার এতবড় নীচতাকে মানতে পারে না সে। বাসিনী বলে—না। যা করার করুক মান্না মশায়, তবু মুখ ফুটে এতবড় মিথ্যাকে মেনে নিতে বলবো না। আমাকে বলোনা—দুঃসহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বাসিনী।

কমলা দেখছে ওদের। মায়ের জন্যই দুঃখ হয়! আজ এভাবে চরম আঘাত হানবে তা ভাবেনি কমলা। কোথাও বাঁচার পথ তার নেই। স্তব্ধতা নেমেছে।

মহেশ বলে—মেয়েটাকে তুলে নে গিয়ে রাত ভোর ওই লেঠেলদের ঘরে লুটপাট করতে দিয়ে এটাকেও গাং-এ বেসর্জন দিবি। রটিয়ে দিতে হবে সাক্ষী দিতে সহরে যাবার সময় নৌকা ডুবে গেছে।

বাসিনী আর্তনাদ করে ওঠে—না না! এভাবে ওকে শেষ করবে না। ওরে কমলা!

কমলা কি ভাবছে। চোখের সামনে নিশ্চিত মৃত্যু, আর ধ্বংস। কমলা বলে—ঠিক আছে।' তাই হবে।

মহেশ মান্না একেবারে বদলে যায় নিমেষের মধ্যে।

—তাই বলো! কেন আজে বাজে কথা বলে মাথা খারাপ করে দাও বলো দিন। মহেশ মান্নাকে দেখো, সে নিশ্চয়ই দেখবে। যা তোরা!

গজেন দলবল নিয়ে চলে গেল। মহেশ মান্না বলে—তাহলে কাল সকালেই চলো আদালতে। আর বসন্ত তুমিও যাবে। ফিরে এসে এবার তোমার মেয়ের জন্য একটা ভালো পাত্র দেখে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বসন্ত বাঁচার আশ্বাস পেয়ে এবার খুশি হয়েছে। গদগদচিত্তে বলে—আপনিই জানপ্রাণের মালিক কত্তাবাবু, যা ভালো বোঝেন করবেন।

মহেশ মান্না বলে—লোকের ভালোই তো করতে চাই হে, কিন্তু লোকে যে উল্টো বোঝে। এ্যাঁ! তাহলে চলি। কাল ভোরেই রওনা হচ্ছি পানসীতে—

কমলা কথা বলে না। বের হয়ে ওঘরে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। কিন্তু কোথাও পথের দিশা নেই। অন্ধকারে সব হারিয়ে গেছে তার।

ঘনশ্যাম মনে মনে একটা জোর নিয়েই আজ আদালতে এসেছে।

জেলহাজত থেকে তাকে পুলিশী জিম্মায় আদালতে আনা হয়েছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছে সে। নিশাকর, রতনদের মুখে আশার আলো জাগে। তাদের ছোটবাবু খালাস পাবে আজ।

অঘোর সরকার উকিলবাবুকে নিয়ে এসেছে। কোর্ট-এ হাজির হয়েছে অনেক লোকজন। মদন মোহান্তও এসেছে। ওদিকে মহেশ মান্না এসেছে, গোবিন্দ মোক্তার ছাড়াও কোর্টের নামী উকিলকে এনেছে সে। বসন্ত পাণ্ডের পোষাক আশাক বদলে গেছে। গায়ে সেই ফতুয়ার বদলে এখন উঠেছে আদ্দির পাঞ্জাবী, ধুতি। কমলা ওদিকে বসে আছে।

ঘনশ্যাম বার বার ওর দিকে চাইবার চেষ্টা করে, আজ কমলাই তাকে বাঁচাতে পারে। বিকালে আবার ফিরে যাবে সে গঞ্জে। উকিলবাবু বলেছেন মামলার রায়ও বের হবে আজই।

মুক্ত উদার গাং-এ ভেসে যাবে কালই, আবার নিজের জগতে। নিশাকর চাইল ছোটবাবুর দিকে।

আদালতের কাজ সুরু হয়েছে।

বড়বাবু কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কি সব বলে চলেছে। ঘনশ্যামকে একটা জানোয়ার—পাপী, এ কাজ সে করতে এতটুকুও পিছোয়নি তারই সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে কমলাকেই এনেছে সে মহামান্য আদালতের সামনে।

ঘনশ্যাম ওর সর্বনাশ করতে চেয়েছিল, মহেশবাবুই বাঁচিয়েছেন কমলাকে।

—না। মিথ্যা কথা! সব মিথ্যা। ঘনশ্যাম গর্জে ওঠে।

সেই টাক মাথা বিচারক চাইলেন ওর দিকে। পরক্ষণেই কে ধমকে ওঠে।

—থামো তুমি।

ঘনশ্যাম বলে—কমলা এসেছে, ওকেই জিজ্ঞাস করুন হুজুর।

ঘনশ্যামের উকিল ঘনশ্যামকে থামাবার চেষ্টা করে।

ওদিকের উকিল এবার মহেশ মান্নাকেই ডেকেছে। মহেশ মান্না কি সব বলে গেল। জজ সাহেবও দেখছেন ওকে। মহেশ মান্না জানায়—আমাকেই খুন করতো স্যার। বেচারা মেয়েটাকে বাঁচাতে গেলাম ওর হাত থেকে তাই এত রাগ।

সারা আদালত যেন বিশ্বাস করছে ওর কাহিনীটা।

এবারের সাক্ষী কমলা।

ঘনশ্যাম চাইল ওর দিকে। মহেশ মান্না—গোবিন্দ মোক্তার ওকে ঘিরে রেখেছে। ধীরে ধীরে কাঠগড়ায় উঠলো মেয়েটি। ঝড়ে যেন ভেঙে পড়বে সে।

বসন্ত অভয় দেয়—যা যা ঘটেছিল বলবি মা।

মহেশ মান্না বলে—কোন ভয় নেই।

কমলা চাইল ওই লোকটার দিকে। সেই রাত্রে ওর নিষ্ঠুর রূপটাকে এখনও ভয় করে সে। কাল এসেছিল আবার বাড়িতে তার মা বাবাকেও খুন করার ভয় দেখিয়েছে। কমলা আজ ভাবতেই পারে না। ঘনশ্যামকে সে কথা দিয়েছিল। কথা দিয়েছিল সে পিসীকে। তখন ভাবেনি তার সামনে এতবড় বিপদ আসবে।

—বলুন আপনার সর্বনাশ করতে এসেছিল ওই আসামী ঘনশ্যাম মাইতি।

স্তব্ধতা নামে আদালতে। ওর একটি কথার উপর সবকিছু নির্ভর করছে। ঘনশ্যাম উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে থাকে। কমলা আজ এসেছে তাকে চরম বিপদ থেকে বাঁচাতে। ঘনশ্যাম চিৎকার করে ওঠে—বল। বল কমলা। হেঁকে ওঠেন বিচারক—অর্ডার।

মহেশ মান্নার উকিল গর্জে ওঠে—আসামী প্রকাশ্য আদালতে হুমকী দিচ্ছে স্যার।

কোন ভয় নেই। বলো—ওই ঘনশ্যামকে তুমি চেন? ও এসেছিল সেই রাতে তোমার উপর অত্যাচার করতে? জবাব দাও—বলো।

মহেশ মান্নার দুচোখ জ্বলছে, চাইল সে কমলার দিকে। ওর নীরব চাহনিতে ফুটে উঠেছে সেই পৈশাচিকতা। বাবার দিকে চাইল কমলা। ওর চোখে ফুটে উঠেছে অসহায় আকুতি। নিজের কথা আজ ভাবেনা সে। মায়ের কথা মনে পড়ে। মা কিছু বলতে পারেনি। তার দুচোখ জলে ভরে উঠেছিল। নিজের প্রেম—বিবেক সবকিছু বিচার বুদ্ধি যেন হারিয়ে যায় কমলার।

—কমলা! চাপাস্বরে ডাকছে ঘনশ্যাম! তার জীবনের স্বপ্ন—সত্তা—ভবিষ্যৎ। কিন্তু কমলা আজ নিজের কথা ভাবতে পারে না।

—জবাব দাও। ওই ঘনশ্যাম গেছল—ওই তোমাকে জোর করে—

—হ্যাঁ। ওইই।

সারা আদালতে যেন শিহর জাগে।

মহেশ মান্নার উকিল ধরতাই দেয়—ধর্মাবতার। ওই সেই শয়তান ঘনশ্যাম মাইতি। কমলা নিজে মুখে স্বীকার করছে স্যার—

—মিথ্যে কথা! এতবড় মিছে কথা বলতে পারলি কমল? ঘনশ্যাম আর্তনাদ করে ওঠে তীর বেঁধা পাখীর মত।

কমলা বলে চলেছে চোখ বুজে—ওইই বাধা পেয়ে মহেশবাবুকে কাটতে গেছল দা নিয়ে।

অঘোর সরকারের অবশ হাত থেকে ছাতাটা সশব্দে পড়ে যায়। সেও যেন স্বপ্ন দেখছে। সেই কমলাও বদলে গেছে। আজ আদালতে দাঁড়িয়ে ঘনশ্যামকে সেই অপরাধী সাব্যস্ত করে গেল। কলরব ওঠে আদালতে।

নিশাকর, রতনরা চমকে উঠেছে।

ঘনশ্যাম প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি কথাটা। কমলা এখানে এসে তার বিরুদ্ধে এতবড় কথাটা বলে যাবে ভাবতে পারেনি।

ঘনশ্যামের উকিল জেরা করতে—দু'একটা কথা বলে আর্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে কমলা। এতক্ষণ সে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তারপরই সে দুঃসহ কান্নায় ভেঙে পড়ে।

মহেশ মান্নার উকিল আবেদন জানায়—কমলাদেবীকে আদালতের আর বোধ হয় কিছু জিজ্ঞাস্য নেই, তাহলে ওঁকে একটু বিশ্রাম দিতে আজ্ঞা হয়। এতবড় অত্যাচার-এর পর তার মানসিক বিপর্যয়ের কথা ভেবে এটা মঞ্জুর করা হোক, এই আবেদন করছি।

মহেশ মান্না—অন্যান্য সাক্ষীরা যায় কমলাও এক কথাই বলেছে। ঘনশ্যামের তেমন কোন সাক্ষী নেই। সেই বিচারক এস-ডি-ও ওর আবেদন মঞ্জুর করাতে বসন্ত মেয়েকে এনে কাছে বসায়। মহেশ মান্নাও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। আজ সে নিশ্চিন্ত। জানে এ মামলার রায় কি হবে।

তাই হয়।

আজ দিনের শেষে ঘনশ্যাম ঘরে ফেরার স্বপ্ন দেখেছিল। নিশাকর—রতনারও এসেছে। মটরা তার লঞ্চটা এনেছে মাষ্টারকে ঘরে নিয়ে যেতে। ওরা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ঘনশ্যাম দেখছে কমলাকে। তার চোখের দৃষ্টি আজ বদলে গেছে। সারা মনের অতলের সব স্বপ্ন, আশ্বাস—আলোর সন্ধান কি নিবিড় ঘৃণা ভরা হতাশার অন্ধকারে ডুবে গেছে। আজ মনে হয় এই পৃথিবীতে ভালোবাসা—বিবেক—ন্যায় কোন কিছুই নেই। সবচেয়ে সত্য ওই টাকাই, টাকা দিয়েই মহেশ মান্নার মত শয়তান কমলাকেও কিনে নিয়েছে। আজ তার সবকিছু হারিয়ে গেছে।

সেই বিচারক রায় দিচ্ছেন। স্তব্ধ আদালত। কঠিন কণ্ঠে বিচারক রায় পড়ে চলেছেন। নির্মম সেই রায়। দুটি অপরাধে আমি ঘনশ্যাম মাইতিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তিনবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম।

—তিন বৎসর। আর্তনাদ করে ওঠে অঘোর সরকার।

নিশাকর—রতনদের চোখে জল নামে। মহেশ মান্নার মুখে ফুটে ওঠে বীভৎস হাসি।

চমকে ওঠে কমলা।

কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ঘনশ্যামের দিকে চাইল সে। কি দুঃসহ কান্নায় ভেঙে পড়ে কমলা। ঘনশ্যামের চোখে জল নেই। তার চাহনি কি নিবিড় অবিশ্বাস আর ঘৃণায় পাথর হয়ে গেছে।

অঘোর সরকার বলে—আপীল করো ঘনশ্যাম!

ঘনশ্যাম বলে—ওসবে কোন লাভ হবে না কাকা। মহেশ মান্নার সাক্ষীরা এই কথাই বলবে। লোকে গোপনে মিথ্যা কথা বলে; ওরা আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ্ করে মিথ্যা কথা জাহির করে আর সেই মিথ্যার উপরই বিচার হয়ে যায়। ঘনশ্যাম ঘানিই টানবে তবু তাদের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়াবে না। চলি কাকা!

ঘনশ্যাম চলে যাচ্ছে, সামনে মহেশ মান্নাকে দেখে দাঁড়ালো। মহেশ মান্নার মুখে বিজয়ীর হাসি। কমলাকে দেখেও চাইল না। চলে গেল ঘনশ্যাম।

মহেশ মান্না বলে—চলো বসন্ত।

কমলা নিজেই চাইতে পারে না কোন দিকে। কি দুঃসহ লজ্জা আর মনের জ্বালায় জ্বলছে সে। বলে কমলা—বাড়ি চল বাবা!

বসন্ত বলে—খেয়ে নিব চল। কিছু কেনা কাটা করতে হবে।

কমলা তীক্ষ্ণ স্বরে বলে—পিণ্ডি খেতে সাধ নেই। তোমাদের কাজ তো হয়েছে। ঘনশ্যামকে জেলে পাঠিয়েছি। এবার ঘরে যাবার পথ না পাই—গাং-এর জলেই যেতে দাও।

হাসছে মহেশ—এ্যাঁ। দুঃখ হচ্ছে? আরে ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই। রাগ করতে নাই। এসবেরও দরকার ছিল।

মুখ বুজে বের হয়ে এসেছে নিশাকর সর্দার, রতন। আজ আর তাদের কোন বল ভরসা নেই।

মহেশ মান্নাও দেখেছে তাদের,—গামছায় মুড়ি ভিজিয়ে খাচ্ছে গাছতলায় বসে। মহেশ ডাকে—সর্দার! অ নিশাকর!

—আজ্ঞে!

মহেশ খুশি ভরে বলে—মুড়ি খাচ্ছো কেন? নাও পাঁচ টাকা—দুজনে হোটেলে ভাত খেয়ে নিও।

নিশাকর বলে ওঠে—ভাত আজ রুচবে না মান্নাবাবু! ও ট্যাকা রাখি দ্যান।

চমকে ওঠে কমলা। নিরক্ষর ওই নিশাকর,—তার বিবেকে বেধেছে এতবড় প্রহসনটা। আর কমলা ঘনশ্যামকে এতদিন দেখেছে. ভালোবেসেছে তবুতো।

কিন্তু আজ সেইই তাকে তিন বছর জেল বাসের ব্যবস্থা করে এল। বাধ্য হয়েই কি দুঃসহ চাপে পড়ে এতবড় অন্যায়টা করেছে সে তা কেউ জানবে না। বাসিনী জানতো। তাই মেয়েকে ফিরে এসে ওর বুকে আছড়ে পড়ে কাঁদতে দেখে সেও বুঝছে কি হয়েছে মামলায়।

বসন্ত অবশ্য এর মধ্যে বাসিনীর শাড়ি—কমলার শাড়ি জামা—আরও কিসব বাণিজ্য করে এনেছে। বসন্ত-বলে—এবার বাছাধন ঠাণ্ডা! তিনি বছর ঘানি টানুক। সশ্রম কারাদণ্ড। বুঝলে—

কমলা কান্নায় ভেঙে পড়ে—একি হল মা? এখনও বেঁচে আছি কেন?

আজ বাসিনী নোতুন চোখে দেখছে মেয়েকে। কমলা শুধু তাদের জন্যই আজ নিজের এতবড় সর্বনাশ করে এসেছে। বাসিনী বলে—চুপ কর কমলা।

কমলার কান্না বাধা মানে না।

বসন্ত হাঁক পাড়ে—কইগো। এগুলো তুলে রাখো।

বাসিনী বের হয়ে ওই সব দেখে বলে—কি দরকার ছিল এসবের?

বসন্ত বলে—হেঁ! দিলেন মান্নাবাবু, নেব না? আর বাবা—এবার ত্যাখো না, ইট বানাবো। পাকাবাড়ি হবে।

বাসিনী ফুঁসে ওঠে—এখানে আর বাস করবো না। এ পাপের রাজ্যে, যেখানে হোক মায়ে বিটিতে চলে যাবো। তুমি থাকো এখানে।

হাসে বসন্ত—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। কি যে বলো! এসব রাখো, একটু ঘাট থেকে ঘুরে আসি।

মহেশ মান্না আজ ঘাটেই আসর বসিয়েছে। গঞ্জের হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে খবরটা। নরহরি ভটচায ছুটে আসে। এসেছে কন্দর্পভূষণ রায়। নটবর-রা এর মধ্যে মালা এনে অভ্যর্থনা জানায়।

নরহরি বলে—আমার নারায়ণ জাগ্রত দেবতা মান্নাবাবু, কত করে ডাকছি তাঁকে। কাল একশো আট বিল্বপত্র দিলাম। মুখ রেখেছে ঠাকুর। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করেন গো।

বসন্ত আজ এই মহলের খাতিরের লোক। গজেনও এসেছে। বসন্ত বলে—এবার শান্তিতে বাস করবে গঞ্জের লোকজন।

জেলেপাড়ার মানুষগুলোর ঝুপড়িতে অন্ধকার নেমেছে। নিশাকর, রতন, ফটিক, রামুর দল বসেছে বালিয়াড়িতে। সামনে পুজোর মরশুম। রোজকার-পাতি নাই। গুপীনাথ এখন পাড়ায় আসে। ফটিক, রামুদের ওখানে।

ফটিক বলে—সর্দার মাছ ধরতে যাব ভাবছি। ছেলেপুলে নে উপোস দিতি পারব না। গুপীনাথও সাথে যাবে। আমি রামু, গুপীনাথ, এ পাড়ার

আরও অনেকে যাবে।

অবাক হয় নিশাকর। তার ছেলে গুপীনাথ গজেনের সঙ্গে ঘোরে। গুপীনাথ জালের কিছুই জানে না। নিশাকর বলে—তার সাথে আমার কুন সম্বন্ধ নাই। তুরা যাবি যা। তবে হুঁসিয়ার হয়ে যাবি।

রতন বলে—তুমি যাবা না?

নিশাকর কথাটা ভেবেছে। বলে সে—না। যা জমি আছে চাষ করবো। আর যাবো নাই মহেশের জালে। গাং-এ যার সাথে যেতাম—সে আর যাবে না। তাই যেতে মন সরে না রে। নিশাকর চুপ করে শূন্য দৃষ্টিতে গাং-এর দিকে চেয়ে থাকে। তারাজলা গাং—কোন অসীমে হারিয়ে গেছে। আকাশ বাতাসে ওঠে শুধু হাহাকার।

এই সুর ছড়িয়ে পড়ে ঘনশ্যামের মনে। এতদিন তবু আশা ছিল মুক্তি পাবে। ফিরে যাবে নিজের গঞ্জে, সেই গাং-এ। কমলাকে নিয়ে বালিয়াড়িতে হারিয়ে যাবে। আর মহেশ মামাকেও দেখে নেবে সে। কিন্তু তার উপায় নেই। জেলে ফিরে এবার তার নাম ওঠে পাকাপাকি ভাবে ওদের খাতায়।

জগদীশ ওকে ফিরতে দেখে বলে—ইকি ছোটবাবু, ফিরি এসেন? শোনলাম তিনবছর মেয়াদ হয়েছেন। তখনই বলেছিলাম বাবু, দুনিয়া শ্লা বেইমানে ভরে গেছে। নাহলে আমার দশা ছাখেন? বৌ মাগীটা এসে অজবল মিছে কথা বলে গেল—মহাজনকে মেরেছি। শোনলাম সে শালী এখন ওটার সাথে থাকে। বেইমান—খান্‌কি কুথাকার। বেরুলে এবার হাসুয়ার কোপে শালীর পীরিত ছুটিয়ে দিব।

চমকে ওঠে ঘনশ্যাম। কমলাও আজ তাকে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে জেলে রেখে গেছে। কেন? এসব ভাবতে চায় না সে। এগিয়ে যায় ঘনশ্যাম। মনে হয় জেলের জীবনের এই পরিবেশকে মানিয়ে নিতে হবে তাকে। প্রতিবাদ সে করবে না। তার মনের একটা দিকের সব কিছু হারিয়ে গেছে। আজ থেকে সে কয়েদী নম্বর তিনশো বাইশ। পরণে জুটেছে জেলের পোশাক। ওই বন্দী মানুষগুলোর সঙ্গে আর তার কোন প্রভেদ নাই। এই কষ্টের জীবনকেই মেনে নেবে সে, সব কিছুর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে একটি অন্য সত্তায় পরিণত হয়েছে ঘনশ্যাম।

—চলো।

মেট আজ আর তাকে বাবু বলে না। বাবুত্বের পরিচয় অধিকার তার সব হারিয়ে গেছে। রাত্রি নামছে—এমনি কত রাত কেটেছে তার মুক্ত অবাধ গাং-এ, তারার ঝিলিক জাগে। ঢেউ কাটা সমুদ্রে লঞ্চটা চলেছে

একটানা—ইঞ্জিনের গর্‌গর্‌ শব্দ ওঠে।

—জাল টান।

ওরা রাতের অন্ধকারে জাল টানছে। ইঞ্জিনের স্পিড কমিয়েছে—ঘণ্টা বাজে।

ঘুম ভেঙে যায় ঘনশ্যামের। জেলের ফটকে ঘণ্টা বাজে। মুক্ত সমুদ্রের ডাক ভেসে আসে নদীর দিক থেকে বাতাসে। সেই ডাকে সাড়া দেবার অধিকার তার নেই, ঘনশ্যাম আজ বন্দী, জেলের পাঁচিলের আড়ালে ওরা তাকে কি জঘন্য অপরাধে নির্বাসিত করে রেখেছে।

দুঃসহ রাগে ফেটে পড়তে চায়, কিন্তু উপায় নেই। অন্ধকারে সেন্ট্রির ভারি বুটের শব্দ ওঠে—খট-খট-খট। একটা—দুটো—তিনটে বছর, অনেক মাস, অনেকদিন। সেই ফাঁকে তিনবার জেলের গাছের পাতাগুলো ঝরবে, বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীত আসবে যাবে। কতদিন দূর গাং-এর বুকে শেষ সূর্যের আলো ম্লান হয়ে রাত্রি নামবে। ঘনশ্যামকে বন্দী থাকতে হবে এখানে এই জেলের বদ্ধ জগতে।

ভোর হয়ে আসে। ঘণ্টা বাজে। এরপর চাবি খুলে ওয়ার্ডার এসে আবার গুণাত করে ফাইল বন্দী করবে। সকালের জন্য বরাদ্দ চাপাটি আর এক মগ চা, তাই খেয়ে কাজে যেতে হবে।

ঘনশ্যাম কি ভাবছে। সব চেনা মুখগুলো হারিয়ে যায়, পিসীর কথা মনে পড়ে। কমলা। তার কথা ভাবতে চায় না সে, জীবনের সে একটা বিস্মৃত বেদনাময় অধ্যায়, তাকে মুছে ফেলবে সে জীবন থেকে।

গঞ্জের জীবনে একটা তেমন পরিবর্তন আসেনি। কোন শূন্যতা থাকে না প্রকৃতির মাঝে। মানুষের মনে তবু কিছু শূন্যতার বেদনা থাকে, কিন্তু প্রকৃতি সে বিষয়ে বড়ই নির্মম। তার প্রয়োজনে সে পথ করে নেয়। আর যাদের রোজ খেটে অন্ন জোটাতে হয় তাদের মনে এই অভাব বোধটা তত তীব্র থাকে না। তাই জেলেদের অনেকেই মুখ বুজে আবার কাজে নেমেছে। মহেশ মান্নার আড়তের রমরমা ফিরে এসেছে।

গুপীনাথ এখন জেলেবাহিনীর অন্যতম মাতব্বর হয়ে উঠেছে। জালে যায় নি নিশাকর সর্দার। ও বলে—আর ও কাজে নাইরে। বুড়ো জমি-জায়গাত নিয়ে থাকে আর অবসর সময় চেয়ে থাকে দূর গাং-এর বিস্তারের দিকে। ঢেউ কাটছে—ওই গাং পার হয়ে ওরা যেতো অনেক—অনেক দূরে ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে। কতদিন রাত্রি ঘুরেছে এই গাং-এ। তুলে এনেছে

নৌকা ভর্তি মাছ। ঘনাবাবু জানতো কোন জলে কি মাছের ঝাঁক সমুদ্র জড়িয়ে গাং-এ ঢোকে। কোথায় জল মাথিয়ে ছুটে যায় ইলিশের ঝাঁক, কোথায় জল থিক থিক করে বাগদা চিংড়ির ভিড়ে।

তারা তুলে আনতো সেই মাছ। সেবার গাং-এ হাঙরের উৎপাতের সময় নৌকা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, জেলেরা জলে নামে না। গ্রাম বসতির মানুষের মুখে আঁধার নেমেছে, রুচি রোজকার যাতায়াত বন্ধ। এই একটি মানুষ দিন-রাত ঘুরে সেবার দল বেঁধে সেই হাঙরটাকে মেরেছিল। এ গাং-এ ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে জেলেদের সেইই। আজ তাকে ওই মহেশ মান্নার দল জেলে পাঠিয়েছে মিথ্যা অভিযোগে।

কদম বলে—দুনিয়াটা বদলে গেছে খুড়ো। নিশাকর ক্ষেতে ঝিঙে গাছ-এর থানা চাপাতে কোপাতে বলে—তাইতো দেখলাম রে। উরো আবার জালে গেল, যাক। আমি আর যেছি না।

কদম বলে—গুপীনাথ সর্দার হয়েছে। নিশাকর সাড়া দিল না। ও জানে গুপীনাথের এলেম। কোনদিন না বিপদে পড়ে। গাং-এর কিছুই জানে না সে।

নটবর মাষ্টার এখন মহেশ মান্নার সুনজরে রয়েছে। ওই জেলেপাড়ায় মধ্যে নটবরের প্রাধান্য এখন বেশী। ওদের বিপদের সময় নটবর মাষ্টার এগিয়ে এসে রিলিফের দরখাস্ত করিয়ে কিছু তদবির করে কয়েক কুইন্টাল চাল, গম, কয়েক গাঁট কাপড়—কম্বল আনিয়েছিল।

আর হাটতলার চত্বরে মিটিং করে সেই চাল, কাপড়, কম্বলের কিছু দান করেছিল জেলেদের। অবশ্য তার অর্দ্ধেকেরও বেশী মাল রাতের অন্ধকারে ভূষণ রায়ের দোকানে পাচার করে নটবর আড়াই হাজার মুদ্রা পকেটস্থ করেছিল।

নিশাকর সর্দারকে রতন বলে—রিলিফ নিতি যাবা না সর্দার। নটবর মাষ্টার কত কি আনিয়েছে।

নিশাকর বলে—হাটতলায় দাঁইড়ে ভিক্ষে নিতি পারবো নি রতনা। তুরা যেছিস যা। সর্বস্ব গেছে—সরকার যদি দিতি চায় তবে এত হাঁক ডাক করে কেন দিবে, আর ভিখেরীর মত সাতসাগরের লুকের সামনে কেন দিতি হবে।

নিশাকর যায় নি নিতে। শীত আসছে। একটা রং-ওঠা জীর্ণ চাদর জড়িয়ে মাঠে যায়, মাথায় জড়ানো একটা গামছা। দেখেছে নিশাকর, নটবর এখন জেলেপাড়ায় ওদের নিয়ে গেছে মহেশের কাছে। আবার তারা জাল

নে নেমেছে গাং-এ।

গুপীনাথ বলে—কাজ করবি ন্যায্য পয়সা নিবি। সর্দার না এলো আমি তো আছি।

নটবর মাষ্টার সায় দেয়—সদ্দারের ব্যাটা তো বটে রে ও। তবে কেন কাজ করবি নাই?

ওরা মাছ ধরতে নামে। গরজ বড় বালাই। বাঁচার প্রশ্নের জবাব সহজে মেলে না। তাই বাঁচার জন্যই তাদের যেতে হয়েছে। নিশাকর যায় নি।

মহেশ মান্না সব জানে। নটবর বলে—তবু কিছু লোক আসছে নিশাকর নাইবা এলো। বুড়ো আর কি করবে?

আভত চালু নটবরের বুদ্ধিতে। তাকে জেলেপাড়ার নেতা স্বীকৃতি দিতে বাধে না। মহেশ মান্না এইভাবেই ওই লোকগুলোকে আবার জালে ফেলেছে।

নটবর মাষ্টারের মনের অতলে লোভটা ক্রমশ বেড়ে ওঠে। এতদিন ঘনশ্যামের জন্য এগোতে পারে নি। এবার নটবরই এগিয়ে আসে বসন্ত পণ্ডিতের বাড়িতেও। বসন্তের শরীরটা কদিন ভালো নেই। বাড়িতেও অশান্তির পরিবেশ যেন গুমরে ওঠে। কমলাকে দেখেছে, ওকে এড়িয়ে চলে সে। বাসিনীও কথায় কথায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

বসন্ত গর্জায়—মুখ বুজে থাকতি হবে। আর তোমার মেয়ের বিহিত আমি করছি। এমন সময় নটবরকে আসতে দেখে চাইল বসন্ত। নটবর এখন এখানের কেউ কেটা। মহেশ মান্না ওকে এবার নাকি ভোটে দাঁড় করাবে, আর সাগর মেলার সময় এগিয়ে আসছে। নটবরকে মেলা কমিটিতেও নেওয়া হবে।

বসন্ত জানে কাকে খুশী রাখতে হয়, মেলার সময় সেবার দু'হাতে রোজগার করেছে। এবার একা মহেশ মান্নাই নয়, নটবরকেও খুশী রাখতে হবে। নটবরকে দেখে বলে বসন্ত—এসো নটবর। ওগো—চা করো। নটবর এসেছে।

নটবর এগিয়ে আসে—আজ যাননি ঘাটে তাই খবর নিতে এলাম। শোনলাম শরীর খারাপ। নটবরের দুটো চোখ এদিক ওদিক খুঁজছে কাকে। কমলা চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়ে সরে গেল।

বসন্ত বলে—তাহলে এবার মেলার আয়োজন বেশ জমিয়ে করছো বলো? তোমরা তো ইয়ং ম্যান—এসব ভার নিতে হবে।

নটবর বলে—দেখা যাক। আজ সহরে যেতে হচ্ছে।

—কেন ?

নটবর শোনায়—কিছুদিন থেকে গাং-এ একটা হাঙর এসেছে। বিরাট টাইগার শার্ক। খুব উৎপাত করছে। মনসাতলি, ফুলতলির গাং-এ কয়েকটা মেছোনৌকা ডুবিয়ে লোকজন মেরেছে। কাল নাকি জেলেরা এখানের গাং-এ দেখেছে। কাকদ্বীপের হারবার পয়েন্টের কালই একটা লোকটা ধরেছে গাং-এ।

বসন্ত পারঘাটে বসে খবরটা শুনেছে। কিন্তু তেমন গুরুত্ব দেয়নি। গাং-এ এমন বিপদ হামেশাই ঘটে থাকে। কিন্তু হাঙর এসে এমন বিপত্তি ঘটায় কদাচিৎ। সমুদ্র থেকে যে ভাবে হোক ওরা এমনি খাড়ি অঞ্চলে এসে পড়ে, সারা অঞ্চলের লোকের মনে জাগে আতঙ্ক। নদীই তার চলাচলের পথ, এখানেই তাদের রুজি রোজগার, হাঙরের আতঙ্কে সে সব বন্ধ হয়ে যায়।

সেবার ঘনশ্যাম মাঝে মাঝে দু' একটা হাঙরকে মেরেছে। এ গাং থেকে কোন হাঙর তার হাত ফসকে যেতে পারেনি।

বাসিনী বলে—ঘনশ্যাম থাকলে সে ঠিক ওটাকে মারতে।

বসন্ত কথাটা শুনে চটে ওঠে—থামো দিকি। ঘনা ছাড়া আর কেউ নাই এ দিগরে ?

নটবর জানায়—আমরাও চেষ্টা করছি। আর সদরে খবর দিতি চলেছি। সরকার থেকে ওটাকে মারা হবে।

বসন্ত বলে—তাই করো। নাহলে সামনে গঙ্গাসাগর মেলা। লাখো লাখো মানুষ ডিঙি নৌকায় আসবে, বিপদ হবে যে।

কমলাও শুনেছে কথাটা। হাঙর নয় যেন একটা অশান্তি আর নৈরাজ্যের কালো ছায়া নেমে আসছে এই দ্বীপের জীবনে। এই বিপদকে বাধা দেবার সামর্থ এদের নেই।

—কমলা!

কমলা চমকে ওঠে। বাড়ি থেকে বাইরে এসে পিছনের বালিয়াড়ি ঝাউবনের নির্জনে সে বসেছিল, নটবরকে এগিয়ে আসতে দেখে চাইল। শীর্ণ লম্বা চোয়াড়ে মাকা পাকানো চেহারা, মুখে চোখে কুটিল বুদ্ধির ছাপ ফুটে উঠেছে। কমলা চাইল ওর দিকে। ইদানীং দেখছে, নটবর যেন একটু সাহসী হয়ে উঠেছে। মনে হয় ঘনশ্যাম নেই, আজ বাঘ নেই তাই শেয়ালদের প্রাধান্ত বেড়েছে।

নটবর বলে—এলাম, দুটো কথা বলতে তা নয় তুমি চলে এলে বাইরে ?

কমলা বলে—কি কথা বলবো ?

হাসে নটবর—কেন ? বলার কিছু নাই বুঝি ? পড়াশোনা শুরু করো,

আমি দেখিয়ে দেব। পরীক্ষাটা দিয়ে দাও প্রাইভেটে। তখন দেখবে স্কুলের মাষ্টারিই পেয়ে যাবে। নোতুন গার্লস স্কুল খোলা হবে।

কমলা বলে—তুমি পড়াবে? ওই মহেশ মান্নার ম্যানেজারি আর দলবাজী করতে করতে পড়াশোনা সব ভুলে গেছো।

নটবর চটতে গিয়েও পারলোনা। হাসবার চেষ্টা করে—কি যে বলো। আজ চলি, পরে কথা হবে।

কমলা চুপ করে থাকে। নটবর ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। নদীতে দিনের আলো ঝকমক করে। শীতের গাং। জলে এসেছে সমুদ্রের নীল আভা। মান্না-বাবুর আড়তে লোকজন কাজ করছে। নৌকাগুলো ফিরছে। দূরে দু-চারটে নৌকা মালপত্র নিয়ে চলেছে।

হঠাৎ আর্ত চীৎকারে চাইল কমলা, গাং-এর বুকে চীৎকার ওঠে—আশে-পাশের নৌকার লোকগুলোও চীৎকার করছে—হুসিয়ার। শান্ত গাং-এর নীল জল ঠেলে উঠেছে বিরাট একটা জানোয়ার—এগিয়ে চলেছে। তার পিঠের পাখনাটা জলের উপর জেগে আছে ডিঙির পালের মত। সামনের নৌকাটা থেকে চীৎকার ওঠে—আর তখুনিই দেখা যায়, নৌকাটার একদিক উঠে গেছে —ছিটকে পড়ে মাঝি, বিশাল হাঙরটা হিসাব করেই আঘাত করেছে তার বিশাল ল্যাজ দিয়ে, উৎক্ষিপ্ত লোকটাকে বিশাল মুখগহ্বরে ধরে ডুবে গেল—তখনও ভীত মাঝিদের চীৎকারে গাং মুখর হয়ে রয়েছে।

কমলা ভীত চকিত চাহনি মেলে দেখছে। আজ নিজের চোখে দেখছে সে ওই নিষ্ঠুর দানবটাকে।

মহেশ মান্নাও আড়তে বসেছিল, চীৎকার শুনে বেরিয়ে এসে একনজরে দেখেছে সে হাঙরটাকে। ওর কথাই শুনেছে এতদিন। ও দূর গাং থেকে ক্রমশ সহজলভ্য শিকার পেয়ে সাহসী হয়ে এবার এদিকেই এসেছে।

রতন বলে—ব্যাটাকে আগেই দেখেছি বাবু, সাংঘাতিক জানোয়ার। এবার এদিকেই এসেছে। সারা গাং টহল দে ফিরছে, রোজই চোট করছে। কি হবে বাবু।

মহেশ মান্না জানে এইবার বিপদ বাড়বেই। আর ভয় পেয়ে গেলে জেলেরাও জলে নামবে না। মাছ ধরা বন্ধ হয়ে যাবে। তার আড়ত এতদিন পর খুলেছে, সবে আমদানী শুরু হয়েছে, এই মুখে আবার বন্ধ হলে বিপদ। তাই মহেশ বলে —কি আর হবে? এসেছে আবার ফিরে যাবে বার দরিয়ায়। আজ সদরে খবর দিয়েছি—ছাখনা সরকার থেকে লোকজন লঞ্চ এনে ওটাকে খতম করল বলে। যা—যে যার কাজে যা। গজেন আর নৌকা এল?

গজেন বলে—এসে যাবে কত্তা।

রতন, ফটিক, রামুরা আগে দেখেছে জানোয়ারটাকে। সেই সন্ধ্যায় ঘনশ্যামবাবুও খুঁজছিল ওটাকে। কিন্তু পায়নি। তারপর ঘনশ্যামবাবুও চলে গেছে জেলে, জানোয়ারটা সাহস পেয়ে এবার এগিয়ে এসে হানা দিয়েছে এখানেও।

নোতুন এস-ডি-ও সুমন্ত মিত্র কয়েকদিন হল এখানে চার্জে এসে জয়েন করেছে। উৎসাহী তরুণ—কয়েক বছর হল পাশ করে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চাকরীতে এসেছে, প্রবাসী বাঙালী ওরা। এলাহাবাদেই কয়েক পুরুষ ধরে আছে। মাইহারের ওদিকেও তাদের বিরাট ফার্ম, বন পাহাড়ে তখন থেকে ঘুরেছে সুমন্ত। রেওয়া, মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে শিকারও করেছে অনেক। অনেক বাঘ, সম্বর, বাইসন মেরেছিল কয়েকটা। সেবার পল্লি পান্নায় জঙ্গলে একটা মানুষখেকো বাঘের পিছনে দুদিন দুরাত্রি ঘুরে তাকে মেরেছিল। রোগ্—বাইসন মারতে বহু রাত্রি সে অরণ্য পর্বতে ট্রাক করেছে।

মা সুধাময়ী এসব পছন্দ করে না। জীবনে একবার চরম বিপদের মুখ থেকে বেঁচে এসেছিল সে সর্বস্ব হারিয়ে, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিজে বেঁচেছিল কিন্তু তার এক সন্তানকে বাঁচাতে পারেনি। তাকে হারাতে হয়েছিল।

সেবার ফিরেছিল কোন রকমে। স্বামী সদানন্দবাবু এলাহাবাদের নামকরা লোক, তিনিও চেষ্টা করেছিলেন সন্ধান করতে, কিন্তু বিশাল এই পৃথিবীতে একটি সন্তানের মৃত্যুর খবর তার কাছে পৌঁছেনি। নিঃশেষ মৃত্যুর অতলে হারিয়ে গেছে তার সন্তান।

তার কয়েক বছর পর আসে সুমন্ত। সুধাময়ী এবার সুমন্তকে কাছ ছাড়া করতে চায়না। এলাহাবাদেই পড়াশোনা করে, কৃতি ছাত্র সুমন্ত। কিন্তু বাপের স্বভাব সে পেয়েছে। ছুটিতে সহরে থাকবে না। মাইহারের বনপর্বতের ফার্মে চলে যাবে। আর তারপরই সুরু হয় তার ওই শিকার পর্ব। সেবার একটা বিরাট রোগ্ বাইসন মেরে শিং দুটো বাড়িতে আনতে সুধাময়ী শুধোয় —কে মেরেছে রে এত বড় জানোয়ারটাকে? সুমন্ত হাসতে হাসতে বলে—কেন আমি!

—তুই! সুধাময়ী চমকে ওঠে। বনে পর্বতে রাতের অন্ধকারে ঘোরে ছেলেটা, আবার কোন চরম বিপদ ঘটতে পারে। মায়ের বেদনাতুর মন অতীতের সেই বেদনাময় স্মৃতিটাকে স্মরণ করে ব্যাকুল হয়ে বলে—না। তুই এসব করবি না সুমন্ত।

হাসে সুমন্ত—এত ভয় কিসের মা, হাতে এই হেভি রাইফেল থাকতে কাউকে ভয় করি না। সেবার বড় বাঘটাকে মারলাম দেখলে তো?

মায়ের মন তবু মানে না। কিন্তু সুমন্ত এই একজায়গাতেই মায়ের বাধা মানতে পারেনি। নিশির ডাকের মতই বন পাহাড় তাকে ডাকে, ম্যানইটার হয়ে সারা এলাকায় কোন বাঘ মানুষ মেরে চলেছে, কোন হাতি দলছুট হয়ে ঘুরছে, মানুষের ঘরবাড়ি, ফসল তছনছ করছে, সুমন্ত থাকতে পারে নি। সে গেছে ওই এলাকায়।

দিনরাত্রি বনে পাহাড়ে ঘুরে হাতিটাকে ট্রাক করেছে, দুর্বার বেগে এগিয়ে আসে জানোয়ারটা। মাটিতে দাঁড়িয়ে তাকে শেষ করেছে সুমন্ত।

মা বলে—তুইও একদিন কাঁদাবি সুমন্ত। একবার হারিয়েছি একজনকে আবার তোকে হারালে বাঁচবো না রে!

সুমন্ত বলে—সে তো ছিল এইটুকু।

ছবিটা এখনও রয়েছে। মায়ের কোলে ছেলেটা তখন ছোট।

সুমন্ত বলে—আমি এখন বড় হয়েছি মা, এত সহজে কিছু হবে না।

মায়ের মন কাঁদে—বালাই ষাট! মায়ের কাছে ছেলে কোনদিনও বড় হয় না। তার স্মৃতি ভালোবাসার রূপ-বর্ণে সে থাকে চিরকিশোর।

সুমন্ত আই-এ-এস্ পাশ করে এবার বাংলাদেশে বদলি হয়ে এসেছে সীমান্তের এই মহকুমায়। বিশাল নদীর বিস্তার, গঙ্গা এখানে সমুদ্রের স্বাদ পেয়ে বিস্তার লাভ করেছে, ওপার দেখা যায় না।

সুধাময়ী ছেলের বাংলোয় এসে চমকে ওঠে। এই গাং—! এই নদী তীরে বহু বছর আগে সে এসেছিল একবার পুণ্যস্নানে। দীর্ঘ অতীতের সেই ছবিটার সঙ্গে আজকের এখানের রূপ আর মেলে না। ওদিকে মাথা তুলেছে বিলাস-বহুল ট্যুরিষ্ট লজ, নদীর বুক কাঁপিয়ে বড় বড় জাহাজগুলো ভেসে চলে কলকাতার দিকে। সুমন্ত বলে—জায়গাটা কেমন লাগছে মা?

সুধাময়ী অতীতের সেই স্মৃতিটাকে ভুলতে চায়। বলে—ভালোই। বেশ খোলা মেলা। হ্যাঁরে সাগরদ্বীপ—কত দূর এখান থেকে?

সুমন্ত বলে—বেশী দূর নয়। আমার লঞ্চ আছে—চলো না একবার ঘুরে আসবে। মেলার সময় তো এসে যাচ্ছে। তার আগেই যেতে হবে দু'চার বার। চলো একদিন ফাঁকায় ফাঁকায় পুণ্যস্নান করে আসবে সাগর সঙ্গমে।

সুধাময়ী কি ভাবছে। মনের অতলে যেন নীরব একটা ঝড় ওঠে, কিন্তু সেই সব কিছুকে ভুলে থাকতে চায় সে।

সুমন্তকে আগেকার এস-ডি-ও সাহেব চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেছেন।

বলে যান তিনি।

—বিরাট এলাকা বাদার, জলপথই বেশি। ডাকাতি, অন্য হাঙ্গামা এখানে লেগেই আছে। আর সমুদ্রের ধারের মানুষদের স্বভাবে একটা বেপরোয়া ভাব আছে। তাই একটু ট্যাকল করতে হবে এদের কৌশলে। জেলের আসামীদেরও দেখবে কেমন এরোগেণ্ট স্বভাবের। ঘনশ্যাম মাইতি কয়েদী নম্বর তিনশো তেইশ একটি নমুনা। সে ব্যাটা কিলার অব কিলার শার্কস্—নিজেও একটা বেপরোয়া।

সুমন্ত শুধোয়—শার্কস্। হাসেন এস-ডি-ও—হ্যাঁ এখানের বিরাট গাং-এ মাঝে মাঝে দরিয়া থেকে বিরাট শার্ক দু' একটা আসে, বেশ উপদ্রব করে। আতঙ্ক আনে সারা এলাকায়। ওদের মারাও কঠিন। ওই ঘনশ্যাম নিজের লঞ্চ নিয়ে বেশ কয়েকটা শার্ক মেরেছে। মহাফেজখানায় তার প্রেস রিপোর্ট, ছবি টবি আছে।

সুমন্ত নিজে শিকার করেছে, শিকার তার রক্তে। রাতের অন্ধকারে মানুষখেকো বাঘের পিছনে ঘুরেছে, রোগ হাতিও মেরেছে কিন্তু হাঙরের খবর পেয়ে কৌতূহল বোধ করে। শুধোয় সে—কি করে মারে?

বিদায়ী এস-ডি-ও সাহেব এসব খবর বিশেষ রাখেন নি। তিনি বলেন—ওরা ভালো জানে। তবে বিরাট লড়াই করতে হয়। তা সেই ঘনশ্যাম এখন জেলে। রেপ কেস—এ্যাটেম্প টু মার্ডার কেসে জড়িয়ে জেলে এসেছেন।

সুমন্তের কৌতূহল হয়। এস-ডি-ও সাহেব বলেন—আবার একটা হাঙর এসেছে, বিরাট এটা। রিপোর্ট পেয়েছি মানুষজন মারছে, নৌকা ডুবোচ্ছে—সামনে গঙ্গাসাগরের মেলা, এখানে তখন বিরাট ব্যাপার, রিস্কও অনেক। ও ব্যাটাকে সামলাতে হবে। তুমি ভায়া সদরে রিপোর্ট করে দিও সব জানিয়ে। ডি-এম সাহেব যা পারে করুক। তোমার ঘাড়ে রেখোনা।

আর মেলার ব্যাপারে তুমি সব রকম সাহায্য পাবে সাগরদ্বীপের মহেশ মান্নার কাছে। খুবই কাজের লোক—আর ভেরি হেল্পফুল। মহামূল্যবান কিছু উপদেশ দিয়ে এস-ডি-ও সাহেব বিদায় নিলেন।

নটবর এসে নোতুন এস-ডি-ওকে দেখে একটু ঘাবড়ে যায়। বিরাট একটা ভেটকি মাছ এনেছে বাংলোয়। সুমন্ত খবর পেয়ে বের হয়ে আসতে নটবর ওকে দেখে ঘাবড়ে যায়।

সুমন্ত সেটা বুঝে বলে—আমিই নোতুন এসেছি, বসুন।

নটবর ভেটকি মাছটা দেখিয়ে বলে-এটা এনেছিলাম—মহেশবাবু পাঠালেন সাগরদ্বীপ থেকে।

সুমন্ত ছেলেটিকে দেখছে। বলে সে—ওটার কোন দরকার হবে না। মা তো বিধবা। মাছ মাংস চলে না। খেতে একা আমি। তা এত বড় মাছ দশ দিনেও খেতে পারবো না। ওটার দরকার হবে না।

নটবর একটু ঘাবড়ে যায়।

বলুন।

নটবর রিপোর্টটা দেয়। অঞ্চল প্রধান জানাচ্ছে হাঙরের কথা। এসময় কোন ব্যবস্থা না নিলে আরও ক্ষয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সামনে সাগর দ্বীপের মেলার সময় সমাগত—ইত্যাদি।

সুমন্ত কি ভাবছে—শুধোয় সে—এখানের গাং-এ মাঝে মাঝে হাঙর আসে, সেগুলো মারা পড়ে তো?

নটবর জানায়—পড়ে দু' একটা। আবার কেউ ফিরে যায় সমুদ্রে তাড়া খেয়ে। তবে স্যার এটা বিরাট টাইগার শার্ক। এর স্বভাব আলাদা। সাগর-দ্বীপের মানুষের বিপদ হবে স্যার।

সুমন্ত কি ভেবে বলে—আমি নোতুন এসেছি, চলুন একদিন আপনাদের ওখানে ঘুরে আসবো। মহেশবাবুকে বলবেন—

নটবর বাধিত হয়—নোতুন হুজুরকে খুশী করার মৌকা পেয়ে। বলে সে—চলুন স্যার। দেখে আসবেন আমরা কেমন আছি। আর হাঙরটার ব্যবস্থা কিছু করুন স্যার।

সুমন্ত জানেনা হাঙরের সম্বন্ধে কিছু। তাদের স্বভাব প্রকৃতি—পরিচয় সম্বন্ধে জানা দরকার। তবু বলে সে—সদরে আজই মেসেজ পাঠাচ্ছি। আর আপনারাও চেষ্টা করুন।

লঞ্চটা অসীম গাং-এর বুকে ভেসে চলেছে। দূরে তটরেখা দেখা যায় একটানা দাগের মত। ঘোলা জল ভাটার টানে নেমে চলেছে। কোথাও একটা বাঁশ ভাঙা—খড়ের টুকরো—কাঠের পাটাতন ভেসে চলেছে মানুষের জগতের—মৃত্তিকার স্মৃতি নিয়ে। ডেকে রোদ'পিঠ করে বসে আছে সুধাময়ী। সুমন্ত ওকেও নিয়ে চলেছে।

সুমন্ত এর মধ্যে বেশ কিছু দেশী বিদেশী বই আনিয়েছে হাঙরের সম্বন্ধে। কিন্তু সে সবই গভীর সমুদ্র এলাকার হাঙরের বিষয় নিয়ে।

বহু রকমের শার্কই রয়েছে, নানা ধরণের। নানা প্রজাতির। তাদের মধ্যে কেউ শান্ত, ভীরু। বুলশার্ক দেখতে বিরাট—হ্যামার হেড শার্কগুলো তবু শান্ত প্রকৃতির। আর টাইগার শার্ক বাঘের মতই হিংস্র, একবার মানুষের

স্বাদ পেলে এরা মরীয়া হয়ে ওঠে! লম্বায় চল্লিশ ফিটও হয়। যেমন বিরাট তেমনি শক্তিমনে আর হিংস্র।

পথের নিশানাও এরা ঠিক করতে পারে। মস্তিষ্কে এমন কিছু ঝিল্লি আছে যাতে জলের নীচেও সামান্য শব্দ ওদের সজাগ করে তোলে, র‍্যাডারের মত। আর শব্দের উৎস লক্ষ্য করে এরা এগিয়ে যায় এত ভারি দেহ নিয়ে তীরবেগে। একবার এক এক অঞ্চলে এরা চলে যায়, আশ্রয়, আহার্য্য পেলে সেখানেই ডেরা বাঁধে। আবার মেটিং-এর সময় প্রিয়ার সন্ধানে ফিরে আসে বার দরিয়ায়। বঙ্গোপসাগরেও এদের আস্তানা। বিশেষ করে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নাতিশীতোষ্ণ সামুদ্রিক পরিবেশে এরা আরামেই থাকে!

তেমনি কোন হাঙ্গর ঘুরতে ঘুরতে খাড়িতে এসে পড়ে। আশ্রয় নেয় এখানে কিছু দিনের জন্য আর তার রাক্ষুসে খিদে মেটায় মানুষ মেরে আহার্য্য সংগ্রহ করে।

এরা বাঁচেও বহুকাল। মানুষের দেহের কোষগুলো দীর্ঘদিন কাজ করার পর ক্ষয় হয়ে যায়। আর দেহকোষের জীর্ণতা থেকেই আসে জরা, মৃত্যু! এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু হাঙ্গরদের ক্ষেত্রে এটা ঘটে না। এদের দেহকোষ-গুলো জীর্ণ হয়ে গেলে আবার আনপাহতেই নোতুন দেহকোষ এর সৃষ্টি হয়। নবজীবন লাভ করে। স্বাভাবিকভাবে তাই এদের মৃত্যু কম। এদের মৃত্যু হয় নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। নাহয় মানুষের হাতে, নাহয় অন্য কোন এ্যাকসিডেন্টে।

সুমন্ত কি ভাবছে।—মা!

সুধাময়ী ছেলের ডাকে চাইল। দেখছে গাং-এর বিস্তার। অনেকদিন—বহুবৎসর আগের সেই স্মৃতিটা ভেসে ওঠে। ফেরার সময় হঠাৎ ঝড় ওঠে—কোথায় তাদের নৌকা ডুবেছিল জানে না। দুচোখ দিয়ে আজও কি যেন খুঁজে ফেরে একটি নারী—জননী।

বাতাসে হঠাৎ কাদের চীৎকার ভেসে ওঠে।

—স্যার! সারেং-এর ব্যাকুল চীৎকার শুনে চাইল সুমন্ত। ওদিকের গাং-এর নীল জল ভেদ করে ঠেলে উঠেছে নীল সাদা দাগওয়ালা একটা বিরাট জানোয়ার। ডিঙ্গি নৌকা থেকে চীৎকার ওঠে, তীর বেগে জানোয়ারটা জল কেটে গিয়ে বিশাল ল্যাজের ঝাপটায় উল্টে ফেলেছে একটা নৌকাকে। দুজন লোক ছিটকে পড়ে—পরক্ষণেই দেখা যায় জলে তুফান তুলে জীবটা ডুবে গেছে। একজনকে আর পাওয়া যায় না। অন্যজনের জ্ঞানহীন দেহটা ভাসছে। তাকে তোলবারও কেউ নেই—ডিঙ্গিগুলো সরে পালাচ্ছে প্রাণ

ভয়ে। সুমন্ত চীৎকার করে—লাইফবেল্ট ফেলো—লাইফবেল্ট। একজন সুখানি কোন রকমে লঞ্চ থেকে শুয়ে পড়ে লোকটাকে খাবলে ধরেছে, টেনে তোলে তাকে লঞ্চে।

ভয়ে আতঙ্কে সুধাময়ী কাঠ হয়ে গেছে।

সারেং বলে—এই ব্যাটাই আর। পেরায় রোজ হানা দিচ্ছে গাং-এ। চকিতের মধ্যে ঘটে যায় ঘটনাটা, শান্ত গাং-এর বুকে মৃত্যু আর আতঙ্কের ছায়া নামে।

সুধারাণী ভীতত্রস্ত চাহনি মেলে দেখছে—ওকি রে সুমন্ত।

সুমন্ত গাং-এর বুকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখছে চারিদিকে, কোথাও আর কোন পাত্তা নেই। একটু আগে যে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল তার কোন চিহ্ন আর নেই। ডিঙ্গি নৌকাগুলো ভয়ে পালাচ্ছে। মায়ের কথায় সুমন্ত বলে—হাঙর মা। বিরাট মানুষখেকো হাঙর। কিছুদিন ধরেই এই গাং-এ মানুষ মারছে। সুধাময়ী চুপ করে থাকে।

খবরটা সাগরদ্বীপেও ছড়িয়ে পড়ে। গঞ্জে আড়তেও এই নিয়ে ক্রমশ আলোচনা চলছে। রতন বলে—রোজই পেরায় একটা দুটো ডিঙ্গি—লোক চোট হচ্ছে ফটিক।

গজেন বলে—ধ্যাৎ। ও ব্যাটা কি করবে। সদরে খবর গেছে। দেখ না লঞ্চ নে আসছে মিলিটারী।

ফটিকও ঘাবড়ে গেছে। বলে সে—আজও চক্ষের সামনে দুজনেরে নিই গেল দেখল। কারে কবে নেয় কে জানে।

রতন বলে—ইমন হলে গাং-এ নামবো নাই গো। মাছও পেছি না কেন শুধু শুধু পরাণ দিতে যাবো। রামু পোড়া বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে ফেলে দিয়ে বলে—তাই ভালো গ। ভেড়িতে মাটি কাটতি যাবো। জালে যাবো নি। ঘনাবাবু থাকলি তবু ভরসা ছেলো।

মহেশ মান্না বিপদে পড়ে। বলে সে—ওসব নে ভাবিস নি। দরকার হয় আমিই মারবো ওটাকে। উড়িয়ে দেব দেখিস।

কার হাসির শব্দে চাইল ওরা। নিশাকর সর্দার এক বোঝা খড় নিয়ে যাচ্ছিল। সে কথাটা শুনে হেসে ওঠে।

মহেশ চাইল ওর দিকে। গজেন শুধোয়—হাসলি যে।

নিশাকর বলে—বাপ মারেনি টিকটিক তার ব্যাটা গুলন্দাজ। এই জানোয়ারের মারতি যাবে মহেশ মান্না? যাবেননি বাবু, বিপদ হতি পারে।

গুপীনাথ বলে ওঠে—থামোদিকি? তুমি সব জানো?

নিশাকর ছেলের দিকে চেয়ে বলে—না। ওর কাছে শেকৃতি হবে।

জেলেদের মনে এবার ভয় এসেছে। দেখেছে তারা চোখের সামনে বিরাট দানবটাকে। মহেশ বলে বেশ গম্ভীরভাবে—চেষ্টা আমি করছি। আজই নোতুন এস-ডি-ও সাহেবকে নিয়ে আসছি, দেখবো কি বলি ত্যানাকে।

নরহরি ভটচার্য, রমণ ডাক্তার, গঞ্জের ব্যাপারীরাও ভাবনায় পড়েছে। এখানের হাটে আজ তেমন বেচা কেনা নেই। ব্যাপারীদের আনাগোনাও কমে গেছে। নৌকায় করে দোকানের মালপত্র নিয়ে এ অঞ্চলের ব্যাপারীরা জলপথে ঘোরে, আজ কচুবেড়িয়ায় হাট। সকালে এসে নৌকা নোঙর করে দোকান সাজিয়ে বসে বেচাকেনা সেরে সন্ধার গোনেই বের হয়ে পড়লো নৌকা নিয়ে। কাল অন্য কোথায় হাট, সেখানে। আবার পরদিন নৌকা নিয়ে হাজির হল মনসাতলির গাং-এর ধারে গঞ্জের হাটে এমনি করে তারা ভেসে বেড়ায় হাটে হাটে।

কিন্তু তাদেরও দু একজনের নৌকা চোট করেছে হাঙরটা। লোকজনও মেরেছে। ফলে তাদের আনাগোনাও কমে গেছে।

নরহরি মহেশকে দেখে বলে—একটা বিহিত করেন মান্নাবাবু। এদিকে সব বন্ধ হতে চলেছে। দেখছেন তো হাটের অবস্থা। সামনে গঙ্গাসাগর মেলা আসছে। ওই ব্যাটা তো তখন এখানের গাং-এ দক্ষি যজ্ঞ শুরু করবে।

মহেশও ক্রমশ বুঝছে এবার বিপদের গুরুত্ব। সে বলে—এস-ডি-ও সাহেব আসছেন। দেখা যাক কি হয়। পারঘাটের খবর কি বসন্ত?

বসন্ত এসেছিল হাটে। সে বলে—আর খবর কি! লোকজন ভয়ে পারাপার কম করছে। আমদানী পত্তর নাই।

ওদিকে আড়ত বন্ধ হতে চলেছে, পারঘাটের রোজকারও নেই। হাটের আমদানীও প্রায় বন্ধ। একটা শত্রু যেন সারা এলাকার জীবন যাত্রায় স্তব্ধতা আনতে চায়। সকলেই কি অজানা ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

নটবর মাষ্টারকে আসতে দেখে চাইল মহেশ। খবরটা দেয় সে—নোতুন এস-ডি-ও সাহেবের লঞ্চ আসছে।—তাই নাকি। মহেশের খেয়াল হয়। শুধোয় সে—আয়োজন পত্র ঠিক আছে তো? নোতুন ছোকরা আবার নাকি বেশ কড়া। চলো—

গঞ্জের জেলেরাও এসে হাজির হয়েছে নিশাকর, রতনরাও এসেছে। এসেছে নরহরি, রমন ডাক্তার, হাটের কিছু দোকানদার, ভুপতিবাবুও। মহেশ মান্না ঘাটে লঞ্চটা ভিড়তে এগিয়ে আসে—নমস্কার স্যার। এই দ্বীপে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো আমরা ধন্য।

সুমন্ত দেখছে চারিদিকে। ভেড়ির উপর থেকে বেশ কিছুটা দেখা যায়। দূরে বালিয়াড়ির বুকে ঝাউবনের নির্জনে কপিলমুনির মন্দিরটা সাদা বিন্দুর মত দাঁড়িয়ে আছে নীল সফেন সমুদ্রের ধারে।

মহেশ বলে—ওরে হুজুরের মালপত্র নামা। আমার গেষ্টহাউস-এ যেতে হবে স্যার। গরীবের পর্ণ কুটিরই। তবে কোন অসুবিধা হবে না স্যার।

মহেশ সংযোজন করে—এখানে সরকারী বাংলো একটা আছে স্যার। ওই মন্দিরের ওদিকে। খুব নির্জন—আর ব্যবস্থাপত্র সেখানে তামন থাকে না। তাই আমার ওখানেই আপনাদের মত লোকেদের জন্যে থাকা টাকার ব্যবস্থা রেখেছি।

সুমন্ত বলে—না, না। থাকা হবে না এখন। আমার মা সঙ্গে রয়েছেন। কপিল মুনির মন্দিরে যাবেন একবার প্রণাম করতে। আমি রাতে ফিরবো। থাকা হবে না।

—অ। একটু ক্ষুণ্ণ হয় মহেশ। তবু বলে সে—তাহলে গরীবের কুড়েতে চাট্টি ডাল ভাত গ্রহণ করবেন।

হাসে সুমন্ত—লঞ্চেই হবে ওসব। তবে যাবো ওদিকে—চা খাবো।

মনে মনে চটলেও কৃতার্থ হয়েছে এমনি ভাব দেখায় মহেশ—তাই চলুন স্যার। তবে চাট্টি যদি দুপুরে খেতেন—

সুমন্ত বলে—পরে একদিন হবে। এখন তো মেলার সময়, আসতেই হবে প্রায়।

সুধাময়ী দুচোখ মেলে দূর অতীতের সেই ছবিটাকে খুজতে চায়, কিন্তু কিছুই মেলে না। আজ সাগরদ্বীপের রূপ বদলেছে। চারিদিকে এখন বসতি, গঞ্জ গড়ে উঠেছে। নোতুন রাস্তা—বাঁধ হয়েছে। সে দিনের অরণ্য—সেই নির্জনতা আর নেই। তবু বলে সুধাময়ী—এতদূর এসে মন্দিরে পুজা দেবনা সুমন্ত—

মহেশ বলে—আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তার আগেই লঞ্চের সুখানি ছেলেটা বলে—চলুন মা। আমিই মন্দির ঘুরিয়ে আনছি। লঞ্চ ওখানে ধারে ভেড়বিনি। এখান থেকে বালিয়াড়ি ধরে চলি যাবো। ওইতো মন্দির।

সুধাময়ী বলে—তাই ভালো। সুমন্ত তুই বাবা কাজ সেরে আয়। আমি ঘুরে আসি।

সুমন্তের চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটে গেছে। আর তারই আলোচনাও হচ্ছে এখানে। জেলেরা এসে নিবেদন করে তাদের বক্তব্য, বিপদের কথা। এমন ভাবে জানোয়ারের আক্রমণ চললে তাদের রুজি রোজকার বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যাপারীদেরও এককথা, হাট বসবেনা এবার। নরহরি ভটচাযের রোজকারের মরশুম ওই গঙ্গাসাগর মেলা। তার ভয় হয় এমনি কাণ্ড ঘটলে আর লোকজনও হবে না। অনেক দিন আগে এমনি একবার ঘটেছিল।

নরহরি বলে—মেলার সময়, এত লোকজন যাত্রীরা আসবে। ওই জানোয়ারটাকে মারতি না পারলি সব ছত্রভঙ্গ হই যাবে স্যার। সারা দেশ, ভারতের লোক আসবে—

সুমন্ত ভাবছে কথাটা। শুধোয় সে—আপনারা এখানে বাস করেন, এসব উৎপাত তো হয় মাঝে মাঝে। শুনেছি কয়েকটা হাঙরও মারা পড়েছে এর আগে, এটাকে মারতে পারেন না?

সকলেই চুপ করে যায়। ওরা জানে কে মেরেছে সেই হাঙর। কিন্তু অজানা কারণে বলতে রাজী নয়। নিশাকরকে দেখে চাইল সুমন্ত। ওকে দেখলে বোঝা যায় প্রবীণ অভিজ্ঞ জেলে সর্দার। সুমন্ত সুধোয়—কি হে সর্দার! মারতে পারো না ওটাকে?

নিশাকর বলে—পারতো একজন স্যার। ত্যানার সাথে থাকে আমরাই তিন চারটে হাঙর মারছি। কিন্তু তিনি তো নাই এখানে?

—কে সে? সুমন্ত শুধোয়। বলে,—তাকে আনা যায় না?

মাথা নাড়ে নিশাকর—তিনি ঘনশ্যামবাবু, তা তিনি তো জেলে!

কথাটা মনে পড়ে সুমন্তের। বিদায়ী এস-ডি-সাহেবও এই লোকটার নামই করেছিল। সুমন্ত কি ভাবছে। বলে সে—জেলে!

মহেশ মান্না বলে—তার কথা বলবেন না স্যার। আমারই সরকার, ওই যে বসন্ত, ওর মেয়ের উপর জোর করে অত্যাচার করতে গেছল। আমি বাধা দিলাম খুন করতে এল দা নিয়ে। কোন রকমে বেঁচে গেলাম তখনকার বড় দারোগার জন্যে। তারপর ওই মামলায় জেলে আছে। তিন বছরের মেয়াদ—

সুমন্ত এগিয়ে চলেছে। সমস্যাটা গুরুতর বুঝেছে সে। সাধারণ মানুষের বাড়ি ঘরগুলো মাটির, খড়ের। দোকানপত্র কিছু টিনের ছাওয়া। ওদিকে সুন্দর বাগান—বোগেনভিলার লাল হলুদ ফুল ফোটা গেটওয়ালা ছিমছাম একতলা বাড়িটা দেখে চাইল। মহেশ বলে।

গরীবের গেষ্ট হাউস স্যার। আসুন—গেট খুলে ঢুকছে ওরা, সামনে সাজানো বাগান—পুকুর। ওদিকে দেখা যায় মহেশের দোমহলা বসত বাড়ি।

সামনে সারবন্দী ধানের গোলা, গোয়ালে বিদেশী নধর গরুর দল। সব মিলিয়ে একটা অন্য পরিবেশ এখানে গড়ে উঠেছে।

কমলা সেই ঘটনার পর আর এদিকে আসে না। একাই থাকে বাড়িতে। কদম যায় মাঝে মাঝে। তার মুখেই শুনেছে হাজরের খবর।

বসন্তও গজগজ করে—একটার পর একটা পাপ এসে জুটছে। এবার ব্যাটা হাজরের জন্যে মাছের আড়ত বন্ধ হবে। পারঘাটাও বন্ধ না হয়। গঙ্গাসাগরের মেলা আসছে তাও বোধ হয় জমবে না এবার।

কমলা আসে মাঝে মাঝে অযোধ্যাপ্রসাদের কাছে। আর সবাই ভুল বুঝলেও ওই একটি মানুষ তাকে ভুল বোঝেনি। ঘনশ্যামের মামলার রায় বের হবার পরদিন কমলা এখানে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে। অযোধ্যাপ্রসাদও উদগ্রীব হয়েছিল মামলার রায়ের জন্য। শুনেছে সে সব ব্যাপারটা। ঘনশ্যামের জেল হয়ে গেছে।

অযোধ্যাপ্রসাদ তখনই অনুমান করেছিল কোথায় মহেশ মাঝাই ব্যাপারটাকে গোলমাল করে দিয়েছে। এটাকে মেনে নিতে পারেনি। বলে—ধর্মকে বিচারকেও কিনে নিয়েছে আজকের মানুষ। এ বহুৎ খারাপ হোল।

কমলা বলে—আমিই মিছে কথা বলেছি বাবা। কিন্তু না বলে উপায় ছিল না মহেশবাবু নাহলে আমার বাবা মাকেও শেষ করে দিত, আমাকেও ছাড়তো না। বাড়ি এসে শাসিয়ে গেল—আর ওদের জন্যই এতবড় মিথ্যাটাকে মেনে নিতে হয়েছে।

অযোধ্যাপ্রসাদ অবাক হয়—কি বলছিস মা। এতবড় অন্যায় করলো মহেশ ?

কাঁদছে কমলা। স্তব্ধতার মাঝে সমুদ্রের গর্জন ওঠে। হাওয়া হাঁকে ঝাউ-বনে। দু'চারটে পাখীর কলরব ভেসে ওঠে। হঠাৎ কাদের দেখে চাইল অযোধ্যা-প্রসাদ। কমলাও দেখেছে সুধাময়ীকে।

কিছু ভক্ত পূজারী আসে মাঝে মাঝে।

—আইয়ে মাজী। অযোধ্যাপ্রসাদ অভ্যর্থনা করে। সঙ্গের লোকজনরা পরিচয় দেয় ওর—এস-ডি-ও সাহেবের মা এসেছেন পূজো দিতে। নোতুন সাহেবও আসছেন।

সুধাময়ী কমলাকে দেখেছে, শান্ত নম্র চেহারা। দুচোখে কি বেদনার ছায়া নেমেছে। সুধাময়ী শুধোয়—তুমি এইখানেরই মা ?

কমলা এগিয়ে আসে। অযোধ্যাপ্রসাদ বলে—হাঁ মা। আসে মন্দিরে।

খুব ভাল মেয়ে কমলা। তুই ওর পুজোর যোগাড় একটু করে দে মাধি।

সুধাময়ীও খুশী হন।

কমলাই ওর পুজোর আয়োজন করে দেয়।

সুধাময়ী খোঁজ নেয় অযোধ্যাপ্রসাদের কাছে—আপনি কতো দিন এখানে আছেন বাবা?

অযোধ্যাপ্রসাদ জানায়—হোবে বিশ সাল।

একটু হতাশ হয় সুধাময়ী, একটা উদ্দেশ্য নিয়েই সে এসেছিল এখানে। খুঁজছে দুচোখ দিয়ে সুধাময়ী সেই দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগেকার দিনগুলোকে। সেই স্মৃতিটুকু আজ মলিন, বিবর্ণ। তবু ঝরাফুলের সৌরভের মতই সেই স্মৃতি আজ তার মনের অতলে জেগে আছে। একটি কচি মুখ, বারবার এখনও সব অন্ধকারেও জেগে থাকে। সব হারিয়ে গেছে তার।

সুমন্ত দ্বীপের ওদিক ঘুরে সেও এসেছে মন্দিরের কাছে। বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির ওদিকে একটা বড় পুকুর। মেলার অনেক আগে থেকেই দিঘীটায় ব্লিচিং পাউডার—ক্লোরিণ দিয়ে জলটাকে পরিশোধন করা হয়। পাহারা বসে যাতে কোন লোকজন, গরু বাছুর ওই দিঘীতে না নামে। জলের প্রধান যোগান হয় ওখান থেকেই।

মহেশও সঙ্গে রয়েছে। নরহরি, নটবর, কন্দর্প মাহাতো আরও দু'চারজন হুজুরকে নিয়ে ঘুরছে। সুমন্ত বলে—আয়োজন এখন থেকেই সুরু হয়েছে।

মহেশ বলে—ওসব করে ফেলি স্যার। মেলা কমিটি থেকে এগিয়ে নিই কাজগুলো। অবশ্য খরচ যা হয় তা নিয়ে নিই সরকার থেকে।

সুমন্ত বলে—কিন্তু জলের জন্য ডিপ টিউবওয়েল বসানো দরকার। আর খরচের হিসাব-এর মধ্যে যা করেছেন অপিসে পাঠিয়ে দেবেন।

মহেশ মান্না একটু অবাক হয়। কারণ এর আগে যিনি ছিলেন তিনি তাকে খুব ভালো করে চিনতেন, তাই খরচের ব্যাপারে কোন অসুবিধা ছিল না। এই ছোকরা সাহেব সেদিকে যেতে রাজী নয়।

দেখেছে মহেশ একে অন্য উপায়েও খুশি করতে পারে নি। নটবরের হাতে পাঠানো ভেটও ফেরৎ দিয়েছেন, তার বাংলোতে খানাপিনাও করেন নি। আর হিসাবের কথা বলেন সোজাসুজি, মহেশ ঠিক খুশি হয় নি। তবু বলে সে—ঠিক আছে স্যার।

সুমন্ত মাকে আসতে দেখে চাইল। সঙ্গে কমলাও রয়েছে।

মহেশ মান্না ওদের একসঙ্গে দেখে একটু অবাক হয়। অযোধ্যাপ্রসাদও

দাঁড়িয়ে আছে। সুধাময়ী বলে—

সুমন্ত, ঠাকুরকে প্রণাম করে চরণামৃত নিবি চল।

সুমন্ত এসবে বিশ্বাসী খুব নয়, তবু দেখছে সাগরদ্বীপের মানুষের দল দেখছে তাকে, তার অবিশ্বাস, অভক্তিটাকে এরাও ভালো চোখে দেখবে না। তাছাড়া মাকেও সে আঘাত দিতে চায় না। তাই গিয়ে জুতো খুলে প্রণাম করে মন্দিরে, চরণামৃত মাথায় ঠেকিয়ে বের হয়ে এল।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে তারা গঙ্গের দিকে। সুধাময়ী দেখছে চারিদিক। এখন শূন্য বালিয়াড়ি, ঝাউবন, সমুদ্রের নীল জলে ঢেউ ফাটছে। কমলা বলে—এবার মেলার সময় আসবেন তো?

চমকে ওঠে সুধাময়ী। গঙ্গাসাগর মেলায় একবার এসে তার অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। দেবতাকে তবু অখুশি করতে পারে না। বলে সে—যদি ঠাকুর টানেন আসবো মা, তুমিও সহরে যেতে পারো একদিন।

সহরে গেছে কমলা একবার। একজনের চরম সর্বনাশ করে এসেছে সে ওখানে গিয়ে, তাই সহরে যাবার নামেই তার কেমন ভয় হয়। চুপ করে থাকে সে। নিজের জীবনের চরম বিপর্যয়ের কথাটা ওকে জানাতে পারে না। তার মনের অতলেই সেই দুর্বলতার কালিমা ঢাকা থাক।

সুমন্ত জেলেপাড়ার লোকদের দেখে চাইল। এতদিন ধরে লোকগুলো লড়াই করেছে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে। তাদের ঘরবাড়ির পোড়া ছাই-এর দাগ এখনও মিলোয় নি। তারই আশেপাশে ঝুপড়ি তুলে কোন রকমে বেঁচে আছে তারা।

নটবর মাষ্টার সরকারী সাহায্য বেশ কিছু বের করেছিল। কাপড়, কম্বল, নগদ টাকা, চাল ; কিন্তু তাও তাদের কাছে পৌঁছোনি। দু'একজনকে নামমাত্র কিছু দিয়ে বাকী সব কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

তাদের কাছে এই খবরটাও অজানা থাকেনি, তাই ক্ষোভটা ছিল। আজ খোদ কর্তাকে এই দিকে আসতে দেখে নিশাকর সর্দার, রতন, যতীন, কদমরা এগিয়ে আসে। নিশাকর বলে।—হুজুর একটা আর্জি ছিল আমাদের!

সুমন্ত দাঁড়িয়েছে। মহেশ মান্না ধমকে ওঠে।—তিন পহর বেলা হয়ে গেছে, হুজুরের নাওয়া খাওয়া হয়নি, ওরা এল আর্জি পেশ করতে? যা—এখন পথ ছাড়।

ওরা ঘাবড়ে গেছে। জোর করে কোন দাবীই ওরা জানাতে পারে নি। আজও তাদের মুখ বন্ধ করতে চায় মহেশ।

সুমন্ত বাধা দেয়।—না, না। বল তোমরা কি বলবে।

মহেশ চুপ করে যায়। নিশাকর, রতনরা আজ জানায় ওদের দুর্দশার কথা। পোড়া ঘরের ছাইত রয়েছে। নিশাকর বলে—আগুনে সব গেছে। এ আগুন কে লাগিয়েছে তা জানি না হুজুর। তবে তারা আমাদের সমবায়কে তুলে দিয়েছে। ঘনাবাবুকেও কয়েদ করিয়েছে, আগুন লাগার পর সরকার থেকে ট্যাকা, কাপড়, কম্বল, গম—সব এসেছিল। কিন্তু আমরা কিছু পায়নি হুজুর।

সুমন্ত চাইল ওদের দিকে।

মহেশ মান্না বলে—আমি খবর নিচ্ছি স্যার। তবে রিলিফ তো দেওয়া হয়েছে অঞ্চল থেকে। কি হে নটবর মাষ্টার?

রতন বলে—কার নামে কোথায় গেছে সে সব জানি না হুজুর। আমরা পাইনি সে কতাই বলছি।

নিশাকর বলে—ওসব ভিক্ষে না হয় নাই দেলেন হুজুর। কিন্তুক গাং-এ এক জানোয়ার আসিছে হুজুর। রোজ নৌকা, বুড়াই মানুষরে মারছে। গাং-এ আমাদের জেবন, রুজিরোজকার। মাছ মারি খাই, সি পথও বন্ধ হতিছে হুজুর। একটা বিহিত করেন—নালি ভিক্ষা দিই কত দিন বাঁচাবেন।

জানোয়ারটার আদিম হিংস্ররূপ দেখেছে নিজে সুমন্ত। ওর ভয়েই গাং-এর ধারের গ্রামগঞ্জের লোক শিউরে উঠেছে। সুমন্ত বলে—দেখছি আমি কি করা যায়।

মহেশ বলে—আমিও দেখছি স্যার। ওটাকে মারবোই।

—তাই দেখুন।

এগিয়ে চলেছে সুমন্ত। নিশাকর বলে সেই এক কথা—মারতি যে পারতো সেই ঘনাবাবু নাই, তাই উপদ্রব বাড়তিছে। কথাটা সুমন্তও কয়েকবারই শুনেছে।

দুপুর গড়িয়ে বৈকাল নামছে। সুধাময়ীর একটা দিন কোন দিকে কেটে গেল এই গঞ্জে—দ্বীপে এসে। এর চেহারা এখন আমূল বদলে গেছে। অতীতের দেখা সেই অরণ্য-আদিম দ্বীপকে আজ মানুষ নিজেরা দখল করে এর চেহারা বদলে দিয়েছে। নোনা মাটিকে বশ করে সুফলা করে তুলেছে।

সুমন্ত শুধোয়—কেমন লাগলো মা দ্বীপটাকে?

সুধাময়ী বলে—ভালোই বাছা। ওই কমলাকেও দেখলাম—এমনি দ্বীপেও লেখাপড়া জানা সভ্য মেয়ে রয়েছে। ওরা দেখলাম মহেশবাবুর উপর

মোটেই খুশি নয়। ওই লোকটা নাকি খুব লোভী, আর অত্যাচারী।

সুমন্তও বুঝেছে সে। এই দ্বীপের সব কিছুকে গ্রাস করতে চায় ওই লোকটাই। তার নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে চায়। ওর চারি পাশের মানুষগুলোকেই দেখেছে সে। বার বার মনে হয়েছে ওই ঘনশ্যামের কথা উঠলে লোকটা সেই প্রসঙ্গ চাপা দিয়েছে। কমলাকেও সেই বাড়ি পাঠিয়েছে। যেন কমলা তার মায়ের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকুক এটা মহেশ চায় না। অবশ্য ধূর্ত লোকটা এমনি ভাবখানা দেখিয়েছে যে বাইরের ওরা থাকলে মজুরদের অসুবিধা হচ্ছে।

লঞ্চটা জল কেটে চলেছে। সুমন্ত এবার তার হেভি রাইফেলটা কাছেই রেখেছে। এই ফোর সেভেন ফাইভ রাইফেল দিয়ে এক গুলিতে সে হাতি মেরেছে, বাঘও মেরেছে। নদীর বুকে জানোয়ারটাকে দেখতে পেলে ওর চোখ লক্ষ্য করে গুলিই চালাবে সে। তবু সে ভাবে হোক ঘায়েল করতে পারবে।

গাং প্রায় ফাঁকা। নেহাৎ দরকার ছাড়া কেউ বের হচ্ছে না গাং-এ। ছোট ডিঙ্গিগুলোও নেই। বড় গহনার নৌকা গোটাকয়েক আছে তাই দিয়ে কিছু লোক প্রাণ হাতে নিয়ে এই দীর্ঘ কয়েক মাইল চওড়া খাড়ি পারাপার করে মেনল্যাণ্ডএ আসছে নাহয় ঘরে ফিরছে কাজ সেরে।

খুঁজছে সুমন্ত, কিন্তু এতবড় অকূল গাং-এ সেই জানোয়ারটার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। কোথায় হারিয়ে গেছে সে। জেলেদের সেই কথাগুলো ভোলেনি সুমন্ত। সামনে আসছে গঙ্গাসাগর মেলা—তার আগেই ওটাকে মারতেই হবে।

ঘনশ্যামের নামটা মনে পড়ে। একটা প্রশ্নের মত অচেনা সেই ঘনশ্যাম-এর নাম তার সামনে হাজির হয়েছে।

সুধাময়ী অজানা আতঙ্কে চুপ করে গেছে। বুড়ো সারেংকে সে শুধিয়েছে —এই গাং-এর খবর। নৌকা ডুবলে কি হয় লোকজনের?

সারেং বলে—সি বড় বিপদের মা। ই গাং-এ ঝড় তুফানের সময় লা ডুবলি কি আর থির গাং-এ নৌকা ডুবলি কি একই কথা। নদীতে আছে কামট, ওরা গা থেকে ধারাল দাঁতদিই খুবলি মানুষেরে খাই শেষ করে। খা বিষায়ে যায়। আর কুমীরও আছে। লা ডুবলি ওরা জানতি পারে। আসি ভোজ লাগায় মা।

ভাবতে পারে না সুধাময়ী সেই দৃশ্যটা।

সুমন্ত চেয়ে আছে গাং-এর দিকে। লঞ্চটা জলকেটে চলেছে—দূরে দেখা

যায় এপারের তটরেখা। ক্রমশ কাছে আসছে সবুজ মাটির ইশারা।

বাংলোতেই ফিরেই পুলিশ ইনস্পেক্টারের ফোনটা পায় সুমন্ত। পুলিশও খবর রাখছে এবার। ইনস্পেক্টার বলে—আজ হাঙরটা দুজায়গায় হানা দিয়ে আবার লোক মেরেছে স্যার। কাকদ্বীপের গাং তারপর দুপুরে কুলতলির গাং। নৌকা ডুবে আরও তিন চারজন লোক মারা গেছে।

সুধাময়ী কথাটা শুনে অবাক হয়—সে কিরে। হাঙরটা এইসব করছে? কি বিপদ বলদি.ক?

সুমন্ত বলে ইনস্পেক্টারকে—সদরে আমিও রিপোর্ট করছি, আপনিও একটা রেডিও গ্রাম পাঠান। যাহোক একটা ব্যবস্থা না নিলে এখানের মানুষজনও সহ্য করবে না।

—দেখছি স্যার! খুব ঝামেলায় ফেললে জানোয়ারটা।

সুমন্ত কথাটা ভেবেছে। তাই পরদিন অপিস এসেই মহাফেজখানা থেকে পুরোনো রেকর্ড—এখানের পত্রিকা উপকূল-এর পুরোনো কিছু সংখ্যা আনিয়ে দেখছে। বলিষ্ঠ একটি তরুণ সমুদ্রের হাওয়ার মত উদ্দাম তার চোখ মুখ, বিরাট হাঙরটার পিঠে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছে। অন্যটায় লঞ্চ-এর উপর দাঁড়িয়ে নীচের ভঙ্গিতে একটা হাঙর চাপানো ছেলেটির চোখমুখের কাঠিন্য ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে একটি ঋজুতা, সারল্য। ওর সঙ্গীদের মধ্যে সাগরদ্বীপে দেখা সেই প্রবীণ নিশাকর সর্দার আরও দু চারজন রয়েছে। বিস্মিত হয় সুমন্ত কি ভাবে এতবড় জানোয়ারগুলোকে মেরেছে সে। বিশেষ কোন নিজস্ব রীতি ওর আছে। নাহলে ছোট খাটো তিমির মত এই হাঙরগুলোকে ওদের মারার অনেক আধুনিক অস্ত্র বের হয়েছে, সে সব কিছুই দেখা যায় না।

সুমন্তের পি-এ ঘনশ্যামের মামলার ফাইলপত্রও এনে দেয়।

সুমন্ত দেখছে কেস-এর রিপোর্টগুলো, ফাষ্ট পুলিশ ইনফরমেশন—তারপরের এনকোয়ারী রিপোর্ট—মহেশ মান্নার জবান বন্দী, সাক্ষীদের জবান বন্দী সবই। কিন্তু ঘনশ্যামের তরফের কোন সাক্ষীই নেই। কমলা জানার সাক্ষীর উপর আর দারোগার রিপোর্ট-এর উপরই বিচার হয়েছে আর সে বিচারেই শাস্তি হয়েছে তার। সুমন্ত তারিখটা দেখছে, শুধোয় সে—কোন আপীল করেনি আসামী?

ওর পি-এ জানায়—খোঁজ নিয়ে জানলাম স্যার, ওর এক কাকা আপীলের দরখাস্ত নিয়ে গেছলো আসামীর কাছে। ঘনশ্যাম আপীলের দরখাস্ত সই করেনি।

অবাক হয় সুমন্ত। শুধোয় সে—কেন?

তরুণ পি-এ বলে—ঘনশ্যাম-এর মেজাজ স্যার ভয়ানক, আর তেমনি এক-গুঁয়ে। ও বলে—আপীলে কাঁচকলা হবে। কি দরকার এসবে? সবাই সমান। ওদের কাছে আর বিচারের আশা নিয়ে দাঁড়াবো না। জেলই খাটবো।

—ষ্ট্রেঞ্জ। সুমন্ত কি ভাবছে।

মনে হয় কোথায় একটা ভুল হয়েছে। একটা কঠিন অবিচারই হয়ে গেছে তাজা ওই তরুণটির উপর। সেই অভিমানে সে আর বিচারের প্রাঙ্গনে আসতে চায় না। তার কাছে হয়তো বিচারের নামে অবিচারই হয়েছে। মহেশ মান্নার কথা মনে পড়ে। নিজে দেখে এসেছে সুমন্ত ওই লোকটাকে। দ্বীপের মানুষজনকে সে দাবিয়ে রেখেছে। আর তার মত লোক দ্বীপের সবকিছু গ্রাস করতে চায়। নিজের স্বার্থে—সে সবকিছু করতে পারে। জেলেদের মুখে—সাধারণ মানুষ, মায় মন্দিরের পূজারী অযোধ্যাপ্রসাদের মুখে সে শুনেছে ঘনশ্যামের কথা। ওরা তাকে ভালোবাসে। জেলেদের নিয়ে সমবায় করেছিল। আবার সেই সমবায় ভেঙে গিয়ে এখন জেলেদের অনেককেই বাধ্য হয়ে মহেশের আড়তেই যেতে হয়েছে।

সুমন্ত তার যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে এই ঘটনার পশ্চাৎপটটাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে থাকে। ফরিয়াদী এখানে মহেশ মান্নাই। তারই দরকার হতে পারে ঘনশ্যামের মত জনপ্রিয় তরুণকে ওর এলাকা থেকে সরিয়ে দেবার। কিন্তু এর মধ্যে—একটি মেয়েও এসে গেছে। সাধারণ ভদ্রঘরের মেয়ে কমলা জানা। কি ভাবছে সুমন্ত। মায়ের সঙ্গে একটি মেয়েকে দেখেছিল সে, মন্দির থেকেই মায়ের সঙ্গে আসছিল। শান্ত, নম্র একটি মেয়ে। তার নামও যেন কমলাই। মাকে ওই নামে তাকে ডাকতে শুনেছিল। তাকে কেন্দ্র করেই কি এই ঘটনা ঘটেছিল। মনে পড়ে সুমন্তের সেই মেয়েটির বাবা মহেশবাবুর ওখানেই কাজ করে।

—স্যার।

সুমন্ত চাইল তার পি-এর ডাকে।

—কুলতলি থেকে ওখানের অঞ্চল প্রধান, আরও কিছু লোকজন এসেছে স্যার। তারা একবার দেখা করতে চায়।

সুমন্ত বলে—আমি এখন ব্যস্ত। কি ভেবে শুধোয় সে—দেখা করতে চায় কেন?

পি-এ বলে—সেই হাঙরটা আজও আবার হানা দিয়েছে। এই ক'দিনে আট নটা মানুষ মেরেছে। ওরা তাই নিয়ে এসেছে স্যার। দু' তিনজন

কান্নাকাটিও করছে।

—ওদের নিয়ে এসো।

পায়চারী করছে সুমন্ত। সারা ঘরের চেয়ারগুলো ভর্তি—বাকী চাষী, মাঝি, জেলেরা মেঝের কার্পেটেই বসেছে। একজন কাঁদছে—ছেলেটাকে নিয়ে গেল হুজুর ওই শয়তান!

অঞ্চল প্রধান বলেন—একটা ব্যবস্থা করুন।

সুমন্ত বলে—সদর থেকে লঞ্চ আসছে যন্ত্রপাতি, জাল নিয়ে। ট্রলারও আসছে। দেখা যাক কি হয়।

কে বলে—ঘনশ্যামবাবু থাকলি একটা বিহিত হতো স্যার! ওনারা এ গাং-এর কি বোঝবেন। দ্যাখেন কি হয়। নালি পথ বন্ধ, জাল বন্ধ, কাঠ কাটাই বন্ধ হবে ঘেরিতে, আমরা কি করে বাঁচি হুজুর! একই কথা, একই সমস্যা। একটা কালো ছায়া যেন এদের জীবনের সব আশার আলোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। সমাজের বুকে অমঙ্গল—অকল্যাণ আর কিছু মানুষের লোভ যে বিপর্যয় আনে, অদৃশ্য ওই জানোয়ারটা সারা এলাকার মানুষের জীবনে সেই বিপর্যয় এনেছে।

সুমন্ত ভাবছে। একটা পথ তাকে বের করতেই হবে।

বৈকালের শেষ আলো গাং-এর বুকে মুছে মুছে যাচ্ছে। শীতের গাং—থির নিথর। দু একটা মহাজনী নৌকা পাল তুলে চলেছে। ট্রলারটা দুদিন এসেছে এই দিকে। বিদেশী ট্রলার-এর মাষ্টার ডি-সুজা ক'দিন ঘুরছে গাং, কিন্তু কোন কিছুই করতে পারেনি। এর মধ্যে হাঙরটা আরও ব্যাপকভাবে আক্রমণ শুরু করেছে।

ট্রলারের মাষ্টার ডি-সুজা বলে—সাইট করলো, বাট্ ডুবে গেল—সিধা উস্‌পার গাং-এর থেকে দুটো বোট হিট্ করে আদমী লিয়ে ভাগলো।

ব্যাপারটা আর একটা দ্বীপের মধ্যে সীমিত নয় সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে জমাট আতঙ্ক। আর মানুষগুলোও এইবার সরকারের বিরুদ্ধেই ক্ষেপে উঠছে। মহকুমা শহরের পথে পথে সেদিন এলাকার বহু সাধারণ মানুষ এখানের এম-এল-এ, অন্যান্য প্রতিনিধিদের নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা বের করেছে। গাং-এ সরকার থেকে ছোট ডিঙি চলাচলও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবুও সাধারণ মানুষকে বের হতে হয় গাং-এ আর বিপদও ঘটে চলেছে প্রায়ই। খবরের কাগজওয়ালারাও এই ফাঁকে বেশ মুখরোচক সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে বিরাট ভাবে। যেসব লোক মারা যাচ্ছে—তাদের আত্মীয় স্বজনের

কান্না ভরা মুখের ছবি, উদগ্রীব জনতার বিক্ষোভ—সব নিয়ে খবরের কাগজও তাদের ভূমিকা নিয়েছে।

ডি-এম সাহেবও এসে পড়েন সদর থেকে।

সুমন্ত বলে—চেষ্টা করছে স্যার। দুটো ট্রেলার ঘুরছে এলাকায়।

ডি-এম বলেন—কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। সেই হাঙরটা এর মাঝেও রোজই 'কিল' করছে। সামনেই গঙ্গাসাগর মেলা। সারা ভারতবর্ষ থেকে তীর্থযাত্রী আসবে। সেণ্ট্রালের মন্ত্রীরা—আমাদের রাজ্যপাল—চিফ মিনিষ্টারও কেউ যেতে পারেন। কিন্তু তার মধ্যে এই হাঙরটাকে না মারতে পারলে—যাত্রীরা যাবে কি করে? নৌকা, ডিঙিতো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—

সুমন্ত কদিন ধরেই ভেবেছে কথাটা। যেখানেই গেছে, শুনেছে ধনশ্যামের কথা। আর সে নিজেও শিকারী। এতদিন বনে বনে 'বিগ গেম' শিকার করেছে। জলের জানোয়ার শিকার করতে পারেনি। মনে হয় তেমন লোক পেলে সেও হাত লাগাবে জানোয়ারটাকে মারতে। সুমন্ত বলে—একজন এখানে আছে স্যার। এর আগে সে তিন চারটে হাঙর মেরেছে। সারা এলাকার লোকই বলে—সে কিছু করতে পারতো।

ডি-এম সাহেব শুধোন—তাহলে সে এগিয়ে আসছে না কেন? সারা এলাকার মানুষের এতবড় বিপদে সে চুপ করে আছে কেন? সরকার থেকে তাকে যা দরকার সাহায্য দেওয়া হবে—তুমি একবার নিজে তার সঙ্গে দেখা করো। যেভাবে হোক তাকে রাজী করাও। লেট হিম ট্রাই।

সুমন্ত বলে—কিন্তু সে এখন জেলে স্যার। এখানের জেলেই রয়েছে।

ডি-এম একটু হতাশ হন—আই সি।

সুমন্ত বলে—কোথায় একটা ভুল হয়ে গেছে স্যার। মামলাটা মনে হয় কেস টেস, সাজানো।

ডি-এম বলেন—তাহলে আপীল করেনি কেন?

সুমন্ত শোনায়—মনে হয় তার মত জেদী মানুষের ইগোতে কোথায় বেধেছে, সে ভেবেছিল ন্যায় বিচার হবে। সত্যকে এভাবে বিকৃত করা হবে তা ভাবেনি। তাই হয় অভিমান করেই আর প্রতিবাদ করেনি। মুখবুজে এটাকেই মেনে নিয়েছে।

সে পরের কথা স্যার। কিন্তু দরকার হলে তার বিশেষ যোগ্যতাকে সাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজে লাগাতে হবে। তার জন্য তাকে 'প্যারোলে' কিছুদিনের জন্য বাইরে আনা যেতে পারে।

ডি-এম বলেন—তারপর লঙ্ক নিয়ে সে যদি পালায়?

সুমন্ত বলে—তার সঙ্গে আলাপ করে দেখি মানুষটা কেমন। তবে যে রকম তেজী আর জনপ্রিয় তাতে সে ষোল আনা 'সৎ' হবে এতে সন্দেহ আমার নেই। দরকার হলে আমিই তার সঙ্গে লঞ্চেও থাকবো।

ডি-এম কি ভাবছেন। বলেন তিনি—দ্যাখো আলাপ করে। আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকী সাগর মেলার। তার মধ্যে সামথিং মাষ্ট বি ডান সুমন্ত। পাবলিক—প্রেস—মায় সরকার আমাদের ছেড়ে দেবে না।

বিরাট সাগর মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

চিফ ইন্‌জিনিয়ার—লঞ্চ নিয়ে সাগর দ্বীপে এসে তদারক করছেন।

মহেশ মান্নার রেষ্ট হাউসেই অধিষ্ঠান হয়ে ওদিকে মেলার বিস্তীর্ণ বালুচরে ক'দিনের জন্য অস্থায়ী তীর্থ নগরী গড়ে তুলছেন। মহেশ মান্নার সময় নেই। গজেনও ব্যস্ত। এখন মাছের আড়ত বন্ধ। জেলেরাও জলে নামছেনা ভয়ে। ফলে এখানেই ব্যস্ত রয়েছে গজেন। মহেশ মান্নার আইন কানুন এখানে আলাদা। ওদিকের বিস্তীর্ণ খাড়ি পার করে সে সব মালপত্র ডিঙি ছোট বড় নৌকায় করেই আনছে।

গুপীনাথ তদারক করে—জলদি নামা মাল।

বাঁশ, হোগলার রাশি, করোগেট টিন—তাঁবু সবই নামছে। বালিতে বিজলীর পোল পোতা হচ্ছে, মজুররা বালিকেটে জলের পাইপ লাইন বসাচ্ছে। মাঝে মাঝে মিস্ত্রীরা ইট, সিমেন্ট দিয়ে জলের রিজার্ভার তৈরী করছে। মহেশ মান্না ক'দিন থেকে কাজ শুরু করেছে—হঠাৎ দূরে লঞ্চটা দেখে গজেন বলে—এস-ডি-ও সাহেবের লঞ্চ মনে হচ্ছে গো।

মহেশ মান্না এক নজরেই লোক চেনে। প্রথম দিনই ওই তরুণ এস-ডি-ও কে দেখে তার ঠিক পছন্দ হয় নি। আজ ওকে আসতে দেখে বলে—ইন্‌জিনিয়ার সাহেব কোথায় খবর দে। গজেন, আরও লোকজন—ডিঙি লাগিয়ে মাল খালাস করে ওদের আবার এই গোনো কাকদ্বীপে পাঠা। ছোকরা এস-ডি-ও কাজ দেখতে আসছে। কম্মের ঢিকি। মহেশ মান্নার কাছে আইন হিসেব। এই মহেশ মান্না অবশ্য এখন বিনয়ের অবতার।

সুমন্ত নেমে এসে বালিচরে কাজ দেখছে।

মহেশ বলে—বারো বছর এই মেলার কাজ করছি স্যার। প্রায় এক যুগই বলতে পারেন। দেখবেন সব ঠিক টাইমেই হয়ে যাবে।

গজেনের হাঁক ডাক শোনা যায়।

সুমন্ত বলে গাং-এর দিকে চেয়ে—গাং-এ কিলার শার্ক 'ঘুরছে' প্রায়ই হামলা করছে। ছোট ডিঙি নামিয়েছেন?

ওতে তার লাভ বেশী। মহেশ অভয় দেবার ভঙ্গীতে বলে—ও নিয়ে ভাববেন না স্যার।

হঠাৎ কলরব আর্তচীৎকার ওঠে গাং-এর দিকে। সমুদ্রের এদিকে ঢেউগুলো তীরে এসে ভাঙছে, জায়গাটা একটু গভীর। জোয়ারের সময় নৌকাগুলো ঠেলে উঠেছে। ডিঙিটা মাল নিয়ে আসছে। হঠাৎ ওদিকের গাং-এ ভেসে ওঠে সেই জানোয়ারটা, ওর দুটো চোখ লালচে ঝিল্লির মধ্যে জ্বলছে, হঠাৎ হাঙরটা সমুদ্র মুখে ঘুরে গিয়ে ল্যাজের ঝাপটায় ডিঙির ওপর থেকে লোকটাকে ছিটকে ফেলে দিল সমুদ্রে, তার আর্তচীৎকার আর শোনা যায় না। তলিয়ে গেল সে। হালটাও ছিটকে ভেঙে পড়েছে ল্যাজের ঝাপটে, ডিঙিটা কাৎ হয়ে গেছে, জল ঢুকছে। পাইপ করগেট সিট-এর ভার নিয়ে ডিঙিটা তলিয়ে গেল। আশপাশের ডিঙিগুলো এসে তীরে ঠেকেছে। মাঝি কুলীরা লাফ দিয়ে পড়ে দৌড়চ্ছে বালিয়াড়ির দিকে। নিমেষের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে যায়। কলরোল ওঠে।

গুপীনাথ চীৎকার করে—নৌকা ঝুড়ি গেল মালসমেত—

কেউ আর জলের দিকে যেতে চায় না। মহেশ গর্জাচ্ছে—ভয়ে পালিয়ে আসবি লোকসান করে?

লোকগুলো ভীত কণ্ঠে বলে—আর যাবো নাই বাবু।

সুমন্তের চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটে যায়। সুমন্ত বলে—কেন ছোট ডিঙি নামিয়েছেন মহেশবাবু? কোন হুকুম মানবেন না?

মহেশ চুপ করে থাকে।

সুমন্ত বলে—পুলিশে রিপোর্ট দিন। ওই লোকটার আত্মীয়কে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর আজ থেকে ছোট ডিঙি নামাবেন না। জেটি বানান—লঞ্চ দিয়ে বার্জ টেনে না হয় গাদাবোটে মাল আনতে হবে।

অর্থাৎ লাভের গুড় পিঁপড়েতেই মেরে দেবে। এমন বিপদে মহেশ মান্না কোনদিন পড়েনি। অসহায় রাগে গজগজ করছে সে। তবু বলে—দেখছি স্যার আমি তাই করছি। আর ওই ব্যাটা হাঙরের দফা আমিই শেষ করবো।

সুমন্ত বলে—যা করবেন করুন, অযথা কোন রিস্ক নেবেন না।

মহেশ মাথা নাড়ে—তাতো বটেই স্যার। তবে দেখবেন আমি যখন হাত লাগাচ্ছি—একটা বিহিত হবেই।

সুমন্ত এগিয়ে চলেছে গঞ্জের দিকে।

মহেশ অনুনয় করে—স্যার, একটু চা হবে না?

—থাক। সুমন্ত চলে গেল।

মহেশ বলে—গজেন, দ্যাখতো ওই ব্যাটা সাহেব কোনদিকে যাচ্ছে। ওর ভাবগতিক ভালো বুঝছি না।

নিশাকর সর্দার—রতনরাও খবর পেয়েছে—সাহেব এসেছেন। ক'দিনেই সাগর দ্বীপে বেশ একটা কাণ্ড ঘটেছে। নটবর মাষ্টারকে শহরে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে সাহেবের অপিসে ওদের রিলিফের হিসাবপত্র চেয়েছিল। পরদিনই নটবর এসে জেলে পাড়ায় গিয়ে ঘর ঘর কিছু কম্বল, কাপড়, গম, টাকাও দিয়ে টিপছাপ নিয়েছে। রতন বলে—কি গো সর্দার, হঠাৎ ছুটু ম্যাষ্টার দানছত্তর করতি এলো ইখানে। নিশাকর হাসে। বলে সে—যা দিচ্ছে লিয়ে নে। সিবার দেয়নি কিছুই। একাই গাপ্ করেছেলো। সিদিন সাহেবকে বলতে বোধ হয় হুড়কো খ্যাছে, তাই ছুটে আইছে।

শীতের দিন, তবু কম্বল কাপড় পেয়ে কাজ হয়েছে তাদের। জালে যেতে পারে না। তবু ধান উঠছে—মাঠে কিছু কাজ পেয়েছে তারা। সাহেবকে দেখে এগিয়ে আসে—পেন্নাম হুজুর!

সুমন্ত আজ ওদের অনেকের গায়ে নোতুন কম্বল দেখে মনে মনে হাসে। শুধোয় সে—তাহলে কম্বল পেয়েছো?

নিশাকর বলে—উ ছুটু ম্যাষ্টেরই গায়েব করতো হুজুর, তা আপনার দয়াতেই পালাম। তায় হুজুর, গাং-এর শয়তানটারে মারি দ্যান—নালি আমাদেরই মরতি হবে। দ্যাখেন কাম কাজ নাই—আর উ মহেশবাবুর কাজে আমাদের ডাকবে নি।

সুমন্ত শুনছে ওদের কথাগুলো।

নিশাকরই বলে চলেছে ঘনশ্যামকে নিয়ে তাদের সমবায় করার কথা।

মহেশ মান্না তাদের সব রোজকার লুটপাট করে নিত।

—কমলা কে!

নিশাকরই জানায়—বসন্ত মাষ্টারের মেয়ে গো!

মাইতি মশায়ের জমি নিয়েছে মহেশ মান্না, পারঘাটার ডাকের নোটিশ চেপে রেখে পঁচিশ বছরের ইজারা করা ঘাটও ছিনিয়ে নিয়েছিল মহেশ ঘনশ্যামের বাবার কাছ থেকে।

নিশাকর বলে—সবই ওই মহেশ মান্নার কারসাজি হুজুর। ঘনাবাবুর জেলে দিইছে ওই শালো। সারা দ্বীপের মধ্যে একটা মানুষের মতমানুষ ছেলো; গরীবের মা বাপ, তিনি থাকলি আজ আমরা মরতাম না, সবই অদেষ্ট সাহেব!

সুমন্ত ভাবছে কথাটা। মাইতি পরিবারের সঙ্গে, ঘনশ্যামের সঙ্গে, কমলার এত নিবিড় পরিচয়। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে সে ঘনশ্যামের বিরুদ্ধে ওই

অভিযোগ স্বীকার করলো কেন ?

সুমন্ত বলে—এটা আমি বুঝতে পারছি না সর্দার। এ কি করে হয় ? সব জেনে শুনে কমলাদেবী এই কথা বলবে কেন।

নিশাকর কানাঘুসোয় শুনেছে সবই। দ্বীপের অনেকেই তা জানে। কিন্তু মহেশ মান্নার ভয়ে প্রকাশ্যে সে কথা বলার সাহস কারো নাই। নিশাকর বলে—বাদাবনের কানুন একটু আলাদা হুজুর। এখানের গাং-এর জলে কুমীর কামট, হাঙ্গর থাকে। ডাঙাতেও তেমনি হাঙ্গর আছেন গো। তাদের হুকুমে সব উলটে পালটে যায়। না হলে—

সুমন্ত এর আগে মধ্যপ্রদেশের বোহাড় অঞ্চলের কোন মহকুমার চার্জে ছিল। সেখানের মানুষকে দেখেছে ডাকাতদের ভয়ে মুখ বুজে থাকতে। কোন মামলাই টেকানো যায় না সাক্ষীর অভাবে। কি ভাবছে সুমন্ত। নিশাকররা এগিয়ে আসছে। ওদেরই একজন দেখায়—

—ওই তো বসন্ত মাষ্টারের বাড়ি। ওরই মেয়ে কমলা দিদি! ওই তো—ভেড়ির ওদিকে কাকে দেখে দাঁড়ালো সুমন্ত। মেয়েটিকে সেদিন মায়ের সঙ্গে দেখেছিল। ওদের দেখে কমলা সরে গেল বাড়ির ভিতর।

সুমন্তের মনের অতলে একটা প্রশ্ন জেগেছে। বার বার মনে হয় কোথায় একটা অপচেষ্টা ঘটেছে সত্যকে চাপবার, আর তাই একজন নিরাপরাধ লোক পচছে জেলের অন্তরালে। অনেক ঘটে এমন ঘটনা। বিচার সেখানে পরিণত হয় প্রহসনে। তবু সুমন্তের কাছে এটা একটা করণীয় কৃত্যে পরিণত হয়েছে। ঘনশ্যামকে তার দরকার। আর এই ঘটনার মূলে কি আছে তাও জানতে চায় সে। সেই সত্যকে উদ্ঘাটন করতেই হবে। বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঘনশ্যামের হাঙ্গর মারার ছবিগুলো। তাকে ওর দরকার।

অঘোর সরকার এখন দ্বীপে পড়ে আছে কি কর্তব্যের জন্যই। পিসী গিরিবালা বলে—আর কি অদেষ্টে আছে কে জানে দাদা।

অঘোরের কাছে এ দ্বীপের রূপ বদলে গেছে। ও ভাবতে পারেনি কমলাও এমনি কথা বলবে আদালতে দাঁড়িয়ে। গিরিবালা বলে—সবই ওই অদেষ্ট দাদা। নালে এমনি হয়। তবু আমি জানি দাদা, ঘনশ্যাম এ কাজ করেনি। করতে পারে না। অঘোর সরকারও তা জানে। তবু আপীলের দরখাস্ত সই করলো না কেন। গিরিবালা বলে—সেখানেও ওরা এই কথা বলবে দাদা। তাই ঘনশ্যাম আর সই দেয় নি।

অঘোর সরকার বলে—তাই বলে এত বড় অপবাদ, শাস্তি মুখবুজে মেনে

নেবে। গিরিবালা বলে ওঠে—তবু কপিল মুনি যদি সত্যি হয়। দেখবে এর বিহিত হবেই।

জানে না অঘোর কি করে তা হবে।

সামান্য জমি জায়গার ধান তোলা হচ্ছে। মেলার ঝামেলার আগেই এসব চুকিয়ে নিতে হবে। কমলাও আর আসে না। আসে শুধু জেলেপাড়ার নিশাকর, রতন, কদমরা। নিশাকরই ধান পত্র তুলে দেয়। ওদের খোঁজ খবর নেয় ওরাই।

নিশাকর বলে—তিন বছর ক্যাদ্দিন গো দিদি?

খামারে বসে থাকে গিরিবালা ধুসো চাদর গায়ে দিয়ে রোদপিঠ করে। কাজ-এর চাপও নেই। সময় কাটে না তাদের। গিরিবালা বলে—অনেক-দিন রে নিশা। তবু ত্যাদ্দিন বাঁচতে হবে রে। আমার ঘনশ্যামের যে আর কেউ নাই রে। ঘরে ফিরে আসবে ঘনশ্যাম—তারপর বিয়ে দেব ওর। ওকে ঘর সংসারে থিতু করে তবে—

নিশাকরও ভাবে তারই কথা। বয়স হয়েছে তার। এ্যাদ্দিন তবু কি আনন্দ আশা নিয়ে খেটেছিল। একটা মাত্র ছেলে গুপীনাথ, সেও তাদের দেখে না। নিশাকরও তার কোন প্রত্যাশা করে না। বলে সে—ছোটবাবু ফি'রে গো। নির্ঘাস দেখে যাবো। সেদিন নিশাকরই কথাটা বলে সরকার মশায়কে, নোতুন ছোকরা এস-ডি-ওর কথা। কদিন আগে মাকে সঙ্গে করে এখানে এসেছিল। ঘনশ্যামবাবুর খোঁজ খবরও নিচ্ছিল। তার মামলার কথাও শুনেছে এর মধ্যে।

গিরিবালা বলে—আবার তার কি মতলব বাপু, একজনতো বাছাকে তিন বছরের মেয়াদ দে গেল। এ আবার কি করবে? এতেও খুশী নয়?

নিশাকর সর্দার মানুষ চেনে। এই তরুণটিকে তার ভালো লেগেছে। মহেশ মান্নার ওখানে যায় নি। গঞ্জের সাধারণ মানুষ, তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। তাদের রিলিফ দেওয়া হয় নি জেনে নটবর মাষ্টারকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখাতেই রিলিফের কাপড় কম্বল তারা পেয়েছে।

নিশাকর বলে—ভালো লোক গো দিদি। সরকার দাদা, আপনিও দেখা করুন ইবার। তাই অঘোর সরকারও এসেছে হুজুরের লঞ্চে।

সুমন্ত বলে—আপনিই ওর সেই কাকা?

অঘোর বলে—এখানেই রইছি অনেকদিন। কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি ওকে। তাই পড়ে আছি হুজুর। বড় জেদী—ওই ঘনশ্যাম। বলে আপীল করে কি হবে কাকা?

সুমন্ত বলে—আপনি আপীলের দরখাস্ত তবু করে দিন সময় থাকতে থাকতে। পরে না দাঁড়ান সে কথা আলাদা।

কথাটা ভাবছে অঘোর সরকার। বলে সে—কে জানে ঘনশ্যাম রাজী হবে কিনা।

লঞ্চটা ফিরছে গাং এর বুক চিরে। দেখা যায় মিঃ ডি-সুজার ট্রলারটা ওদিকে জাল বিছিয়ে টানছে। সাদা ট্রলার থেকে বিদেশী জাল-এর বিস্তার নেমে আছে কপিকল এর বুক থেকে। হঠাৎ ডি-সুজার কানে আসে চীৎকারটা। ট্রলারের লেভারগুলোয় টান পড়েছে। পুলিগুলোর মধ্যদিয়ে ষ্টিলের তার-এ জালটা টানা হচ্ছে হলার মেশিনে। নদীর বিস্তারে জেগে ওঠে বিরাট হাঙরটা। নীল সাদাটে রং—রোদে ঝকঝক করে। পাখনা—ল্যাজের উপর জালটা জড়ানো, মাথা তুলেছে সে। ট্রলারের সাইরেণটা বেজে ওঠে। যে যেখানে ছিল ছুটে আসে। তিনটে ইঞ্জিন চালু করেছে ডি-সুজা, মাইক্রোফোনে ওর চীৎকার ছড়িয়ে পড়ে নদীর বুকে।

—হারিসি! চালাও ম্যান! নেক্সট নেট ছোড়ো, কভার করো।

সুমন্তও দেখেছে লঞ্চ থেকে। হাঙরটাকে ওরা জালবন্দী করেছে, টানছে। একশো হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন নেটের ষ্টিলরোপগুলোকে গুটিয়ে আনছে। অন্য একটা জাল দিয়েও ওটাকে আটকে ফেলতে চেষ্টা করছে ওরা। নীল জলে হাঙরটা পুরো ভেসে উঠে তার আক্রমণকারীদের দিকে দেখছে। জালটা ডানা পাখনায় বিশ্রীভাবে জড়িয়ে গেছে।

হৈ চৈ ওঠে গাং-এ। কলরব করছে লোকজন। দূরে তীরভূমিতে লোক জমেছে। সুমন্ত তার লঞ্চের সারেঙকে বলে—লঞ্চ ওদিকে নিয়ে চলো।

সারেং জানায়—কাছাকাছি যাবো না হুজুর। প্রপেলারে জাল জড়িয়ে যাতি পারে।

এবার ধরা পড়েছে হাঙরটা।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে জলে আলোড়ন জাগিয়ে হাঙরটা একটা ঝাপটা মেরেছে। নাইলনের দামী জাল ছিড়ে যায়, এ মাথার ষ্টিলরোপটা কেটে গিয়েছে।

চীৎকার করছে ডি-সুজা।

ততক্ষণে হাঙরটা মুক্ত হয়ে তলিয়ে গেছে গহন গাং-এ।

চীৎকার করছে ডি-সুজা—ব্লাডি বাষ্টার্ড।

ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে ষাট হাজার টাকা দামী বিদেশী জাল এক নিমিষের মধ্যে।

সুমন্তও এসে পড়ে। ডি-সুজা বলে—এ ডেভিল স্যার। সব চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। এভাবে ওকে কায়দা করা যাবে না। ডি-সুজা বলে—কল নেভি স্যার। লেট দেম কাম ইউথ গান্ বোট।

সুমন্ত ভাবছে কথাটা। বলে সে—মশা মারতে কামান দাগতে হবে?

ডি-সুজা গজরায়—মশা না আছে স্যার, এ ডেভিল। ব্লাডি বাষ্টার্ড ডেভিল।

সুমন্ত ঘনশ্যামের কথা ভাবছে।

কটা মাস কোন দিকে কেটে গেছে। দুটো মাসই হবে। জেলখানার এই উঁচু পাচীলের মধ্যে বন্দী হয়ে ঘনশ্যাম দিন তারিখের হিসাব ভুলে গেছে। তখন গাং-এর বিস্তারে ঘুরতো—জোয়ার ভাটা আর সূর্যের আলো ছায়া দেখে দিন সময়ের হিসাব করতো। চাঁদের কলা ক্ষয় থেকে বুঝতো কোটালের গোন কত দেরী। আর পথের নিশানা পেতো অকূল দরিয়ায় তারাগুলোর নিশানা দেখে। কালপুরুষ, সপ্তর্ষি, অরুন্ধতী, শুকতারা, আকাশের আঙ্গিনায় ছড়ানো কত উজ্জ্বল তারা। সেগুলোকে আর জেলের মধ্য থেকে দেখেনি কতো দিন। দূর থেকে রাত্রির অন্ধকারে কানে আসে সমুদ্রের ডাকভরা শন্ শন্ হাওয়া। কিন্তু সেই বিস্তারে উধাও হবার পথ আর নেই। একটা জগৎকে পিছনে ফেলে এসেছে সে। মহেশ মাম্নার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে কমলার কথা। সারা মন কি অবিশ্বাস আর ঘৃণায় বিকৃত হয়ে ওঠে। সব কিছু তার বিষিয়ে গেছে। দ্বীপের মানুষগুলো তাকে ভুলে গেছে। ভুলে গেছে সবাই। ভালোবাসার স্বপ্ন—একজনকে বিশ্বাস করে তাকে নিয়ে ঘর বাধার আশা যে এমনি নিষ্ঠুর মিথ্যায় পরিণত হবে তা ভাবেনি ঘনশ্যাম। তাই লজ্জায় ঘৃণায় সে এই বন্দীজীবনকেই মেনে নিয়েছে।

প্রথম প্রথম বিদ্রোহ করেছিল।

একজন ওয়ার্ডার সেদিন তাকে ধমকে উঠেছিল—থাম্‌বে কুত্তা।

গর্জে ওঠে ঘনশ্যাম—খবরদার। মুখ সামলে কথা বলবে।

ওয়ার্ডার ওর রুদ্রমূর্তির সামনে ঘাবড়ে যায়। সরে গেল সে।

কয়েদী জগদীশ ওদিকে বাগান কোপাচ্ছিল। সে এসে বলে—ওকে ধমকে ঠিক করলেন না ছোটবাবু। শালা মহা হারামী। গজরায় ঘনশ্যাম—পয়সা চাইবে, আবার ওই সব কথা বলবে? মুখ ভেঙে দেব না।

জেলার সাহেবের কাছেই রিপোর্ট হয়ে যায়। জেলার সাহেব কড়া লোক।

কয়েদীদের মেজাজের কথা শুনে নিজেই এসে পড়ে—তুমিই ঘনশ্যাম। ঘনশ্যাম চাইল ওর দিকে। পিছনে সেই ওয়ার্ডারও রয়েছে। ঘনশ্যাম ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বলে—হ্যাঁ।

জেলার চীৎকার করেন—সেলাম করতে হয় জানো না?

জেলার সাহেব তখনও অবাধ্য কয়েদীর সেলাম না পেয়ে বিশ্বাস করে সে বিদ্রোহীই। জেলার সাহেব বলে—কাল থেকে সাত দিন দু' ঘণ্টা বেশী কাজ করতে হবে। তারপর কোন রিপোর্ট পেলে ডাণ্ডা বেড়ির ব্যবস্থাই করবো।

ঘনশ্যাম চেয়ে থাকে নীরব ঘৃণাভরা চাহনি মেলে।

জেলার সাহেব বলে—তোমার মত অবাধ্য কয়েদীকে কি করে সিধে করতে হয় তা জানি। জেল ওয়ার্ডার খুশী হয়েছে স্বয়ং জেলার এসে ওকে ধমকাতে। এবার তাই হুজুরকে নিয়ে ফিরে গেল বিজয়ীর মত।

হরিহর ধূর্ত লোক। সে এসে বলে—ওয়ার্ডার পাঁড়েকে কিছু ট্যাকা হপ্তায় ঠিকমত দিও বাবু! এসব ঝামেলায় পড়বে না। আমিই সব মিটমাট করে দেব। বাড়তি খাটুনিও মকুব হয়ে যাবে।

ঘনশ্যাম কথা বলে না। দেখছে সে অন্ধকারের দিনগুলোই। মনে মনে চটে উঠেছে সে। তবু এই জীবনকেই মেনে নিতে হয়েছে।

সকালে উঠে খাঁচা খুলে কয়েদীদের সামনে ইয়ার্ডে বের করে লাইনবন্দী সাজিয়ে গুণতি করা হয়। তারপর লাইনবন্দী গিয়ে মগে করে চা আর চাপাটি, জলযোগ সেরে এবার কাজে যেতে হবে।

জেলের লাগোয়া বিরাট মাঠে এখন ফুলকপি, বাঁধাকপি, টোমাটো, আলু এসব হয়। ঘনশ্যামের প্রথম প্রথম কষ্টই হতো। মাটি কাটা অভ্যাস নেই, বাঁকে করে জল টানাও কষ্টকর। কিন্তু উপায় নেই। সশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদী সে, আর জেলের কর্তাদের খুশি রাখতে চেষ্টা করেনি, ফলে এইসব কাজেই আসতে হয়েছে তাকে। ক্রমশঃ এই পরিশ্রম তার পিছনের দিনগুলোকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তবু ভোলেনি সে মহেশ মামার কথা. আর সারা মনে জমে আছে সব কিছুর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণাই।

হঠাৎ জেলার সাহেব অবাক হন স্বয়ং এস ডি-ও-কে আসতে দেখে। সকালে জেল অফিসে এসে সবে কাজে বসেছে, সুমন্তকে দেখে এগিয়ে আসে—স্যার, আপনি!

সুমন্ত বলে—একটু দরকারে আসতে হল।

—আসুন স্যার!

সুমন্ত জেলের ভিতরে এসে দেখছে চারিদিক। মানুষের অপরাধের দীর্ঘ স্থায়ী সাজা দেবার অনেক ব্যবস্থাই রয়েছে। জেলার সাহেব ঘনশ্যামের নাম শুনেই চিনতে পারে। শুধোয় সে—তাকে কি দরকার স্যার?

সুমন্ত বলে—দরকার আছে।

—তাহলে ডেকে পাঠাই।

সুমন্ত পরিবেশটা সামগ্রিকভাবে দেখার জন্যই বলে—না। ডাকতে হবে না। চলুন—কোথায় আছে সে, সেখানেই যাবো।

ঘনশ্যামকে সেদিন থেকে ওয়ার্ডার পাঁড়েজী দেখতে পারে না। সেলামও করে না আর কথাবার্তাও তেমনি কাঠ কাঠ। দুঃখে পাঁড়েজী বলে—খেজুর গাছ তেল পারা করে দিব হামি।

তাই ওকে মাটি কাটার কাজেই লাগিয়েছে সে। শক্ত রুক্ষ মাটিতে টাংনাটা বসছে, মাটি তেড়ে তুলছে, আবার মাটির বুকে কোপ বসিয়ে চলেছে ঘনশ্যাম মুখ বুজে। জগদীশ বলে—ছোটবাবু, পাঁচ ট্যাকা পেন্নামী দিই একাজ ছাড়ান দ্যান্।—না। গর্জে ওঠে ঘনশ্যাম।

ট্যাংনা চালাচ্ছে সে, যেন ওই টাংনার কোপগুলো এই লোভী সমাজের মানুষের বুকেই বসিয়ে চলেছে সে। হঠাৎ পাঁড়েজী জেলার সাহেব-এর সঙ্গে আরও ক'জন কর্তাব্যক্তিকে আসতে দেখে নিজে খটাস্ করে সেলাম জানিয়ে চীৎকার করে—সেলাম সরকার।

সব কয়েদীই হাতের কাজ ফেলে সেলাম করে। জেলারের মাথায় ছাতা ধরার নিয়ম। একজন মেট ছাতা ধরে আছে। ও যেন রাজছত্র—সেই রাজছত্রকেই সেলাম করছে ওরা। ঘনশ্যামের এসব হাঁক ডাক কানে গেলেও সেলাম করে না, ফিরেও চাইবার দরকার বোধ করে না। একমনে মাটি কুপিয়ে চলেছে সে। সুমন্ত চাইল ওর দিকে। বলিষ্ঠ ঘর্মাক্ত চেহারার একটি যুবক। দেহের পেশীগুলো ঘামে ভিজে স্পষ্ট—সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

পাঁড়েজী বিদ্রোহী কয়েদীর এত বড় অবাধ্যতা দেখে হুজুরদের সামনে নিজের প্রতিষ্ঠা জাহির করার জন্য চীৎকার করে।

—আবে এ্যাই ঘনা—সেলাম কর বে।

ঘনশাম ওর চীৎকারে জবাবই দিল না। জেলার সাহেবও রেগে উঠেছে। সুমন্ত নামটা শুনে চাইল। ওর বলিষ্ঠতা—ওই তেজস্বীভাবটা তাকে এতগুলো কয়েদীর মধ্যে কি স্বাতন্ত্র এনেছে? এগিয়ে যায় সুমন্ত।

জেলার বলে—ও খুব এ্যারোগেণ্ট স্যার। ওই ঘনশ্যাম—ওর কাছে যাবেন না। সেফ্টি—

সুমন্ত ওদের থামিয়ে এগিয়ে যায় ঘনশ্যামের দিকে—নমস্কার।

ঘনশ্যাম অবাক হয়। জেলে এসে অবধি ওই নমস্কার তাকে কেউ জানায়নি। ভদ্রলোক ঠিক রসিকতা করছে না কি ঠিক বুঝতে পারে না সে।

—আপনিই ঘনশ্যামবাবু?

ঘনশ্যাম কপালের ঘাম মাটিমাখা হাত দিয়ে মুছে বলে ওঠে—বাবু! ঘনশ্যাম আর বাবু নাই মশাই—সে শ্লা কাবু হয়ে গেছে এই এনাদের গুঁতোনির চোটে। ক্যামন বাবুগিরি করছি দেখছেন তো।

জেলার সাহেব ধমকে ওঠে—কার সঙ্গে কথা বলছো জানো? উনি নোতুন এস-ডি-ও সাহেব।

ঘনশ্যামের চোখে ভেসে ওঠে সেই টাকমাথা এস-ডি-ও সাহেবের ছবিটা। তাকে মহেশ মান্না কিনে নিয়েছিল। ঘনশ্যামকে কাজও দেয়নি সে। আদালতে কমলাকে জেরা করতেও দেয়নি তার উকিলকে। কমলা অসুস্থ বলে রেহাই দিয়েছিল তাকে। তাই জেলে আসতে হয়েছে তাকে। ঘনশ্যাম ওদের চেনে। তাই বলে ওঠে—আম্ব বাপ্। এক হুজুর তিন বছর সশ্রম জেলের হুকুম দে গেলেন আর স্যার আপনি এসেছেন সেই হুকুম ঠিকমত মানা হচ্ছে কিনা দেখতে? তা খ্যাথেন স্যার—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছি। আর হাতেও কড়া পড়ে গেছে ট্যাংনা হাঁকিয়ে।

সুমন্ত দেখছে তরুণটিকে।

জেলার গর্জে ওঠে—সাট্ আপ্। তোমাকে অবাধ্যতার জন্য শাস্তি পেতে হবে, ভদ্রভাবে কথা বলো।

—আবার শাস্তি দেবেন স্যার? শাস্তি তো পাচ্ছিই। তা দেবেন—হঠাৎ ঘনশ্যামের খেয়াল হয়, দুহাত এক করে বলে—মাপ্ করবেন স্যার, সেলাম করা হয়নি। সেলাম হুজুর। সেলাম স্যার। সেলাম পাঁড়েজী। সুমন্ত, জেলার, মায় ওয়ার্ডারকেও ভক্তি ভরে নমস্কার করে ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বের করে সুমন্তের দিকে এগিয়ে বলে—চলবে স্যার। নাহলে—নিজেই ধরাতে যাবে। ফেটে পড়ে জেলার সাহেব।

—জেলের মধ্যে বিড়ি কি করে এল?

ঘনশ্যাম বলে—নির্দোষ নিরপরাধ লোকই যদি জেলে এসে ঢুকতে পারে কয়েদী হয়ে, কয়েদীর হাতে নিরিমিষ্যি একটা বিড়ি আসা কি এতই দোষের হুজুর? ঠিক আছে—আপত্তি করছেন, খাবো না।

জেলার সাহেব রাগে ফুলছে।

সুমন্তও বুঝেছে সে চলে গেলে ঘনশ্যামকে নিয়ে পড়বে ওরা। সুমন্তও

অনুভব করে ঘনশ্যামের মনের জ্বালাটা। সবকিছুর উপরই এসেছে ওর ঘৃণা, ক্রোধ।

ঘনশ্যাম বলে—তা হুজুর কিছু বলবেন? নাহলে আবার মাটি কোপাতে শুরু করি স্যার, এ্যাতোটা জায়গা কোপাতি হবে। নালি তো পাঁড়েজী ছাড়বে না। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় স্যার।

সুমন্ত দেখেছে লোকটির জনপ্রিয়তা। আজ ওকে এভাবে এখানে মাটি কাটতে দেখে খুব খুশী হতে পারে না। সুমন্ত বলে—আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

চাইল ঘনশ্যাম। একটু অবাক হয় সে। কথা—আমার সঙ্গে।

সুমন্ত বলে সাগরদ্বীপের কাহিনীটা। আজকের সেখানে যা কাণ্ড চলেছে, বলে সে। ঘনশ্যামের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই হাঙরটার ছবি। একদিন দেখেছিল সে। সময় পায়নি তাকে মারার। তার আগেই ডাঙার কোন হাঙর তাকে গ্রাস করেছে। নিশাকর সর্দার—রতনের কথা মনে পড়ে। জেলেদের কথাও। মহেশ মান্নার আড়তেই ফিরে যেতে হয়েছে তাদের। আর সেখানে এখন মাছ ধরার উপায় নেই। মহেশ মান্না বিপদে পড়েছে। গঙ্গাসাগর মেলা আসছে সামনে। সরকারের ইজ্জৎ-এর কথা। সারা দেশের মানুষ এসে হাজির হবে, কিন্তু তীর্থে যেতে পারবে না বিপদের ভয়ে।

ঘনশ্যাম বলে—ট্রেলার, বোট অনেক তো এনেছেন, ওরাই মারবে। না হয় ওই যে মহেশ মান্না ওতো মস্ত বীর, ওকেই বলুন গে। ওদের ক্ষেতি হচ্ছে, সরকারের মান ইজ্জৎ-এর সওয়াল, ত্যানারা বুঝবেন। আমাকে ছেড়ে দ্যান স্যার।

জেলার সাহেব কথাটা শুনে অবাক হয়। এস-ডি-ও সাহেব নিজে এসেছেন ঘনশ্যামের মত কয়েদীর কাছে এই অনুরোধ নিয়ে—এটা তার কাছে বিস্ময়ের বলেই বোধ হয়। আরও অবাক হয়েছে সে ঘনশ্যামকে দেখে। এস-ডি-ও সাহেবকেও খাতির করে না। মুখের উপর বলে—সরকার বুঝে নিকগে, আমার কোন মাথাব্যথা নাই।

সুমন্ত বলে—দেশের মানুষের জন্য ভাবো না? তাদের কথা?

ঘনশ্যাম অনেক চেষ্টা করেই শান্তভাবে কথা বলছিল। প্রথম থেকেই তার ওই কথাগুলো ভালো লাগেনি। তারা বিপদে পড়েছে। মহেশ মান্নার পয়সা রোজকারে অসুবিধা হচ্ছে তাই সাহেব ছুটে এসেছেন বোধহয় তার কাছে। এবার দেশের মানুষের কথা বলতে ঘনশ্যাম বলে ওঠে—আমার কথা

কেউ ভেবেছে? একটা মিথ্যা অপবাদে যারা আমার মাথা নুইয়ে দিয়েছে, মুখ কালো করে দিয়ে জেলের অন্ধকারে আটকে রেখেছে তারা আমার কে? কেউ নয়—তাদের কথা আমি ভাবি না, তারা মরুক বাঁচুক আমার কিছুই যায় আসে না। তাদের জন্ম আমারও করার কিছু নেই।

সুমন্ত দেখছে উত্তেজিত ঘনশ্যামকে। মনে হয় সুমন্তের এই ফেটে পড়ার নিশ্চয়ই কারণ আছে। ঘনশ্যাম বলে - দয়া করে যান স্যার। এই সবটা জমি কোপাতি হবে নালি ডাণ্ডাবেড়ি ঠেকাতে আপনিও আসবেন না। যান—ঘনশ্যাম মাটি কোপাতে থাকে।

সুমন্ত কি ভাবছে। জেলার কি বলতে যায় ঘনশ্যামকে। ঘনশ্যাম কান দিল না। সুমন্ত জেনেছে একে সহজে রাজী করানো যাবে না। কি ব্যর্থ অভিমানে ফুঁসছে ঘনশ্যাম।

সুমন্ত বলে—পরে আবার দেখা হবে ঘনশ্যামবাবু। এখন চলি। নমস্কার। চলে গেল সুমন্ত জেলার সাহেবকে নিয়ে।

ঘনশ্যাম মাটি কোপাচ্ছে। পাঁড়েজীও একটু ঘাবড়ে গেছে। কয়েদীর কাছে খোদ এস-ডি ও সাহেব আর্জি নিয়ে আসেন আর কয়েদী তাকেই চোটপাট দেখায়। তাকে ঘাঁটানো আর নিরাপদ হবে না এটা বুঝেছে পাঁড়েজী। আজই হুজুরকে দুচারটে জেলের গোপন কথা ও রাগের মুখে ফাঁস করে দিয়েছে। ঘাঁটালে তার চুয়া থেকে দৈনিক দুধ চুরি, মাছ শব্জী চুরি করে বিক্রীর কথাও ফাঁস করে দেবে, যায় তার বকশিস নেওয়া অবধি।

সুধাময়ী বাংলোর বাইরে পায়চারী করতে গিয়ে গঙ্গার বিস্তারের দিকে চেয়ে থাকেন। নদীর ধারে বিরাট বট অশ্বথ গাছের জটলা, ওদিকে বাঁধের নীচে ফাঁকা খানিকটা চরভূমি। দূর অতীতের সেই ছাবটার সঙ্গে আজকের এখানের কোন মিল নেই। বিস্তীর্ণ চরভূমিতে এখন ঝুপড়ির দোকান পশার বসেছে। ওদিকে গঙ্গার ধারে ছোট বড় লঞ্চ—বিরাট বড় বড় মহাজনী নৌকার ভিড়। বহুদূর অবধি চলে গেছে নৌকার মিছিল। রকমারি পতাকা তোলা হয়েছে মাস্তলে, চরভূমিতে গড়ে উঠেছে হোগলার অস্থায়ী ঘরগুলো। দূর দূরান্ত থেকে তীর্থ যাত্রীরা এসে বাসে করে কাকদ্বীপ যাবে। অনেকে এখান থেকেই নৌকায়—লঞ্চে যাবে সাগর মেলায়। সাধু সন্ন্যাসীর দল আসে সারা ভারতের প্রান্ত থেকে। বটতলা—অশ্বথগাছের নীচে ধুনি জেলে বসে আছে তারা। সরকারী হুকুম ডিঙি বা ছোট নৌকায় গাঙ-এ নামা যাবে না। সাগর দ্বীপে যাওয়া

যাবে না। তবু লোকজন—হাজারো তীর্থযাত্রী এসে হাজির হচ্ছে। অনেকে চলেছে টানা বাসে কাকদ্বীপ। আর ছাড়িয়ে নামখানা অবধি। যদি লঞ্চ মেলে সাগর দ্বীপের যাওয়ার জন্য। কিন্তু লঞ্চও সীমিত। কয়েক লক্ষ মানুষের তুলনায় নগণ্য।

সুধাময়ীও শুনেছে খবরটা, নিজেও দেখেছে সেই বিরাট হাঙরটাকে। মানুষকে ছোঁ মেরে যেন তুলে নিয়ে যায় সে। যাত্রীদের অনেকেই এসে হতাশ হয়—তাহলে কি তীর্থে যেতে পাবো না?

কেউ বলে—কপিল মুনি মা গঙ্গামায়ি এবার ওপানে কোন পাপী মানুষ যাক্—চান না। পাপে দুনিয়া ভরে গেছে। তাই গঙ্গামায়ি তার রক্ষককে ভেজেছে।

খবর আসে—আবার আজ কাকদ্বীপের গাং থেকে নৌকা মেরে মানুষ নে গেছে। আর সেই নৌকা ভেঙ্গে ডুবে যাওয়ায় আট দশ আদমী ডুবে গেছে। সরকার ভি কুছু করতে পারলো না। খবরটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

সুমন্ত শুনেছে। এ যেন একটা অন্ধকার মৃত্যুদূত হানা দিয়েছে। তাদের প্রতিরোধের সব চেষ্টাকেই ব্যর্থ করেছে বার বার। আরও মরীয়া হয়ে আক্রমণ করে চলেছে।

সুধাময়ী বেড়িয়ে ফিরেছে, বাংলোর লনে সুমন্তকে দেখে এগিয়ে আসে। ক'দিন থেকে দেখছে সুমন্ত ভাবছে এই ব্যাপার নিয়ে।

সুধাময়ী বলে—আজ আবার কি বিপদ ঘটিয়েছে হারজটা শুনলাম সুমন্ত।

—হ্যাঁ।

সুধাময়ীও দেখেছে দূরাগত যাত্রীদের ব্যাকুলতা। আরও লাখ লাখ মানুষ আসবে। কিন্তু তারা কি তীর্থ দেবতাকে প্রণাম করতে যেতে পাবে না?

সুধাময়ী বলে—এ তীর্থ বড় দুর্গম, আর তীর্থ দেবতাও বড় নির্মম রে! অনেকের অনেক কিছুই কেড়ে নেয় বাছা। এবারও দেখছি এত প্রাণ নিয়ে সে খুশী নয়।

সুধাময়ী তার নিজের অতীতের কথা ভোলেনি।

সুমন্ত জানে মায়ের এই বেদনার কথা। তার প্রথম সন্তানকেও সুধাময়ী হারিয়েছিল অনেক বৎসর আগে এই তীর্থে এসেই। আজ সে বেঁচে থাকলে সুমন্তও একাকী বোধ করতো না। অদেখা সেই শিশুর পরিণত বয়সের একটা কল্পনার ছবি তার মনে জাগে। অস্পষ্ট অস্ফুট সেই ছবি।

সুধাময়ী বলে—কিছু ব্যবস্থা করা গেল না ওটাকে আবার ?

সুমন্ত হতাশভরা স্বরে জানায়—না। চেষ্টা তো করছে ট্রলারে। একবার ধরাও পড়েছিল। কিন্তু আটকাতে পারেনি ওটাকে। সরকার থেকে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। দেখা যাক কি হয় ?

সন্ধ্যা নামছে গঙ্গার বুকে। তীর্থযাত্রীদের বাস দু'একটা করে আসছে। সন্ন্যাসীদের গাছতলার ঝুপড়িতে কাঠের গুড়ির ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। এত সব মানুষ এসে এই হিম শীতে পড়ে আছে তীর্থে যাবার বাসনা নিয়ে, পৌঁছতে পারবে কিনা জানে না ওরা।

মহেশ মান্না কথাটা ভাবছে। ছোকরা এস-ডি-ও মাঝে মাঝে এই দ্বীপে এসেছে। কিছু একটা মতলবেই ঘুরছে বোধ হয়। মহেশের সন্দিগ্ধ মনে ভয় একটা আছে। সর্বদাই ভয় হয় তার সেই মিথ্যাটা না প্রকাশ পায় কোন ভাবে। ঘনশ্যাম মামলায় আপীল করেনি শুনে খুশিই হয়েছে।

মহেশ মান্না ঘনশ্যামকে সরিয়েছে, এবার ব্যবস্থা করছে কমলাকেও বিয়ে দিয়ে তার মনের ভালোবাসার সব স্মৃতিকে মুছে ফেলার জন্য। পাত্রও তার হাতে আছে।

নটবর মাষ্টার সেদিন কথাটা শুনে অবাক হয়। সে এতদিন কমলার আশা নিয়েই ছিল। কিন্তু কমলাই তাকে পাত্তা দেয়নি। নটবর তাদের বাড়ি গেছে। কমলাই এড়িয়ে গেছে তাকে। এবার আর তার এড়াবার পথ থাকবে না।

মহেশ মান্না বলে—কি হে নটবর মুখ বুজে আছো যে ? এ্যা—বিয়ে থা করে থিতু হও। আর মেয়েও তোমার চেনা জানা। ওরাও ধরেছে গরীবের কন্যাদায় বলে কথা, তুমি রাজী হলে তাদের এই উপকারটুকু করতে পারি।

মহেশ মান্না বলে—বুঝলে, কেউ কোন বিপদে পড়ে হাজির হলে আমি আবার না বলতে পারি না। বসন্ত খুব ধরেছে তার মেয়ে কি নাম গো—হ্যাঁ কমলার বিয়ের জন্যে। তাই মনে পড়লো তোমার কথা।

চমকে ওঠে নটবর। সামান্য মাষ্টারী করে সে মহেশবাবুর দয়ায়, তার ভাগ্যে কমলার মত মেয়ে জুটবে ভাবেনি সে। মহেশ বলে—তাহলে কথা দিই ওদের ? আপত্তি নেই তো হে নটবর ?

নটবর খুশি চেপে বলে—আপনি আদেশ করছেন—না বলতে পারি স্যার ?

মহেশ বলে—না হে, বিয়ে বলে কথা। ইহ জীবনের বড় সম্পর্কের ব্যাপার, যাক্ তাহলে তোমার মত আছে জেনে নিশ্চিন্ত হলাম।

বাসিনী ইদানীং পুজো আচ্চা করে, বাড়িতেই ঠাকুরের পট বসিয়ে, লক্ষ্মীর সরা রেখে কিছুক্ষণ পুজো করে। ইদানীং কমলার ওই ঘটনার পর কমলাও ঘরের বাইরে আর যায় না। বাসিনী বলে—তবু ঠাকুরকে ডাক মা, তিনিই সব দুঃখ ঘোচাবেন।

কমলা বলে—আমার মত পাপীর দুঃখ কোনদিন ঘুচবে না মা। মহাপাপ করেছি আমি।

বসন্তকে সোরগোল করে ঢুকতে দেখে চাইল বাসিনী। এর মধ্যে মহেশ মান্না বসন্তের কানে কথাটা তুলেছে। বসন্ত খুশী হয়। তবু বলে—মান্নাবাবু, সবতো ভালো। কিন্তু আমাদের স্বজাতি তো নয়, নীচু ঘর।

মহেশ মান্না তা জানে। তবু ওই কমলাকে আটকানো দরকার। নটবরের হাতে পৌঁছে দিলে কমলার সম্বন্ধে আর তার কোন ভয় থাকবে না। তাই মহেশ পরম দার্শনিকের মত বলে,—আজ কি জাতপাত আছে নাকি? তাছাড়া নটবর ম্যাট্রিক পাশ—মাষ্টারি করছে।

বসন্তও কোন রকমে মেয়েকে পার করতে চায়। নটবরও পাত্র হিসাবে মন্দ নয়। বলে সে—আপনি যখন বলছেন ঠিক আছে। বাড়িতে বলি—

মহেশ বলে—তা বলবে বৈকি। তবে বাপু জাত ফাতের সেকেলে-পনা নিয়ে যেন গিন্নী আবার বাগড়া না দেয়।

বসন্তও অনুমান করেছিল বাসিনী কথাটা শুনে একবারে রাজী হবে না। বাসিনী ঠিক তাই করে। বলে ওঠে সে—সে কি করে হয় গো। নটবর তো আমাদের পালটি ঘর নয়। পালটি ঘরের স্বজাতের কোন পাত্র ছাখো বাপু। না—না। এ বিয়ে কি করে হবে?

বসন্ত গর্জে ওঠে—ক্যানো! নটবর কি খারাপ পাত্র! আর জাত! জাত-ফাত এখন নাই। ওসব কেউ মানে না। মান্নাবাবুও বলেন—ওসবের কোন দাম নাই হে। মহেশবাবুই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

কমলাও শুনেছে কথাটা। চমকে ওঠে সে। নটবর এখানে কেন আসতো তা বুঝেছে কমলা। লম্বা সিটকে লোকটার দুচোখে দেখেছে সে লোভের কালো ছায়া। মা অবশ্য বাধা দেবে, কিন্তু কমলার ভয় হয় মহেশ মান্না যখন এটা চেয়েছে তখন তার বাবাও মত দেবেই, আর মায়ের অমতের কোন দামই দেবে না ওরা।

কমলা ভাবতে পারেনি এমনি করে ওই মহেশ মান্না তার সব কেড়ে নেবে। কিন্তু মুক্তির কোন পথই দেখে না সে।

রাত্রি নেমেছে। বাসিনী মেয়েকে কথাটা তখনও বলতে পারেনি। এ বিয়েতে সে ঠিক মত দিতে পারছে না। কমলা শুনেছে ওঘরে বাবা মায়ের কথাগুলো। মা অমতই জানিয়ে চলেছে।

—এ হতে পারে না। তুমি বাপু মান্নাবাবুকে বুঝিয়ে বলো।

বসন্ত ইদানীং বেশ গরম মেজাজেই কথা বলে। ওদিকে রোজকার পাত্তি কমে গেছে। পারঘাটের যাত্রী বাড়ার মরশুম এখনই, সামনে গঙ্গাসাগর মেলা। কিন্তু লোকজন ভয়ে কম আসছে। বাজারে গঞ্জে জোর গুজব চলেছে মেলা বোধ হয় এবার জমতে দেবে না সরকার। ওই ব্যাটা জলের হাঙর এসে জুটে তাদের চরম বিপদ এনেছে। রোজকার পাত্তি বন্ধ। মাছের আড়তও এখন বন্ধ।

তবু মহেশ মান্নার দয়ায় বিয়ে থা দিতে পারতো মেয়ের। নটবর মাষ্টারও ক্রমশঃ গঞ্জের দ্বীপের একজন নেতা—মাতব্বর হয়ে উঠছে। এবার অঞ্চল প্রধান করে দেবে তাকে মহেশ মান্না। তাহলে পয়সা, মান, খাতির কোন কিছুরই অভাব থাকবে না। গিন্নীর ওই এক কথা তার বার বার ভালো লাগেনা।

বসন্ত গর্জে ওঠে—যা বলছি তাই হবে। এক কথা বার বার বলো না, ঘ্যান ঘ্যানানি ভালো লাগে না, বুঝলে।

বাসিনী চুপ করে যায়। তবু কি ভেবে বলে—মেয়েকেও শুধোও। বড় হয়েছে—সে কি বলে শোনো।

বসন্ত ফুঁসিয়ে ওঠে—তার বাপ বলছে এ বিয়ে হবে—আলবৎ হবে। সে কি বলবে। এ্যাঁ? স্বাধীন হয়েছে নাকি তোমার মেয়ে? ওসব সইবো না ওকে নিয়ে আর জ্বলে পুড়ে মরতে চাইনা। বিদেয় করবো ওকে। হ্যাঁ।

কমলা রাতের অন্ধকারে কথাগুলো শুনছে। মনে হয়, একদিন তবু এত দুঃখ অপমান সহ্য করে বেঁচেছিল, এবার তাকে ওরা বলি না দিয়ে ছাড়বে না।

রাত্রির বাতাসে হাহাকার ওঠে। তারাগুলো জ্বলছে ঝকঝকে আকাশের বুকে। কমলার মনে পড়ে ঘনশ্যামের কথা। কমলা নিজেই তাকে জেলে পাঠিয়েছে ওদের চাপে পড়ে। আজ ওরাই তাকে এবার সত্যি পরিচয় শেষ করে দেবার জন্যই এমনিভাবে বিয়ে দেবার চক্রান্ত করেছে। পাশে কেউ নেই—ঘনশ্যাম থাকলে ওরা এসব কথা ভাবার সুযোগ পেত না।

বাদাবনের বাঘ আজ নেই—তাই শিয়ালের দলই রাতের অন্ধকারে বনের দখল নিয়েছে।

মহেশ মান্না ক'দিন থেকে ব্যস্ত। হাঙরটাকে মারার জন্তে অত চেষ্টা হচ্ছে কেউ পারে নি। এই অবকাশে যদি মহেশমান্না ওটাকে মারতে পারে এই দ্বীপে—সরকারী মহলে তার প্রতিষ্ঠা কায়েম হয়ে যাবে। আর মারতেই হবে ওটাকে, নাহলে মেলা বন্ধ হয়ে যাবে। তার লোকসান হবে লাখ খানেক টাকা। মুখও থাকবে না।

তাই গজেন, নটবর মাষ্টার, নরহরি, ভূপতি রায়, কন্দর্প মাহাতো সকলেই এসেছে। মহেশ বলে—সাগর জাল দিয়ে ঘের গাং, এদিকেই সকালে দেখা গেছে তাকে। বেশী দূরে যেতে হবে। এই ধার কাছের গাং-এই আছে ব্যাটা।

গজেন বলে—সারা দ্বীপের জেলেদের আনছি। ওরাও তৈরী আছে। তালে তিনখান সাগর জাল দিয়ে ঘেরুক। আর আপনে বন্দুক খান নিই রেডি থাকেন, ব্যাটা জালে পড়ি ঘাই মারলেই চালাবেন দমাদন্ গুলি। ঝাঁঝরা করি দেবেন। ব্যস—টানি তুলি দেব ব্যাটারে বালিচরে।

গুপীনাথও সেজে এসেছে।

নরহরি বলে—দেখলাম ও ব্যাটা গাঁই গুই করছে। জাল নামাতি চাইছে না।

মহেশ গর্জে ওঠে—কুন শ্লা এসময় ব্যাগড়া দিচ্ছে ওদের ত্যাখতো গজেন। গুপী। সে শালাদের পুঁতে দেব বালিতে। আর শোন, নে ট্যাকা নে যা মদ আর মাংস খাওয়াবি। আর বলবি হাঙর মারা পড়লি সকলকে দশ টাকা করে বকশিস, আর ভরপেট মদ মাংস—

বালিয়াড়িতে এসে হাজির হয়েছে শ'খানেক জেলে, জাল-ও তৈরী। গাং ঘিরে ওই জানোয়ারটাকে মারার চেষ্টা করবে তারা।

তিপ্‌লির অবসর নাই। কাল রাত থেকে বাপ্‌ মেয়েতে মদ তুলছে, হাড়ি হাড়ি মদ। চাট রান্না হচ্ছে। ছাগলের মাংস নাড়ি ভুঁড়ি ঠেসে লঙ্কা দিয়ে লাল একটা বস্তু ফুটছে কড়াই-এ।

নিশাকরও দেখেছে সকালে জানোয়ারটাকে, থির গাং-এর জলে মাথা তুলে বিরাট দেহটাকে ভাসিয়ে রোদ নিচ্ছে। নীল-সাদা ঝকঝকে দেহটা নিয়ে ওলট পালট খাচ্ছে নিশ্চিন্ত। বিশাল দাঁতগুলো ঝকঝক করে। নদীতে ভেসে আসা কাঠের টুকরো—টিনের কৌটা তাই গিলছে। গাং-এ লোকজন নৌকা সব সরে গেছে। চমকে ওঠে নিশাকর। দারুণ সাহসী আর লোভী হয়ে গেছে জানোয়ারটা। বারবার মনে পড়ে ঘনশ্যামবাবুর কথা। সে থাকলে তারা ভরসা করে ওটাকে শেষ করার কথা ভাবতো। আবার ডুবে যায় সে।

নিশাকর ঝাউবনে দাঁড়িয়ে দেখছে তাকে। আর দেখা যায় না। তলিয়ে গেছে জানোয়ারটা। ওদিকে কলরব শুনে এগিয়ে আসে নিশাকর। তারই পরিচিত জাতি গোষ্ঠির সবাই ছড়ানো দ্বীপের নানা বসতিতে, গাং-এ ওদের সঙ্গে মাছ ধরছে। ঝড় তুফানে হাল ধরেছে, মাছ তুলেছে। কতদিন রাত্রের দুখ সুখের সাথী তারা।

—সর্দার!

নিশাকর ওদের জাল নৌকা নিয়ে তৈরী হতে দেখে শুধোয়—গাং নামবি নাকি রে। জানোয়ারটা ঘুরতিছে এ গাং-এ। নামিসনা নশীরাম, ওরে গবা—সাংঘাতিক জানোয়ার ওটা। বাগাতে পারবিনা ওকে। বেপদ ঘটি যাবে।

প্রবীণ সর্দার নিশাকর। ওর কথায় অনেকেই মুষড়ে যায়।

নরহরি এনেছিল পুজোগুলো সারতে। সে বলে—মা গঙ্গায় নাম করে নাম গবা। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

নিশাকর বলে—তুমি জলের জীবের বেষয় কি জানো ঠাকুর? যাবে নৌকায় ওদের সাথে? দেখি মা গঙ্গা ক্যামনে তোমাকে বাঁচায়? নরহরি সরে পড়ে।

মহেশবাবুর কাছে এসেই খবরটা পৌছে দেয় সে।

মহেশ মান্নাও নিজে এসেছে।

গজেন, গুপীনাথ এসে দেখে নিশাকর, রতনরা এসেছে বাধা দিতে।

গবা বলে—ও গজুদা, ই বেপদের কাজ বাপু। জাল নামাবোনি, সর্দার বলছে তাহলি থাক।

গুপীনাথ এরমধ্যে সর্দারি নিয়েছে। বাবাকে দেখে বলে সে—তুমি এখানে কেনে আসতিছ? নিজে নামবানি—নেমোনি। ওদের ভাঙাছো কেন?

গজেন ধমকে ওঠে জেলেদের—এত ভয় তোদের? তিপ্লি—নিয়ে আয় মদ, মাংস। খা। আর শোন—কত্তাবাবুও নামবেন বন্দুক নে—

মহেশও বন্দুক টোটা নিয়ে তৈরী হয়ে এসেছে। ওকে দেখে সরে এল নিশাকর। মহেশ সেনাপতির বেশে এসে বলে—আমিও সঙ্গে থাকছি তোদের সাথি, ব্যাটা উঠলি গুলিতে ঝাঁঝরা করি দেব। চল—আর শোন। খেয়ে নিয়ে জালে নামবি। হাঙরটাকে মারতি পারলি ফি জন দশ টাকা করে বকশিস পাবি। আর ভরপেট মদ—মাংস। গুপী—

গুপীনাথ ওদের মদ মাংস দিয়ে চলেছে। নিশাকরের ডাকে চাইল গুপীনাথ।

নিশাকর বলে—যাস্নে গুপী, সাংঘাতিক জানোয়ার ওটা। সর্বনাশ করে দেবে। থামা ওদের।

গজেন পরিহাসের স্বরে বলে—তুমি আর মরদ নাই সর্দার। শাড়ি পরে ঘরে বসে থাকোগে।

নিশাকরের বুড়ো শরীরও জলে ওঠে ওর কথায়। বলে সে—কে মাদী আর কে মরদ তা দ্বীপের সব্বাই জানে গজেন। নিশাকর সর্দার এখনও মরেনি। তাই বলছি এসব নে ওটাকে সামলাতি পারবিনা। তোরা ওর সাথে লড়াই-এর মর্ম বুঝবিনি। যাস্ নি।

গজেন হাসছে—ছাখোনা কি করি। মান্নাবাবুই ওরে খতম করি দেবে।

কলরব ওঠে গাং-এ। সারা গঞ্জের লোক মেয়েছেলে ভেঙ্গে পড়েছে। মান্না-বাবু ইরিগেশনের লঞ্চে চড়ে ডেকে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে—টান। জাল টান।

চীৎকার ওঠে—গঙ্গা মায়িকি জয়। জয় বাবা কপিল মুনি। গাং-এর অনেকখানি জায়গা ঘিরে বিশাল জাল ফেলে টানছে ওরা। নীলজলে জালের বড় বড় লাল বয়াগুলো জাল কে ভাসিয়ে রেখেছে, স্রোতে নড়ছে সেগুলো। লাল রং দূর থেকে দেখা যায়। ডিঙ্গিগুলো সমবেত ভাবে আজ জলে নেমেছে—টানছে জালটাকে। ডাঙ্গায় বড় ঝাউ গাছের গুড়িতে জালের মোটা নাইনলের রসিগুলো বাঁধা।

বিরাট জীবটা জলের অতলে বিশ্রাম করছে। নীচেকার স্রোতে তার বিশাল দেহটা ভাসছে। নীল, সাদার ঝলক ওঠে। বিশাল কানকো দুটো তুলে ঝিল্লির লালচে আবরণে ওই স্রোতধারার স্পর্শ নিচ্ছে জীবটা।

এখানে আলো নেই—অতল অন্ধকার। পলিমাটি—পাঁক—বালির স্পর্শ লাগে নরম দেহে। দু চারটে মাছের ঝাঁক দূর থেকেই ওর অস্তিত্বের খবর পেয়ে সরে যায়। হঠাৎ অনড় প্রাণীটার ঝিল্লিতে এসে বিরক্তিকর শব্দগুলো আঘাত করে। নড়ে ওঠে প্রাণীটা, গায়ে পিঠে—পাখনায় এসে পড়ে জালের দড়ি—লোহার ভারি কাঠিগুলো। পাখনা—ল্যাজটা ঠিক নাড়তে পারে না। এমনি অনুভূতি একবার হয়েছিল তার। সাদা বিরাট একটা জন্তু তাকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল। হয়তো আবার তেমনই কোন আক্রমণই ঘটছে। বিকট শব্দ জলের নীচে ভেসে ভেসে গিয়ে তার কানে ঠেকছে। ক্রমশঃ বাড়ছে—কাছে এগিয়ে আসছে বিজাতীয় বিরক্তিকর শব্দটা। ল্যাজটা জড়িয়ে যাচ্ছে তার। মাথায় মুখেও এসে পড়েছে ওদের জালের কিছুটা।

ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে সে, কি ঘটছে দেখা দরকার আর খিদেও পেয়েছে।

হাঁ করে একঝাঁক মাছকে তাড়া করে—ওরাও সরে যায়। জানোয়ারটা ঠেলে উঠছে উপরের দিকে।

—আয় বাপ্। আর্তনাদ করে ওঠে ওদিকের ডিঙির সুদাম জেলে। গবা চীৎকার করে—হুঁসিয়ার।

সারাজালটা কেঁপে ওঠে হাঙরটা মাথা তুলে গাং নৌকা লোকজন দেখে এবার তার কর্তব্য স্থির করে নেয়। জালটা জড়িয়ে গেছে। সামনে মুক্ত সমুদ্র, হাঙরটা এগিয়ে চলেছে—ল্যাজে-এর প্রচণ্ড একটা ঝাপটায় জালটা ছিড়ে যায়।

চীৎকার করে মহেশ—জাল চাপা দে—ঘের, জাল ফাল। ধরে ফেল ব্যাটাকে মহেশ মান্না জলের উপরই গুলি চালাচ্ছে—বুলেটগুলো জলেই লাগছে। পাগলের মত চীৎকার করে আর গুলি চালাচ্ছে সে।

সামনেই গুপীনাথের নৌকা। গুপীনাথ চীৎকার করে—পালো। ডাইনে টান—

তার আগেই প্রচণ্ড একটা পাহাড় যেন তার ডিঙিতেই আছড়ে পড়ে। ল্যাজ-এর ঝাপটে ডিঙিটা মাঝ বরাবর ফেটে যায়। আর গুপীনাথ জলে ছিটকে পড়েছে—পাহাড়ের মত জীবটা, একটা গুহার মত অন্ধকার মুখ হাঁ করে তেড়ে আসে। গুপীনাথকে গিলে ফেলে—পাশের ডিঙিটাকে এক ঝাপটায় উল্টে হাঙরটা জাল কেটে ফেড়ে মুক্ত সমুদ্রের দিকে চলে গেল। এক নিমিষে ঘটে গেছে কাণ্ডটা।

তীরের মানুষ আর্তনাদ করে। ডিঙিগুলো জাল ফেলে রেখে তীরের দিকে পালাচ্ছে। মহেশ মান্নার খেয়াল হয়। গর্জাচ্ছে সে—জাল ফেলে যাবি না, খবরদার। গুলি করবো। জাল ধর ব্যাটারা।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ওরা তীরের দিকে চলেছে। ভেসে গেল, ছিঁড়ে গেল মহেশ মান্নার এত দামী জাল। তাদের প্রাণের দাম যে জালের দামের চেয়েও বেশী এটা বুঝেও মহেশ মান্না ক্ষেপে উঠেছে।

সুমন্ত আসছিল দ্বীপে। সামনে তার একটা কাজ। ঘনশ্যামকে নিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে তাকে। কিন্তু ঘনশ্যাম তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তবু থামবে না সে। দরকার হয় দ্বীপের সাধারণ মানুষকেই নিয়ে যাবে ঘনশ্যামের কাছে। যে ভাবে হোক রাজী করাতে হবে তাকে। হঠাৎ সারেঙ চীৎকার করে—ওদিকে দেখুন স্যার। এত লোক গাং-এ নেমেছে ডিঙি নিয়ে। জাল টানছে—

সুমন্ত অবাক হয় ওদের দেখে। হঠাৎ তার চোখের উপরই ঘটনাটা ঘটে

যায়। সারেঙ মুখানিরা চীৎকার করে—ওই যে স্যার। জানোয়ারটা—সব্বোনাশ। ডিঙি ভেঙে লোক নিয়ে সে চলে গেল জাল ছিঁড়ে। কলরব আর্তনাদ ওঠে। গুলির শব্দ শোনা যায়। মহেশ মান্না তখনও গুলি চালাচ্ছে। যে কোন সময় সেই গুলি হাঙরটাকে না লেগে ভীত পলাতক মানুষগুলোকেই লাগতে পারে।

চীৎকার করছে সুমন্ত—মান্নাবাবু।

তখন খেল খতম হয়ে গেছে। সুমন্ত বলে—জেটিতে লঞ্চ নিয়ে চল সারেং।

চীৎকার করে কাঁদছে নিশাকরের বৌ। গুপীনাথকে হাঙরে নিয়ে গেছে। হাজার হোক তবু ছেলে তার। বুড়ি কাঁদছে বুক চাপড়ে—যমের মুখে নিই গেল ছেলেটারে ওই মান্না গো। নিশাকর দেখেছে সর্বনাশটা। এমনি একটা কিছু ঘটবে সে ভয় করেছিল আর তাই ঘটেছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে সে ওই নিষ্ঠুর মৃত্যুতে। তিপলিও ছিল বালিচরে। সেও দেখেছে তার সর্বনাশটা। বুক চাপড়ে কাঁদছে সে। কদম বলে—আর কেঁদে কি করবি বল। তখন মানা শুনিসনি। ওই মহেশ মান্নাই আমাদিকে খাবেক। আমাদের বৌ বিটিদের ষাঁড় করছে ওই লোকটার লোভ। ওটা শকুন—

জেলে পাড়া, বাওয়ালী পাড়ার মদ্দ যোয়ানদের অনেকেই জালে যায় গাং-এ, আর ফেরে না। বাদাবনে যায়—বাঘের পেটে হারিয়ে যেতে। পদে পদে ওদের অপমৃত্যুর কালো ছায়া। মহেশ মান্নার মত লোকদের কারবারের ওরা পশরা মাত্র।

মহেশ চীৎকার করে—হাজার হাজার টাকার জাল জলে দিয়ে পরাণের ভয়ে দৌড়লি কুকুরগুলো কোথাকার, বেইমান।

সুমন্ত এগিয়ে আসে—ওদের কার হুকুমে জলে নামালেন মহেশবাবু? একটা মানুষও মারা গেছে শুনলাম।

মহেশ মান্না এ সময় সুমন্তবাবুকে দেখবে ভাবতে পারেনি। বলে সে—একবার আমরাই চেষ্টা করে দেখছিলাম স্যার। জালেও আটকালাম—

—এভাবে না জেনে শুনে কেন নামালেন ওদের? ট্রলার থেকে ধরতে পারে-নি ওকে—আপনি পারবেন। ওই লোকটার ক্ষতিপূরণ পুরো দিতে হবে আপনাকে। পুলিশে রিপোর্ট করুন।

মহেশ মান্না বলে—বিশ্বাস করুন স্যার, চেষ্টা করেছিলাম মাত্র।

সুমন্ত কোন কথা বলে না ওদিকে এগিয়ে গিয়ে নিশাকরের সামনে এসে দাঁড়ালো—সর্দার।

চাইল নিশাকর। ওর দুচোখে জলে ভরে উঠেছে। বলে সে—আমার

ছেলেটাকে নে গেল ওই শয়তান।

—তোমার ছেলে! অবাক হয় সুমন্ত। বলে সে—তবুও একবার চেষ্টা করবে না সর্দার। এত হাঙর মেরেছো—এটাকে পারবে না?

নিশাকর এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার ব্যর্থ কান্নায় ভেঙে পড়ে। বলে সে—কিন্তু ঘনাবাবু নাহলি ভরসা করি না হুজুর। ওরে দেখছি—আমার একটা মাত্তর ছেলেকেও শেষ করলো। ওরে কিছু করতি পারলাম না।

সুমন্ত ব'ল—ঘনশ্যাম বাবুকে বলেছিলাম, তিনি বলেন আমি আর দ্বীপের মানুষের কেউ নই—

নিশাকর বলে—তা সত্যি হুজুর। এতবড় মিথ্যেটাকে সত্যি করে ওরে জেলে পাঠালো।

সুমন্ত বলে—বসন্তবাবুর মেয়ের সঙ্গে দেখা করা যাবে না একবার?

—কেন হুজুর।

—আমি তাকেই বলতাম। মনে হয় কোথায় একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। ওকে দিয়ে বলাতে পারো, তাহলে তাঁকে যে ভাবে হোক খালাস করে আনবোই। আর মামলারও আপিল হবে। কথাটা নিশাকর ভাবতে পারে না। বলে সে—একবার সরকার মশায়ের কাছেই চলুন, ত্যানাকে বলে দেখি যদি কিছু করা যায়।

কদম হুজুরকে আসতে দেখে কাছে আসে। সেও শুনেছে ওদের কথাগুলো। কদম এ ব্যাপারে কিছু করতে পারে। বলে সে—হুজুর আমি কমলা দিদিকে বলতি পারি। ছোটবাবু খালাস হবে তো হুজুর। ওরে আনি স্থান। নালি আমাদের আর বাঁচাতে কেউ পারবেনি।

সুমন্ত চাইল ওর দিকে। বলে সে—বলো দিদিমণিকে। দরকার হয়···আমিই তার সঙ্গে কথা বলবো।

কদম একটু ঘাবড়ে যায়। হুজুরের সামনে সবকথা বলতে এত সহজে রাজী হবে না। আর জেনেছে কদম কে তাদের বসতিতে আগুন দিয়েছিল। ঘনশ্যামকেও সেই আগুন দেবার অপরাধেও দোষী করা হয়েছিল। কিন্তু কদম জানে মহেশ মান্না বসে থাকবে না। সেও চেষ্টা করবে আবার কমলাদির মুখ বন্ধ করতে। কদম—মেয়ে মানুষের মনের জ্বালা হুজুর—মেয়েদের কাছে বলা যত সোজা ব্যাটাছেলের কাছে বলা তত সোজা নয় গো।

হঠাৎ সুমন্তের মনে পরে তার মায়ের কথা। তার মাকেও চেনে কমলা। মা এলে হয়তো সুবিধা হতে পারে এ ব্যাপারে।

কদম বলে—আর হুজুর। মহেশ মান্না লোক সুবিধের নয়, আগেও শাসিয়ে

কমলাদিদিকে যা বলিয়েছে, এবারও তাই করতে ছাড়বে না। হয়তো কুন বিপদ হতে পারে। শুনছি একটা গুণ্ডা বাজে লোকের সঙ্গে কমলাদির বিয়ে দেবে জোর করে।

সুমন্ত কথাটা ভাবছে—তাই নাকি। প্রকাশ্যে এসব চেষ্টা করা ঠিক হবে না। বলে সে নিশাকরকে—সর্দার। সরকার মশায়কে আজই বিকালে সহরে আসতে বলো। তুমিও আসবে। রাতে ওখান থেকে, কাল সকালেই আমরা আসবো এখানে। কদম—তুমি কমলাদিকে বলে রেখো। কাল আমার মা আসবেন ওর কাছে।

কদম খুশি হয়—ঠিক আছে হুজুর।

মহেশ মান্না ভয় করেছে একটা কিছু অঘটন ঘটতে চলেছে। কমলাকে সরিয়ে ফেলার কথাও ভাবছে সে। কিন্তু তাতে বিপদ আরও বাড়বে। এস-ডি-ও সাহেব নিজেই আসছেন ঘনঘন। তাই মহেশ ঠিক করেছে বিয়ে থা দিয়ে দেবে নটবরের সঙ্গে সামনের বুধবারই। পৌষ মাসে বিয়ে হওয়া নিষেধ। তার জন্য নরহরি ভটচায আছে। পরদিন এসেছে মহেশ নটবরকে নিয়ে। সামনের বুধবার বিয়ে দিয়ে দেবে। আর বিয়ের পরই ওরা দুজনে চলে যাবে কাশীতে। সেখানে মহেশের পাণ্ডা আছে সে আবার বাবা বিশ্বনাথের চরণে দুজনের ডবল বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবে। বাসিনীর মন মানে না। সে বলে—একে অনূঢ়জাত, তায় পৌষমাসে বিয়ে দেব, কি গো

মহেশ মান্না সর্পাবিদ এসেছে বসন্তের বাড়িতে বিয়ের ব্যাপার পাকা করতে। তার খর্চা কিছুই হবে না। আর মহেশ মান্না তাকে দশবিঘে দোফসলী জমি দেবে পাকা কথা দিয়েছে। বাসিনী ঘোমটা টেনে দরজার আড়াল থেকে আপত্তিটা জানাতে মহেশ বলে—কি হে নরহরি? তোমার শাস্ত্র কি বলে? নরহরি ভটচায ইদানীং শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠেছে। বগলে তার তালপাতার পুঁথিটা বের করে দরজার উদ্দেশ্যে বলে—মা জননী, শাস্ত্রে অরক্ষণীয়া পাত্রীর জন্য সব বিধানই আছে। পৌষমাষএ প্রায়শ্চিত্ত করে শুভকাজ হয়। তাছাড়া কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের চরণে গিয়ে জোড়ে প্রণাম করবে, ব্যস। হরপার্বতীর মিলন হয়ে যাবে।

মহেশ বলে—তাহলে বসন্ত নটবর বাবাজী এসেছে, আশীর্বাদ করে ফেলো। এখন মহেন্দ্র যোগ চলেছে। আর কমলাকেও আসতে বলো। একসঙ্গে আশীর্বাদটা সেরে ফেলা যাক।

কমলা ঘরের ভিতর যেন বন্দী হয়ে আছে। আজ ওকেই ওরা শেষ করে

এই দ্বীপ থেকে সরিয়ে দেবে বহুদূরে। কাল কদম এসেছিল। ঝাউবনে গিয়ে কথাটা জানিয়েছে কদম। তাকে গিয়ে দেখা করতে হবে ঘনশ্যামের সঙ্গে। প্রথমে চমকে উঠেছিল কমলা। এ সে পারবে না।

কিন্তু কদম ক্রমশ ব্যাপারটা সবই বলে। সে ঘনশ্যামকে রাজী করাতে পারলে আপীল করা যাবে। আর ঘনশ্যাম হয়তো খালাসও পাবে। আবার ফিরে আসবে ঘনশ্যাম, সব কলঙ্ক মুক্ত হয়ে। কমলা এর জন্য সব কিছুই করবে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে তাকে। কিন্তু এখনও কেউ আসেনি তারা সহর থেকে। এই অবকাশে মহেশ মান্না এসেছে তার চরম সর্বনাশটাকে সুসম্পন্ন করে দিতে।

বসন্ত ডাকছে—আয় মা, ওরে কমলা।

কমলা অস্ফুট আর্তনাদ করে—মা! এ সর্বনাশ করো না মা। তার চেয়ে দড়ি কলসী দিয়ে গাং-এ ডুবিয়ে দাও। মা—মাগো।

বাসিনী মেয়েকে জড়িয়ে ধরে।

কিন্তু সে অসহায়, নিরুপায়। বসন্ত ওকে ডাকাডাকি করে না পেয়ে বেশ রেগেই ঘরে ঢুকেছে। দুজনকে ওই অবস্থায় দেখে বলে—কি হচ্ছে এসব।

বাসিনী শোনায়—ওগো। এসব এখুনিই না করলে নয়?

বসন্ত ধমকে ওঠে—সবতাতেই বাধা। শুভকাজ শান্তিতে হতে দেবে না দেখছি? চলো—চল বলছি। যত্তোসব ন্যাকামি।

কমলাকে টেনে এনে বসায় দাওয়াতে।

নরহরি তখন মন্ত্র পড়ে চলেছে। হাঁক পাড়ে—ধান দুর্বা আনো। আর শঙ্খ বাজাতে হবে—

কমলাকে যেন বলির পাঁঠার মত ওরা হাড়ি কাঠের সামনে এনেছে।

হঠাৎ কাদের ডাক শোনা যায়—বসন্তবাবু আছেন?

ঢুকছে সুধাময়ী, সুমন্তর কথায় সে ও রাজী হয়েছে। সুমন্ত মাকে বলেছে সব। কমলাকে জোর করে নাকি বিয়ে দিয়েও সরিয়ে দিতে চায়, যাতে সত্য কথা আর লোক লজ্জার ভয়েও সে না বলতে পারে কোনদিন।

সুমন্ত, নিশাকর, গিরিবালাও রয়েছে সুধাময়ীর সঙ্গে। পিছনে কদমও এসেছে। সুমন্ত উঠানে পা দিয়ে এসব আয়োজন দেখে অবাক হয়। মহেশ মান্না চমকে উঠেছে। তবু সে স্থির কণ্ঠে বলে—একটু ব্যস্ত আছে বসন্ত হুজুর। মেয়ের পাকা দেখা কিনা। কই হে বসন্ত—নাও, আশীর্বাদ কর।

নটবরও মাথা পেতে বসে আছে।

সুধাময়ী কমলার দিকে চেয়ে থাকে। কমলাও অসহায় কান্নায় ভেঙে

পড়ে। সুধাময়ী ডাকে—কমলা।

কমলা উঠে পড়ে, ছুটে আসে সুধাময়ীর কাছে। বলে সে—আমাকে জোর করে বিয়ে দিতে চায়। বাবা—

মহেশ চটে ওঠে—কেন কি অন্যায় করেছে তোমার বাবা? এ্যা— এসো—

—না। কমলা আজ রুখে ওঠে। কঠিন স্বরে বলে সে—আপনি বাধ্য করিয়েছেন বাবাকে এই বিয়েতে মত দিতে, আমি রাজী নই। এ বিয়ে করার চেয়ে মরাই ভালো। অনেক—অনেক ক্ষতি করেছেন আমার, সর্বনাশ করেছেন। এটুকু না করলেই নয়?

মহেশ গর্জে ওঠে—কি বলছো তুমি? ও হে বসন্ত—

বসন্ত কিছু বলার আগেই বাসিনীও বের হয়ে এসে জানায়—আমারও মত নেই।

সুমন্ত বলে—মহেশবাবু, ওদের যেতে বলুন। এ বিয়ে হতে পারে না।

—কেন হুজুর। গরীবের কন্যাদায়। মহেশ বলার চেষ্টা করে।

সুমন্ত বলে—মেয়ে নাবালিকা, তার অমতে জোর করে বিয়ে দেবার কোন অধিকার আপনার নেই। এটা সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ। তার জন্য আপনার এগেনষ্টে ষ্টেপ নিতে পারি।

মহেশ মান্না এবার ভুল বুঝেছে। ছোকরা এস-ডি-ও তৈরী হয়েই এসেছে। মহেশ মান্না মনে মনে রেগে উঠলেও বেশ মোলায়েম স্বরে বলে—এসব ভাবিনি হুজুর। ভেবেছিলাম গরীবের কন্যাদায় উদ্ধার যদি হয়ে যায়, হোক। পরের এইটুকু উপকার করতেই চেয়েছিলাম। এতে যদি ওদেরই অমত থাকে আমার আপত্তি হবে কেন হুজুর। বেশ—তাহলে বসন্ত আমি চলি। চলি হুজুর। অপরাধ নেবেন না। এসো হে নটবর, ওহে নরহরি—

নরহরি ভটচায স্বয়ং এস-ডি-ও সাহেবকে দেখে ঘাবড়ে গেছে। আগেই নামাবলীর মধ্যে শিলারূপী নারায়ণকে চালান করে উঠে পড়েছে। বলে সে—তাহলে চলি মান্না মশাই, আমার আবার নিত্য সেবা পূজা বাকী আছে। মন্দিরে ওই হাঙ্গরের জন্য শান্তি যজ্ঞ করা হচ্ছে, যেতে হবে। চলি হুজুর। পেন্নাম।

মহেশ মান্না দলবল নিয়ে চলে যেতে বসন্তও বের হতে যাবে, সুমন্তের ডাকে দাঁড়ালো সে।

কি অজানা ভয়ে তার বুক কাঁপে।

সুধাময়ীর কাছে আজ কমলার লুকোবার কিছু নেই। সবই বলেছে সে।

দুচোখে জল নামে। বাসিনী বলে—দিদি ভয়ে ভয়ে বাস করছি। জলের হাঙর এ দেশের লোকের সর্বনাশ করছে। আর এদিকে আমরা বেঁচে আছি ডাঙার হাঙরের মুখে। মাঝে মাঝে মনে হয় শেষ করে দিই নিজেকে। পারিনি শুধু মেয়েটার মুখ চেয়েই।

ঘনশ্যামের সঙ্গে বিয়ে থা হয়ে যেতো এ্যাদ্দিনে কিন্তু গ্রহের ফেরে সে আজ জেলে, আর ওই মেয়ে তার চোখে আজ পরম শত্রুই হয়ে গেছে: সবই অদৃষ্ট দিদি।

সুধাময়ী চুপ করে শুনেছে কাহিনীটা। বিচিত্র এক কাহিনী। ঘনশ্যামের জন্য আজ বেদনা বোধ করে সে। ছেলেটিকে দেখেনি—চেনে না। কিন্তু এতবড় চক্রান্ত আর দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে সে জেল বন্দী হয়ে আছে। বাইরের হাজারো অসহায় মানুষ আজও তাকে ভালবাসে। সুধাময়ী বলে কমলাকে—তুই ভয় পাস নে মা। চল আমার সঙ্গে। ঘনশ্যামকে বলবি সব।

. কমলা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে—না। আমি বলতে পারবো না। এ পোড়া মুখ তার সামনে দেখাতে পারবো না। এ আমি পারবো না।

অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে কমলা। সুধাময়ী বলে—পারতেই হবে মা। না-হলে এতবড় অন্যায়টাকে মেনে নিবি? একজন পচবে জেলে—এতগুলো লোকের রুজি রোজকার বন্ধ হয়ে থাকবে?

কমলা কি ভাবছে। এলোমেলো মনকে সে সংহত করার চেষ্টা করছে। এ কাজ তাকে পারতেই হবে।

কদম বলে—সে রাতে আগুন কে দিয়েছিল বসতিতে আমি জানি দিদি। সর্দার, সেই লোকটাকে ধরতে গেলাম, মেরে কপাল ফাটে দে পালালো। সি দাগ এখনও রয়েছে। ঘনশ্যামবাবু আগুন দেয়নি।

অগ্নিসংযোগ-এর চার্জও তার নামে।

কোন সাক্ষীই ছিল না ঘনশ্যামের। আজ সুমন্ত কথাটা শুনে বলে—কে দিয়েছিল আগুন।

কদম বের করে কালো কারে বাধা সেই তাবিজটা। গজেনের নাম লেখা। সোনার তাবিজ সখ করে গড়িয়ে সে পরতো। অনেকেই চেনে। নিশাকর বলে —এতো গজেনের তাবিজ।

কদম বলে—ওই মুখপোড়াই এসেছিল সে রাতে, দুজনকে নে। তারা কারা জানি না। তবে গজেনকে ধরেছিলাম—পালিয়ে গেল সে।

ঘনশ্যাম ভেবেছিল সাহেবকে ভাগিয়েছে আর কেউ আসবে না। জেলের

পাঁচিলের ভিতরে গেপেনে বিড়ি-এটা সেটা যায়। খবরও যায় হাওয়ায় ভেসে। ঘনশ্যামও শোনে—মেলার পথ বন্ধ প্রায়। ওদিকে মাছের কারবারও বন্ধ।

জগদীশ বলে—বুঝলা ছোটবাবু। যা শোনলাম তাতি মনে হয় সর্বোনাশ হই যাবে। সাগর দ্বীপে সেদিন গুপীনাথকে নে গেছে। আবার হানা দিচ্ছে নামখানার বড গাং-এ। রোজই শালা ঘা দিই চলিছে। ডি-এম সাহেব আরও কারা কাল আসছিল ফের।

—মরুকগে শালোরা। ঘনশ্যাম গর্জে ওঠে। ওসব নিয়ে ভাবতে চায় না সে।

তবু দেখছে ঘনশ্যাম সেই দিনের পর থেকে পাঁড়েজীও তাকে আর ঘাঁটায় না। জেলখানার মাঠে টাংনা চালানোর কাজ থেকে তাকে এবার ওদের কাজের তদারকি করার ভার দিয়েছে। ঘনশ্যাম বলে—ব্যাপার কি পাঁড়েজী?

পাঁড়েজী বলে—বহুৎদিন উ কাম করেছো ঘনশ্যাম, ইবার থোড়া আরাম করো।

হাসে ঘনশ্যাম—তোফা আরামেই রেখেছো কিন্তু। তবু ঘনশ্যাম রোজ মাঠে যায়। অন্যান্যদের সঙ্গে কাজে হাত লাগায়। ফসলের হিসাব করে। নানা কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে সে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা, তার মনের জ্বালাটাকে ভুলতে চায়।

জগদীশের কথায় আজ মনে পড়ে নিশাকর আরও হাজার জেলে বাওয়ালীদের কথা। তাদের রুজি রোজকার বন্ধ। নিশাকরের একমাত্র ছেলেটাও গেছে সেই হাঙরের পেটে আরও কতজন হারিয়েছে তাদের প্রিয় জনকে। সমুদ্রের ডাক ভেসে আসে বাতাসে। ঘনশ্যামের মনে হয় সে ঘুরছে উধাও গাং-এ। একবার চেষ্টা করবে সে এত লোকের সর্বনাশের মুল ওই হাঙরটাকে মারতে।

নীল গাং-এর অসীম শীতের রোদে ঘুরছে সে লঞ্চ এর ইঞ্জিনের গুরু গুরু শব্দে ওঠে, রাত্রি নামে। তারাজ্বলা রাত্রির অন্ধকারে কোথায় ঘুরছে সে। ভোর হয়ে আসে।

হাঙরটার মুখ যেন মহেশ মান্নার মতই।

ওই মুখটা তেমনি হিংস্র—আদিম। চমকে ওঠে ঘনশ্যাম পালাচ্ছে মাছের ঝাঁক, আর্ত চীৎকার ওঠে। সামনে পেয়েছে সেই হিংস্র জীবটাকে। হঠাৎ কার ডাকে চাইল ঘনশ্যাম। খেয়াল হল তার। বৈকাল নেমেছে। জেলখানার মাঠে বসে কি সব ভাবছিল সে।

জেলের অপিসের মেট এসেছে—ঘনশ্যাম, অপিসে যেতে বললেন সাহেব।

তুমার ঘর থেকে কারা এসেছে।

চমকে ওঠে ঘনশ্যাম। কারও সঙ্গে সে দেখা করতে চায় না। এই জীবনের অন্ধকারে ওরা আনে মুক্তির ব্যঙ্গ। ওরা ঘরে ফিরে যাবে—সেই অবাধ বিস্তারে, সবুজ দ্বীপে—রূপালী বালুচরে। আর পড়ে থাকতে হবে তাকে একলা এই বন্দীপুরীতে। সেই যন্ত্রণাটাকে এড়াতে চায় সে। বলে কারা এসেছে?

মেট জানায়—সো না জানে। আরে চলো তো। সমঝা ঘনশ্যাম—নয়া এস-ডি-ও সাব্ তুমাকে বহুৎ প্যার করে।

বিরক্তি ভরে বলে ঘনশ্যাম—ওদের প্যারের ঠ্যালায় এবার জান প্রাণ না যায়।

চমকে ওঠে ঘনশ্যাম। এখানে কমলাকে দেখবে কোন দিনই ভাবেনি সে। ওর উপরই ছিল তার অগাধ বিশ্বাস, ভালোবাসা, নির্ভরতা। জীবনে সেইই ছিল ছিল তার সব চেয়ে কাছের মানুষ, আপন জন। আর সেই কমলার জন্যই আজ তার এতবড় দুর্ভোগ। আরও বিচিত্র মনে হয়েছে ওর আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যা সেই ভাষণ।

সেই কথাগুলোকে বার বার ভোলার চেষ্টা করছে ঘনশ্যাম। কিন্তু পারেনি। তার সব চিন্তা ভাবনা, বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেই ব্যাপারটা। তাই হয়তো অকারণেই ঘনশ্যামের মনটা বিকৃত হয়ে গেছে। মুছে গেছে তার মন থেকে হাসি আনন্দ সব কিছু। তাই কমলাকে দেখে অবাক হয় সে—তুমি!

কমলার জবাব দেবার কিছুই নেই। সে যেন একটা জমাট পাথরের স্তূপের সামনে এসে আছড়ে পড়েছে।

ঘনশ্যাম বলে—আদালতে দাঁড়িয়ে পরম সত্য কথা বলে আজ দেখতে এসে-ছিস সেই লোকটার দুর্ভোগের আর কত বাকী? ভাবলাম বিয়ে থা হয়ে গিয়ে রাজরাণী হয়েছিস—

কমলার দুচোখে জল নামে।

ঘনশ্যাম বলে—চোখের জল ফেলে ন্যাকামি করতে হবে না এখানে।

ঘনশ্যাম ফিরে যাচ্ছে ঘৃণা ভরে।

হঠাৎ কমলার আর্ত চীৎকারে দাঁড়ালো—শোনো। একটি বার শোনো—

চাইল ঘনশ্যাম। কমলার দুচোখের জল গালে নেমেছে। কমলা দেখছে ঘনশ্যামকে, সেই বলিষ্ঠ সুন্দর মানুষটার পরণে জেলের পোষাক। দাড়িগুলো

কাটা হয়নি। কক্ষতায় ভরা। কমলাই তাকে এইখানে পাঠিয়েছে।

কমলা বলে—কেন ও কথা বলেছিলাম তা তো জানতে চাইলে না?

রুক্ষ স্বরে বলে ঘনশ্যাম—জানার দরকার কি? আমি জানি কমলা বলে কাউকে জানতাম না—আজ তাকে চিনি না। ব্যস—চুকে গেল ল্যাঠা।

কমলা বলে—তুমি চলে আসার পর আমি সত্যি কথা বলবো তা জানতো নিশাকর। পিসী—সরকার ওদেরকেও বলেছিলাম।

ঘনশ্যাম সেই কথাটা মনে করতে পারে। সরকার কাকাও বলেছিল তাকে। কিন্তু তা হয়নি। কারণ একটা রয়েছে। ঘনশ্যাম কমলার দিকে চাইল।

কমলা বলে—কিন্তু সেই রাতে মহেশ মামা লোকজন নিয়ে বাড়িতে এসে বলে—কোর্টে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথাগুলোই বলতে হবে। নাহলে সেই রাতেই বাবা—মাকে খুন করে আমাকে তার লেঠেলদের হাতে তুলে দেবে। তারা যা ইচ্ছে করে—

ঘনশ্যাম সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারের ছবিটা কল্পনা করতে পারে না।

কান্নায় ভেঙে পড়ে কমলা। বলে সে—মাকে বাঁচাবার জন্য, নিজের মান ইজ্জৎটুকু রাখবো এ ভরসা দিতে পাশে কেউ নেই। সারা দ্বীপে একটা মানুষকেও পাইনি। তাই সেদিন মান প্রাণের দায়ে—ওকথা বলেছি। কান্নায় বুক ভাসিয়েছি কতো তা বাবা ঠাকুর জানে, জানে মা গঙ্গা তবু আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। এ পোড়ামুখ দেখাতে চাইনি—

কমলার কথাগুলো শুনছে ঘনশ্যাম। মহেশ মামা সব পারে। গজরাচ্ছে ঘনশ্যাম—এতবড় অন্যায় করেছে সে?

কমলা বলে—তারপর নটবরের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিয়ে আমার সর্বনাশ করতো কালই।

—সেকি। ঘনশ্যাম ভাবতে পারেনি এসব কাণ্ড ঘটছে। হাতের মুঠি দুটো শক্ত হয়ে আসে। সামনে পেলে মহেশকে সে শেষ করে দিতো।

কমলা বলে—কাল এস-ডি-ও সাহেব, ওর মা সকালে গিয়ে পড়তে বেঁচে গেছি। এতদিন সাহস, ভরসা পাইনি—আজ ভরসা পেয়েছি ঘনশ্যামদা, আমি সত্যি কথাই বলবো এবার আদালতে। যা ঘটেছে সব।

ঘনশ্যাম ক্লান্ত স্বরে বলে—কোন লাভ নেই কমলা। ন্যায় বিচার কোনদিনই হবে না।

আর্তস্বরে বলে কমলা—হবে। এবারের এস-ডি-ও সাহেবকে তুমি চেন না, খুব ভালো লোক। ওর মাও খুব ভালো। সব শুনে ওরাই জোর করে

আমায় নিয়ে এলো। কাকাও এসেছে—নিশাকর, রতন এসেছে। তুমি সই করবে।

আর এস-ডি-ও সাহেব বলেছেন তার আগেই তোমাকে খালাস করতে পারবেন। তুমি দ্বীপে যাবে—মানুষের শত্রু ওই হাঙরটাকে শেষ করবে। সবাই জানবে—তুমি কোন অন্যায় করোনি। অন্যায় করতে পারো না। সব দোষ ওই মহেশ মান্নার।

বাইরের আমন্ত্রণ, আবার মুক্তির আশ্বাস। কিন্তু কেমন যেন অবিশ্বাস হয় ঘনশ্যামের। কাদের জন্য করবে ওসব। এতবড় চক্রান্তটাকে ভুলতে পারেনি সে। ঘনশ্যাম ক্লান্তস্বরে বলে—ওসবে আর কাজ নেই। তুই যা কমলা।

—কোথায় যাবো? ওই শয়তানের হাতে পড়ে শেষ হবার আগে গাং-এর জলেই পড়ে শেষ হয়ে যাবো। বাঁচতে আর পারবো না। বাঁচার কোন পথ আমার নেই।

ঘনশ্যাম চীৎকার করে—আমি কি করবো? জেলখানায় বন্দী থেকে কিছুই করার আমার নেই। যার যা হবার হোক—আমার করার কিছু নাই। কেন? কেন এসেছিলি সব জেনে—ওই সব কথা বলতে? তখন পারিস নি?

ঘনশ্যাম কার হাতের স্পর্শ পেয়ে চাইল। সুমন্ত এসে দাঁড়িয়েছে। সুমন্ত বলে—এখনও সময় আছে ঘনশ্যাম। আজই আপীলের দরখাস্ত করো। আমি বলছি কমলা আজ সত্যি কথা বলবে, আবার খালাস পাবে তুমি।

—কারো দয়া কুড়িয়ে খালাস পেতে চাইনা। বাঁচতে চাইনা। দয়া করে আমাকে যেতে দিন। জেলখানাতেই পচবো—সেই ভালো।

ঘনশ্যামের কথায় বলে সুমন্ত—না। নিজের অধিকারেই তুমি আবার বাঁচবে ঘনশ্যাম। তুমি এখনও এই এলাকার মানুষের সবচেয়ে বড় বিপদে তাদের উদ্ধার করতো পারো, বাঁচাতে পারো সেই অধিকারেই আবার সব ফিরে পাবে। মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠাকে অর্জন করতে হয়, ভালোবাসাকে জয় করে ফিরিয়ে আনতে হয়, তা তুমি পারবে ঘনশ্যাম।

ঘনশ্যাম ভাবছে কথাটা।

নিশাকর, রতনদের দিকে চাইল। লোকগুলোর আজ চরম বিপদ। ওদের মুখে ভাষা নেই, মহেশ মান্নার মত লোকেরা ওদের স্তব্ধ করে দিয়েছে। আর সেই হাঙরটাও।

নিশাকর কেঁদে ফেলে—ছুটবাবু, বাপ হয়ে ছেলেটাকে নে যেতে দেখলাম,

আমি নিশা সর্দার কিছু করতি পারলাম না।

রতন বলে—উপোস দিই মরছি বাবু, একটা জানোয়ারের জন্তি। কেউ নাই যে ওরে শেষ করি দ্বীপের মানুষের মুখে হাসি আনতি পারি? যাবেন না বাবু? আপনেও আমাদের ভুলে গেলেন—পর হই গেলেন?

—ঘনশ্যাম।

সুমন্তর ডাকে চাইল। সুমন্ত বলে—তুমি রাজী হলে প্যারোলে তোমাকে খালাস করার হুকুম আনবো। আমিও থাকবো তোমার সঙ্গে—পারো না ওটাকে শেষ করতে? আমি জানি তুমিই পারবে।

—বাবু! নিশাকর আশা ভরে চেয়ে থাকে। চেয়ে আছে কমলা। আজ সেও চায় ঘনশ্যাম তার হারানো প্রতিষ্ঠা সেই দিনগুলোকে ফিরে পাক। তার চাইবার কিছুই নেই। সে এসেছে এত বড় বিপদ জেনেও ওর কাছে।

গিরিবালা, সরকার দেখছে ওকে। স্তব্ধ ঘনশ্যাম ভাবছে কথাগুলো। একটা শত্রু—একটা অন্যায়, একটা আতঙ্ককে মুছে ফেলার কথাই ভাবছে সে। বন্দী জীবনে সে থাকতে পারবে না। মরতে হয় অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেই মরবে।

গিরিবালা বলে—তুই যাবি না বাবা? কাকে নে থাকবো তাহলে?

ঘনশ্যাম দেখছে ওদের। নিশাকর বলে—দ্বীপের সব জেলেরা আজ তোমাকে চায় ছোটবাবু, তাদের আর কেউ নাই গ।

কোন মানুষ সব হারিয়ে কিছুদিন সরে থাকতে পারে অভিমানভরে, কিন্তু অনেক কিছুই সে পেতে চায়। সব নিয়ে সে বাঁচতে চায়। ঘনশ্যাম ভেবেছিল সরে থাকবে সে। কিন্তু পারে না। কমলার চোখের জল, পিসীর অনুরোধ, নিশাকরদের মুক্ত অবাধ জীবনের আমন্ত্রণ, আর নিজের সব কিছু ফিরে পাবার আগ্রহটা ঘনশ্যামকে উতলা করে তোলে।

সে বলে—ঠিক আছে কাকা। আপনিই করো। দেখা যাক্ কি হয়।

সুমন্ত বলে—সেই সঙ্গে প্যারোলের আবেদনও করার ব্যবস্থা করছি, তাহলে রাজী আছো ঘনশ্যাম?

ঘনশ্যাম দেখছে তরুণ এস-ডি-ও কে। আগেকার সেই ভদ্রলোকের যেন সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মানুষ। ঘনশ্যাম রাজী না হয়ে পারে না।

ওরা ফিরে যাচ্ছে কি আশা নিয়ে। অপিসে ঘনশ্যামকে নিয়ে বসেছে সুমন্ত। দরকারী কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়েছে। উঠতে যাবে ঘনশ্যাম সুমন্তর কথায় চাইল।

সুমন্তও দেখেছে ব্যাপারটা, কমলার সঙ্গে ওর মান অভিমানের পালাও ফুরিয়েছে। আজ ঘনশ্যামও মনে মনে খুশী হয়েছে।

সুমন্ত বলে—দ্বীপে এমনিই ঘুরিনি ঘনশ্যামবাবু, কাগজপত্র সবকিছুর আড়ালে কঠিন সত্যটাকে বুঝেছিলাম, তাই এমন একজনকে এনেছিলাম—যাকে কোনদিন ফেরাতে পারবেন না।

ঘনশ্যাম চমকে ওঠে।

হাসছে সুমন্ত। ঘনশ্যাম বলে—আপনি সাংঘাতিক লোক স্যার।

সুমন্ত বলে—তা যদি বুঝে থাকেন তাহলে এড়াবার চেষ্টা করবেন না। গা—দু' একদিনের মধ্যেই বের হতে হবে হাঙরটার পিছনে। সব ব্যবস্থাই করে রাখছি।

ঘনশ্যামের সামনে এ যেন একটা চ্যালেঞ্জই। কঠিন চ্যালেঞ্জ। হাঙরটাকে শেষ করে বিপদমুক্ত করতেই হবে। তারজন্য যদি প্রাণ যায় তাতেও রাজী সে। জীবনভোরই এই লড়াই চালাতে হবে তাকে, গাং-এর হাঙর নয়, ডাঙার হাঙরদেরও সমুচিত করবে সে। তাদের অন্যায় অত্যাচারের বলি যেন বন্ধ হয়। ঘনশ্যাম নিজের জীবনে বুঝেছে তার যন্ত্রণা কতো তীব্র।

খবরটা দ্বীপেও ছড়িয়ে পড়ে। মহেশ মান্না অসহ্য রাগে ফুঁসছে। এমনি করে তাকে কোণঠাসা হতে হবে সবদিক দিয়ে ভাবেনি সে। নটবর—নরহরিদের সামনে ওই ছোকরা এস-ডি-ও তাকে হটিয়ে দিয়ে কমলাকে নিয়ে গেছে শহরে। বসন্তও গেছে বাধ্য হয়ে। মেলার কাজ এবার বেশ কিছুটা তার হাতের বাইরে চলে গেছে। সব মাল লঞ্চ বার্জ দিয়ে আনাতে পারেনি। সরকারী গাধাবোট কাজে লেগেছে। যাত্রী পারাপার করতে হবে ওই দিয়েই।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও বলেন—আমাকেও সরকারী হুকুম মানতে হয় মহেশবাবু, নাহলে এতদিন এসব তো হয়নি। আর ব্যাটা হাঙরটার জন্যই সব উলটে গেল।

মহেশ বলে—ঠিক আছে। আপনারাই করুন সব। অমন ছোকরা এস-ডি-ও ঢের দেখেছি। এর পর আমিও কলকাঠি নেড়ে ওকে ট্রান্সফার করাচ্ছি। মহেশ মান্না গর্জাচ্ছে। যাত্রীদের জন্য এখন গঞ্জে পুলিশ ফাঁড়ি বসেছে। এখানকার পুলিশ অফিসারও এসেছে পারঘাটে। মহেশকে ঠিক আমল দেয় না তারা। বরং যেন কঠিনস্বরে বলে—ডিঙি যেন না নামে মহেশবাবু।

বসন্তও এই খেয়ায় নেমেছে। কমলা, গিরিবালা, নিশাকররাও এসেছে পিছনে নামছে অঘোর সরকার। নিশাকরদের বেশ খুশিই দেখা যায়।

বসন্ত ঢুকতে মহেশ চাইল—কি ব্যাপার?

বসন্ত চুপ করে থাকে। কথাটা জানাতে পারে না সে। মহেশের ধমক খেয়ে বসন্ত এবার হাউমাউ করে ককিয়ে উঠে জানায়—বিশ্বাস করুন মামা মশাই আপনি আমার অন্নদাতা। এসব করার কোন ইচ্ছেই ছিল না। কিছুই করিনি। ওই ছোকরা এস-ডি-ও চাপ দিয়ে ঘনশ্যামকে দিয়ে আপীলের দরখাস্ত করালো।

চমকে ওঠে মহেশ, আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে, তবে এবার সামলানো সোজা হবে না। কারণ এস-ডি-ও এর মধ্যে নাক গলিয়েছে। কমলাকে দিয়ে তার ষ্টেটমেন্ট নোতুন করে রেকর্ড করিয়ে নিয়েছে। এই বিচারে কে দোষী সাব্যস্ত হবে তা মহেশ ভালো করেই বুঝেছে। তাই গর্জে ওঠে মহেশ বসন্তকে—ন্যাকা। কিছুই জানো না?

বসন্ত অনুনয় বিনয় করে বলে—না মামাবাবু—

—যাক্।

মহেশ মামা উঠে পড়ে বের হয়ে গেল। এবার সামনে তার কঠিন বিপদ। যে ভাবে হোক তাকে উদ্ধার পেতেই হবে। কঠিন একটি মানুষ আগামী বিপদের সঙ্গে লড়বার জন্য কঠিনতর হয়ে ওঠে।

যাত্রী দল এসে জমছে কাকদ্বীপ, ডায়মণ্ডহারবারের চারিদিকের মাঠে, নদীর চরে বালিয়াড়িতে। সারা ভারতের লোকজন—মায় বিদেশী দেশী ছেলে-মেয়ের দলও আছে। ঝুপড়িতে, না হয় ফাঁকা আকাশের নীচের হিম হিম কুয়াসার চাদর জড়ানো গাং-এর ধারে আগুন জ্বলছে, ছায়ামূর্তির দল বসে আছে দুঃসহ শীতে। কিছু কিছু সাধুসন্ন্যাসীর দল গহনার নৌকায় পার হয়ে এর মধ্যে মেলার প্রাঙ্গণে হাজির হয়ে নিজেদের জায়গা-আস্তানা ঠিক করে বসে গেছে। রকমারি সাধু—আর যত চ্যালারা গাঁজার ধোঁয়ায় শীতকে জয় করার চেষ্টা করছে। নরহরি ভটচাযও তার আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে ঘাটপুরোহিতের ঠাঁই দখল করেছে কয়েকটা তক্তপোষ পেতে। নাহলে জলে কাদায় বসা যায় না।

কিন্তু যাত্রীর ভিড় তখনও শুরু হয়নি। আর ক'দিন পরই মকর স্নানের যোগ। কিন্তু হাঙরটা যেন খবর পেয়ে গেছে। প্রায়ই দেখা যায় তাকে।

দিন একটা বিচালীর নৌকাকেই ঘা মেরেছিল। বিরাট নৌকাটার হাল কাঠ লে ভেসে গেছে—কোনমতে বাঁচছে। মানুষও মারছেই। মহেশ মান্নার সাগর লও ফেঁসে গেছে। নরহরি—আরও অনেকে এবার পড়েছে নবাগত সাধু হাজনকে নিয়ে।

ঝাউবনের নীচে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছে মহারাজ। সাধুর চ্যালারা আর রহরির নেতৃত্বে কিছু লোকজন বেদম খোল কর্তাল পিটে নামগান করছে। সাধু হারাজ চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

নরহরি চীৎকার করে—বাবা, উদ্ধার করে বাবা। মহাবিপদ থেকে সৃষ্টি দ্ধার করো বাবা। হাঙরটাকে শেষ করে দাও।

কোন চ্যালা বলে—মহারাজ সাক্ষাৎ মহাদেব। এক গণ্ডুষে গঙ্গাকে শেষ রে দিতে পারেন, তার কাছে ওই হাঙর তো তুচ্ছ। বাবার কৃপাসে সব ঠিক ক্‌ হোয়ে যাবে।

ওরা বেদম খোল কর্তাল পিটছে। সারা দ্বীপের আর্ত মানুষ জুটেছে বার ওখানে যদি কোন সুরাহা হয়। মহেশ মান্নাও এসেছে। তার এখন রিদিকে বিপদের বেড়াজাল, যদি বাবার দয়ার উদ্ধার পায় তাই সেছে সে।

মহেশ মান্না বলে—ত্রাণ করো বাবা। আশ্রম বানিয়ে দেব এখানে। পাকা শ্রম, বিশ বিঘে ধান জমি দেব।

চ্যালারাও খুব খুশী হয়। বলে—বাবাকো স্মরণ লেও। বাবা কৈলাস ধামসে য়া—সাকসাৎ মহাদেও জী।

সাধু মহারাজ দুদিন মৌনী রয়েছেন। কঠিন তপস্যা করছেন। তপস্যা ভঙ্গ রে এবার এদের ব্যবস্থা করবেন। বাবা সাক্ষাৎ মহাদেব। দয়ার অবতার। ালানাথ।

মহা ধুমধাম করে বাবা চলেছেন এবার সমুদ্রের দিকে। হাজার মানুষ টেছে। বাবা তপোবলে গাং-এর ওই হাঙরকে দূর করে দেবেন।

মহেশ মান্না আর্তস্বরে চীৎকার করে—বাবা। দয়া কর বাবা।

নরহরি লিকলিক দেহ নিয়ে ভিড় সামলাবার চেষ্টা করে—সরে যাও। বাকে যেতে দাও। বাবা সমুদ্র শাসনে চলেছে।

ভক্তরা তীরে দাঁড়িয়ে আছে। বালুচরে হাজারো মানুষ। মা গঙ্গা—বা কপিলমুনির জয়ধ্বনি দিচ্ছে। উদ্দাম বেগে নৃত্য সহযোগে কীর্তন াছে। বাবা স্নানে নামছেন। এবার হাঙরটাকে পালাতেই হবে বাবার

তেজে। সমুদ্রের ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে। বাবা জলে নেমে ডুব দিয়ে এবার গণ্ডূস পান পরে মন্ত্রধ্বনি করছে। হঠাৎ দেখা যায় চকিতের মধ্যে একটা রূপালী বিদ্যুৎ রেখার মত কি নীল জলে জেগে ওঠে—সেটা শূন্যে একটা ঝাপটা মেরেছে—বাবাজীও সেই ঝাপটায় গিয়ে পড়ে দূর সমুদ্রে। আর্ত-চীৎকার করছে—আর সেই নিমিষেই তাকে আর দেখা যায় না। বিরাট আলোড়ন তুলে হাঙরটা ওকে নিয়ে ডুবে যায়। তীর ভূমিতে আছড়ে পড়ে ঢেউ-এর হুঙ্কার

আর্ত চীৎকার করে দৌড়চ্ছে ভক্তবৃন্দ। খোল কর্তাল নিয়ে দৌড়চ্ছে কীর্তনীয়ার দল। কার ধাক্কায় শ্রীখোল ছিটকে পড়ে চুরমার হয়ে যায়। নিমিষের মধ্যে বালিচর শূন্য করে ওরা তফাতে সরে এসেছে। বাবাও কোথায় বিলীন হয়ে গেছে। নরহরি এত বিপদেও গর্জে ওঠে। শালা বিটকেল ভণ্ড হয়েছে।

মহেশ মান্না হতাশ হয়ে শেষ ভরসা পেয়েছিল বাবার কাছে। কিন্তু সে সব মিথ্যা হয়ে গেল। ওই হাঙরটা যেন তাদের সব বিশ্বাস-আশ্বাসকে তিলে তিলে শেষ করে দিয়েছে।

ওদিকেও বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আপীল করেছে ঘনশ্যাম। মহেশ মান্নার সাম্রাজ্যে যেন এবার ভাঙ্গন ধরছে। তাই মরীয়া হয়ে উঠছে সে। বলে মহেশ মান্না—আর এসবে নাই নরহরি।

নরহরি অবাক হয়—আজ্ঞে মেলা কমিটির সেক্রেটারী আপনি—

মহেশ বলে—চুলোয় যাক তোমার মেলা, এসবে আর নেই! হন্ হন্ করে চলে যায় সে।

সুমন্ত ক'দিনেই সদর থেকে সব ব্যবস্থা করে এনেছে। বৈকালে জেল অপিসে গেছে নিজে। জেলার সাহেব একটু অবাক হয়। এর আগে এই জেল থেকে প্যারোলে কোন কয়েদীকে ছাড়া হয়নি। এই প্রথম।

ঘনশ্যামও অবাক হয়।

অপিসে ডেকে আনা হয়েছে তাকে। অন্য কয়েদীরাও অবাক হয়েছে। জগদীশ, গদাধর বলে—ওকে চেননা পাড়েজী। মস্ত বড় ঘরের ছেলে—ওর বাবা ভুবন মাইতি সাগর দ্বীপের মাথা ছিল। আর নিজেও ঘনশ্যাম কমতি নয়, নাহলি খোদ এস-ডি-ও সাব ওর জন্যি এত করে।

গদাধর বলে—এবার হাঙর মারতি পারলি দেখবা ওর সাজাও মুকুব হবে।

জগদীশ শোনায়—তার জন্যি আপীলও হয়েছে। সব নাকি মিথ্যে

সাজানো মামলা গো। বুঝলা খুড়ো ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

কথাটা মানতে রাজী নয় গদাধর। বলে সে—রাখ দিকি ওসব কতা। তু আমি কি করেছি যে জেলে আছি? মহাজন জোর করি ধান নে গেল। রুখতি গেলাম। বলে ফৌজদারী করিছ। ব্যস জেলে যাও। ধম্ম কম্মো নাই।

জগদীশও ভাবছে কথাটা। বলে—কে জানে? তবে ঘনাবাবু যদি হাঙরটারে মারতি পারে খুব কাজ হবে গো। শ্লা মহেশ মান্না ঠাণ্ডা হই যাবে দেখবা। শালো দ্বীপটারে জ্বালাই দিচ্ছে।

ওই একটা লোকের অস্তিত্ব তাদের জীবনে কি চরম বিপদ এনেছে। গদাধর বলে—হাঙর তো ওই শালোই রে। ডাঙার হাঙর।

ঘনশ্যাম অবাক হয়—সত্যি খালাস করলেন তালি স্যার?

সই সাবুদ করে জেল থেকে ওকে নিয়ে বের হয়েছে সুমন্ত তখন বৈকাল হয়ে আসছে। শীতের দিন শেষ হতে সময় নেয় না। গাং-এর বুকে শেষ সূর্যের লাল আলোর তুফান জেগেছে। নদীর ধারে বটগাছে পাখীদের কলরব জাগে। সামনের মাঠ—নদীর ধারের চরভূমি—গাছতলায় লোকজন যাত্রীদের ভিড় জমেছে।

ঘনশ্যাম ক'মাস পর বের হয়েছে জেলখানা থেকে। বাইরের বাতাস—মুক্ত আকাশসীমা আজ নোতুন করে দেখছে সে—এতলোক এখানে পড়ে আছে? শুধোয় ঘনশ্যাম।

সুমন্ত বলে—ছোট নৌকা ডিঙ্গিতে কেউ যেতে পারছে না হাঙরটার ভয়ে। তাই পড়ে আছে এরা। এখানে—কাকদ্বীপে, নামখানায় এমনিই অবস্থায়।

শীত থেকে বাঁচার জন্য আগুন জ্বেলেছে কেউ কেউ। মেয়ে, পুরুষ, বুড়ো বুড়ি, তীর্থযাত্রীর দল যেন উন্মুখ হয়ে আছে কবে পথ পাবে তারা ওপারে যাবার।

সুমন্ত বলে—যদি হাঙরটাকে মারতে না পারা যায় অনেকেই তীর্থে যেতেও পারবে না। সামান্য কটা লঞ্চ, ষ্টীমারে কি হবে? ওদিকে দ্বীপের—এখানের মানুষের রুজি রোজকারই বন্ধ। তাই তোমাকেই ডাকছিলাম ঘনশ্যাম। যদি কিছু করতে পারো খুবই উপকার করা হবে।

সুমন্তকে দেখে অনেকেই এসে ঘিরে ফেলে তাকে। যাত্রীরা চিনেছে তরুণ এস-ডি-ওকে। ওরা বলে—ক্যা হোগা বাবা? তীরথ দর্শন নেহি

হোগা ? রাজস্থানসে আয়া—

কেউ বলে—এ জীবনে তাহলে আর তীর্থস্নান হবে না বাবা। বড় আশা নিয়ে এসেছি জমি বন্ধক দে—

—গঙ্গামায়ী ক্যা করেগা না জানে।

—ওদের আকুতি মিনতি দেখছে ঘনশ্যামও। তার কাছে মনে হয় এ এক কর্তব্যই। ঘনশ্যাম বলে—একটা ব্যবস্থা হবে মায়ি। নিশ্চয়ই হবে।

ওরা আশাভরে চেয়ে আছে ঘনশ্যামের দিকে। এক বুড়ি ভিড় ঠেলে এসে ঘনশ্যামের মাথায় হাত রেখে বলে—মা গঙ্গা, কপিলমুনি তোমাকে আশীর্বাদ করুন বাবা। ছাখো যদি পারো। জরুর পারবে তুমি—

ঘনশ্যাম যেন মনে মনে কি আশ্বাস পায়।

সুমন্ত ওকে বাঁধের নীচে তার বাগান ঘেরা বাংলোয় নিয়ে চলেছে।

ঘনশ্যাম অবাক হয়—এখানে কি হবে? বাংলোটাকে চেনে সে। এর আগেও একবার এখানে এসেছিল তখনকার সাহেবের কাছে মেলার কাজের জন্য আবেদন নিয়ে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। তাকে মাথা নীচু করে ফিরে যেতে হয়েছিল। আজ আবার সেখানে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। সুমন্ত বলে—কি হল? চলুন।

ঘনশ্যাম বলে—একদিন এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রায়। আজ আবার।

হাসছে সুমন্ত। বলে—আমারই বাংলো। আজ তাড়াবার কেউ নেই।

তবু থমকে দাঁড়িয়ে বলে ঘনশ্যাম—এখানে?

সুমন্ত বলে—আজ রাত্রিটা এখানে কাটিয়ে কাল বের হতে হবে। কাল থেকেই লড়াই শুরু।

ঘনশ্যাম ভাবছে কথাটা—বলে সে—লড়াই করবো কি খালি হাতে? লঞ্চটা পড়ে আছে ক'মাস। তার মেরামত—ফিটফাট চাই। অন্যসব জিনিসের দরকার। অনেক কিছু যোগাড় করতি হবে। সে সব না করে—বেরুবো কি? তাই বলছিলাম আজই দ্বীপে চলুন—ওসবগুলো দেখতে হবে।

সুমন্ত অবশ্য এসব ভেবেছে। নিশাকর রতনদের নিয়ে সব ব্যবস্থা করেছে। বাকী যা দরকার কালই হয়ে যাবে। ঘনশ্যামকে সে সব কথা না জানিয়ে বলে —এখন চলুন বাংলোয়। কাল সকাল থেকেই ওসব করা যাবে। রাতে বের হওয়া ঠিক হবে না।

ঘনশ্যামকে নিয়ে বাংলোয় এসে উঠলো। ওপাশের ঘরে ওকে নিয়ে গিয়ে বলে—এখানেই থাকবেন। ওদিকে বাথরুম—সব আছে। হাতমুখ ধুয়ে নিন। চায়ের ব্যবস্থা করতে বলি।

সুমন্ত ওদিকে চলে গেছে। ঘনশ্যাম দেখছে—ঝকঝকে পর্দা—টেবিলের ফুলদানিতে ফুল রয়েছে। বিছানায় হাত দিয়ে অবাক হয়। পুরু ফোমের গদিতে হাত ডুবে যায়। জেলখানায় কাঠের তক্তার উপর কুটকুটে কম্বল জড়িয়ে রাত কাটানোর পর এই আরামে এসে ঘাবড়ে গেছে সে।

ঘনশ্যাম ভাবছে কথাটা। সুমন্তবাবু যেন অন্য ধাতের মানুষ। আগেকার দেখা মানুষগুলোর থেকে স্বতন্ত্র। দেওয়ালে টাঙানো বাঘের মাথা, বাইসনের বিরাট শিং সমেত মাথা দু একটা। বারোশিঙা হরিণের ফ্যাকড়া বেরুনো শিং। সুন্দর একটা আস্ত চিতাবাঘ—সারাঘরের দেওয়ালে কিছু শিকারের ছবি। সুমন্তের অন্য পরিচয়টা পেয়েছে সে।

—কি দেখছেন?

সুমন্ত এর মধ্যেই পোষাক বদলে পায়জামা পাঞ্জাবী পরে চটি পায়ে ফ্রেস হয়ে এসেছে। ঘনশ্যাম বিস্মিত কণ্ঠে শুধোয়—এসব আপনার শিকার করা?

সুমন্ত জানায়—হ্যাঁ। এই বাঘটা আমার জীবনে প্রথম ম্যানিটার শিকার। বাইশ জন মানুষকে খেয়ে তেইশ জন করে ফেলেছিল তার শিকারের সংখ্যা—কিন্তু পারেনি। আমার হাতেই মারা পড়ে। এটা রেওয়ায় মেরেছি, বাইসনটা সরগুজায় ফরেষ্টে—আর কয়েকটা বাঘ মেরেছিলাম।

ঘনশ্যাম দেখছে ওকে।

ছিপছিপে চেহারা। দুচোখের উজ্জ্বল চাহনি শান্ত সুন্দর তারুণটি অরণ্যক অন্ধকারে হিংস্র জানোয়ারের মুখোমুখি হয়েছে, তাদের সঙ্গে লড়াই করেছে। মানুষখেকো বাঘের আতঙ্কে ত্রস্ত মানুষগুলোকে উদ্ধার করেছে সে নিজের জীবন বিপন্ন করে।

সুমন্ত বলে—এবার বুঝেছেন আপনাকে কেন এভাবে জোর করে বের করে এনেছি? এতদিন ডাঙায়—বনে, পাহাড়ে শিকার করেছি ওই শয়তানদের। এবার জলের বুকে একটা শয়তানকে শেষ করার কাজে আপনার কাছে দীক্ষা নিতে চাই।

ঘনশ্যাম বলে—আমি তো তুচ্ছ স্যার। হঠাৎ আমাকে নিয়ে পড়লেন কেন বলতে পারেন?

সুমন্ত ওদিকের র‍্যাক থেকে ফাইলটা বের করে। কাগজের কাটিং—

কয়েকটা পুরোনো ফটো ঘনশ্যামের রয়েছে তাতে হাঙরগুলো সমেত। সুমন্ত বলে—এসব খবর আগে নিয়েই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।

অবাক হয় ঘনশ্যাম। হঠাৎ বেয়ারার সঙ্গে সুধাময়ীকে ঢুকতে দেখে চাইল।

বেয়ারা খাবারগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখে। সুমন্ত বলে—আমার মা। মা এই সেই ঘনশ্যাম। যার কথা এত শুনেছো।

ঘনশ্যাম মাকে প্রণাম করে পায়ে হাত দিয়ে।

ওই স্পর্শে চমকে ওঠে সুধাময়ী। বিচিত্র শিহরণ জাগে সারা মনে। দেখছে সে ঘনশ্যামকে। চোখের মণিগুলো একটু কটা—টিকলো নাক, মুখে কমনীয় ভাবটি তার নজর এড়ায় না। সুধাময়ী দেখছে—হঠাৎ যেন কানে আসে তার অস্ফুট একটি ডাক্—মা। ছোট দুটো হাতের নিবিড় স্পর্শ আজও হঠাৎ আনমনা করে তোলে তাকে। আকাশ বাতাসে ঝড়ে গর্জনে মিশেছে মত্ত সমুদ্রের কল্লোচ্ছ্বাস। নৌকাটা দুলছে—ঢেউ-এর ঝাপটা এসে গায়ে লাগে।

—মা!

চমকে ওঠে সুধাময়ী। সুমন্ত ডাকছে তাকে। সেও দেখছে মাকে হঠাৎ কেমন বিভ্রান্ত হয়ে যেতে। সুধাময়ী সেই উত্তেজনা চেপে সহজ হবার চেষ্টা করে বলে—বসো বাবা!

ঘনশ্যাম বসলো। সুমন্ত বলে—এবার হাঙরটাকে শায়েস্তা করা যাবে মা!

মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শুনেছে সে হাঙরটার হিংস্রতার কথা। বার বার মানুষ মেরেছে। কত নৌকা ডুবিয়ে বিপদ এনেছে। এবার ওরা যাবে সেই হাঙরটাকে মারার চেষ্টা করতে। সুধাময়ী বলে ওঠে—চিরকালই কি বিপদের মুখে যাবি বাছা।

হাসে সুমন্ত—মা। ঘনশ্যামবাবু পরের ছেলে, তাই ওর জন্য তোমার ভাবনা নেই। যত ভাবনা আমার জন্যেই।

চমকে ওঠে সুধাময়ী—না রে। তোদের দুজনকেই বলছি বাবা। মায়ের কাছে সব ছেলেই সমান রে। তাই ঘনশ্যামও আমার পর নয় রে, ছেলেই।

ঘনশ্যাম চাইল ওর দিকে। বলে সে—মা আমার নেই তাকেও হারিয়েছি। আজ আপনাকেই মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে।

সুধাময়ী চাইল ওর দিকে। ওই চাহনি—কণ্ঠস্বর—ওর যেন অনেক চেনা। বার বার অতীতের সেই আবছা ছবিটা স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুধাময়ী বলে—বেশ তো।

সুমন্ত বলে—মা আপনাদের ওখানেও গেছলেন। কমলাকে সাহস দিয়ে রাজী করিয়েছিলেন আপনার কাছে যেতে। আমার মা খুবই নিবারেল। মাও চান—এত মানুষের দুঃখ বিপদ দূর হোক।

ঘনশ্যাম দেখছে সুধাময়ীকে। মায়ের জাত চিরকালই বিপদে বুক পেতে দেয় সন্তানের জন্য, উৎসাহ দেয় তাদের এগিয়ে যেতে। তাই ঘনশ্যাম আজ কি আশায় পায়। বলে সে। সেই চেষ্টাই করবো মা। আশীর্বাদ করুন যেন সফল হই।

সুধাময়ী হাসেন মিষ্টি স্নিগ্ধ হাসি। বলেন—খাও বাবা। খাবার জুড়িয়ে গেল।

সকাল বেলাতেই ওরা বের হবে। সুধাময়ী চা ব্রেকফাষ্ট তৈরী করিয়েছে। আজ তারও মনটা ভালো নেই। কি অজানা বিপদের মুখে চলেছে সুমন্ত। অতীতে একজন গেছে ওই গাং-এ।

সুমন্ত বলে—এত ঘাবড়াচ্ছো কেন মা।

ছলছল চোখে সুধাময়ী চেয়ে থাকে ছেলের দিকে। বলে সে—না বাবা। শুধু ভয় হয় কি জানিস ওই গাং-এ এই পৌষসংক্রান্তির পরই হারিয়ে গেছে একজন অনেক আগে। আমার বুক থেকে সে চলে গেল আজ আবার তুইও ওই গাং-এ যাচ্ছিস বাছা।

ঘনশ্যাম কথাটা শুনে অবাক হয়—আপনার এক ছেলে—

ঘটনাটা জানায় সুধাময়ী। দীর্ঘ তিরিশ বছর আগেকার ঘটনা। ছোট্ট শিশুকে নিয়ে তীর্থস্নানে এসে ঝড়ের মুখে পড়ার কাহিনী—কোনমতে বেঁচেছিলাম—কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারিনি। সে হারিয়ে গেল এই সর্বনাশা গাং-এ। দুচোখ জলে ভরে আসে সুধাময়ীর।

ঘনশ্যাম অবাক হয়ে শোনে। আজ আশ্বাস দেয় সে—আপনি ভাববেন না মা, এ-গাং আমাকে ও চেনে। সুমন্তের জন্য কোন ভাবনা করবেন না। আশীর্বাদ করুন যেন ওই শয়তানকে শেষ করে আসতে পারি।

—সাবধানে থেকো বাছা। সুধাময়ী অশ্রুভরা কণ্ঠে আশীর্বাদ করেন।

পটলা মটরা বেশ কিছুদিন মনমরা হয়েছিল। লঞ্চটা ধোয়া মোছা করে ব্যাটারি লাগিয়ে চালু করে ইঞ্জিনটা। ওই মাত্রই। তাদের ম্যাষ্টার নাই—কে নিয়ে যাবে তাদের।

কদিন থেকে নিশাকর, রতন, যতীনদের দল আবার জেগে উঠেছে। নিশাকরও তৈরী হচ্ছে। হাঙরটাকে দেখেছে সে কয়েকবারে, তাই তার আয়োজনও এবার বেশী। সুমন্তবাবুই টাকা দিয়েছে। সবকিছু ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

ঘনশ্যাম সুমন্ত আসছে নদীর দিকে।

নদীর ঝড়ো হাওয়া লাগে ঘনশ্যামের সারা দেহে—চেনা জগতের ডাক শোনো সে কান পেতে। ঘনশ্যাম অবাক হয়। খুশিতে ঝলমল করে ওঠে। ওদিকের গাং-এ তার লঞ্চটা রয়েছে—ওটাকে আনা হয়েছে। সাদা নোতুন রং আলোয় ঝকমক করে। লাল বর্ডারগুলো যেন জ্বলছে।

বিকট শব্দে লঞ্চের হর্নটা বাজাচ্ছে মটরা—

নিশাকর, রতনও এগিয়ে আসে, হাতে মা গঙ্গার প্রসাদী মালা—প্রসাদী সিন্দুর। নিশাকর পরিয়ে দেয় ওদের।

যতনা কোত্থেকে টলতে টলতে ধড়াস্ করে ঘনশ্যামের পায়ে পড়েছে। বলে সে জড়িত কণ্ঠে—খুশির চোটে শালা পেঁদিয়ে দিলাম দুঢোক 'মাষ্টার'—আজ কিন্তু বকবে না মাইরি! পটলা—মাষ্টার এসতেছে—পটলার ওঠার সাধ্য নেই! দুটো হাত এক করে পেন্নাম করার চেষ্টা করেও পারে না। মুখময় সিন্দুরের গাঢ় রং—গলায় মালা, পটলা ভেড়ির উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে।

—গড় করি মাষ্টার। জয় মা গঙ্গা—জয় বাবা কপিলমুনি জয়—ঘনশ্যাম মাষ্টারকি—

—চোপ! গর্জে ওঠে ঘনশ্যাম—পাছায় লাথি মেরে শ্লাদের গাং-এ ফেলে দেব। এই করেছিস ক'দিন ধরে।

থেমে যায় ওরা।

যতীন বলে—মাইরী সব রেডি—একটুন খেলাম। মা গঙ্গার দিব্যি—শ্লা হাঙর না মারা অবধি এ দ্রব্য মুখে তোলে কোন শ্লা। এবারের মত মাপ করে দাও মাষ্টার।

টনটনে জ্ঞান আছে পটলার। বলে সে সুমন্তকে—অপরাধ নেবেন না হুজুর। খুব অলায্য কাজ হই গেছে। মাইরি।

সব আয়োজন রেডি।

ঘনশ্যাম দেখছে, বিরাম ড্রাম-এ ঝকঝকে ষ্টিল রোপ জড়ানো—বিশাল

আকারের বটা বড়শীও বানানো হয়েছে, যেন নৌকার নোঙর এক একটা। তারের মেস নেট—ওদিকে লকের দু' মাথায় দুটো বড় সাইজের লোহার পেঁটে কামান মত বসিয়েছে নিশাকর। ড্রাম ভর্তি সয়েস বারুদ, শিশের গোলা—জালের কাঠি রাখা আছে। বারুদের সঙ্গে ওগুলো ছোট কামানের মত গেঁটেতে গাদা হবে, রঞ্জ ঘরে আগুন দিলে ওই শিসের বল—জালের কাঠি সবেগে গোলার টুকরোর মত বের হবে। মানুষ সামনে পড়লে ছাতু করে দেবে ওই গোলার বিস্ফোরণ।

ঘনশ্যামও জানে এগুলোর দরকার হতে পারে। ঘনশ্যামও আনিয়ে নেয় মজবুত কিছু টিলরোপ, কাঁটাওয়ালা তার সর্বাঙ্গ, নাইনলের দিস্তর কাছি। আর কলকাতার স্টার হাউস থেকে আনানো হয়েছে কয়েকটা পিপে বোঝাই মাংস —নাড়িভুঁড়—এইসব। ঘনশ্যাম সব নিজে দেখে নিচ্ছে ওদিকে।

সুমন্ত তোলাচ্ছে খাবার দাবার, নোতুন ট্যাঙ্কে পাম্প করে আনা হচ্ছে খাবার জল। আর সুমন্ত নিয়েছে তার দুটো হেভি রাইফেল, বহুদিনের সঙ্গী। এই রাইফেল-এর দু' ইঞ্চি বুলেট দিয়ে কয়েকটা বিরাট হাতি, বাঘ-বাইসন মেরেছে সে।

ঘনশ্যাম বলে—এসব কি হবে।

সুমন্ত বলে—অস্ত্র রাখতে দোষ কি? কাজে লাগবে। শটগানও নিয়েছি। খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে কাকদ্বীপেও—বহু মানুষ এসেছে। ভিড় করেছে ব্যাকুল তীর্থ যাত্রীর দল। ওরাও সকলে চায় এই অভিযান সফল হোক। সুধাময়ীও এসেছে নদীর ধারে ওদের বিদায় জানাতে।

জয়ধ্বনি ওঠে—গঙ্গা মায়ি কি জয়। জয় বাবা কপিল মুনি।

ঘনশ্যাম দেখছে সুধাময়ীকে। একদিনের দেখা তাতেই মনে হয় কত দিনের চেনা, কত আপন, হাত নাড়ছে সে। বহুদিন পর ঘনশ্যাম তার হারানো জগৎ—সেই অসীম গাং-আপনজনদের ফিরে পেয়েছে। এই মুক্তিকে চাইতো সারা মন দিয়ে, ওরা তাকে মিথ্যা অপবাদে আটকে রেখেছিল।

আজ সে প্রমাণ করবে ঘনশ্যাম নিজের যোগ্যতা দিয়েই বাঁচতে পারে, ওই অপবাদের এতটুকু কালিমা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। ওসব মিথ্যা। আবার সব ফিরে পেতে হবে তাকে।

হাঁক পাড়ে ঘনশ্যাম—গেরাপি তোল পটলা। ইঞ্জিনের ঘন্টি বেজে ওঠে। স্তব্ধতা ভেদ করে নোতুন মেরিন ইঞ্জিনটা গর্জে ওঠে। ঘনশ্যাম ওই আওয়াজ চেনে—ওটা তার এত কালের সঙ্গী। হাসে ঘনশ্যাম—সাবাশ বেটা।

ষ্টিয়ারিং ধরেছে সে নিজে, লঞ্চটা তীর থেকে ভিতরে এনে বৃত্তাকারে পাক দিয়ে এবার ভিতরের গাং দিয়ে চলেছে, সহজ স্বাভাবিক ছন্দে ঢেউগুলোকে টপকে—এগিয়ে চলেছে লঞ্চটা, পিছনে সফেন জলরাশির বুকে ঢেউগুলো দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে।

ঘনশ্যাম বহুদিন পর ফিরছে তার হারানো জগতে। সুমন্ত দেখছে নোতুন এক ঘনশ্যামকে। ঘনশ্যাম চীৎকার করে—সর্দার নজর রাখবে গাং-এর দিকে। ব্যাটা ঘুরছে—মনে রেখো। হুঁসিয়ার।

মহেশ মান্না পারঘাটের গদিঘরে বসে আছে। নরহরি ভটচার্য এসেছে পুজো করতে, নটবর মাষ্টার ক'দিনেই বুঝেছে হাওয়া অন্যদিকে বইছে। সাবধানী, চতুর সে। তাছাড়া বিয়েটা হবে এই আশা করেছিল। কিন্তু কমলার সঙ্গে বিয়ে তার হয়নি। আর হবার সম্ভাবনাও নেই। কারণ মহেশ মান্নাই বসন্ত পণ্ডিতকে তার মূল্যবান চাকরী থেকে বরখাস্ত করেছে।

নটবর তবু আশা ছাড়েনি। নিদেন পক্ষে অঞ্চলের সভ্য হতে পারলে এবার অঞ্চল প্রধান সে হবেই। মহেশ মান্না তখন থাকুক না থাকুক (অবশ্য না থাকলেই ভালো) নটবর ঠিক এই দ্বীপের মধ্যে মাথা তুলবে। হঠাৎ খবরটা আসে ওপারের কিছু যাত্রীর মুখে।

মহেশ মান্না চমকে ওঠে—সেকি ? খুনী, রেপ কেসের আসামী জেল থেকে ছাড়া পাবে এমনিই ? দেশে কি আইন কানুন নাই হে ?

নরহরি শালগ্রামকে নামিয়ে রেখে যুত করে বিড়ি টানতে টানতে বলে—না, না। এ হতে পারেনা মান্নাবাবু।

নটবর ইদানীং সহরে গেছলো। শুনেছে সে কথাটা। বলে—হতেও পারে মান্নাবাবু। সরকারের দরকারে, জনসাধারণের দরকারে তেমন কাউকে ওরা সাময়িকভাবে পাহারায় রেখে খালাস করতে পারে। 'প্যারোল' বলে একে। শুনছিলাম ঘনশ্যামকে ওইভাবে খালাস করে আনতে চেষ্টা করছে এস-ডি-ও সাহেব নিজে। হাঙরটাকে মারার চেষ্টা করবে।

নরহরি ফুঁসে ওঠে—এ ঘনার কম্মো নয়, মান্নাবাবুর সাগর জাল, ট্রলারের বিলিতি জাল সব কেটে গেল, কত লোককে মারলো। ওকে মারবে ঘনশ্যাম ? সেই না শেষ হয়।

মহেশ মান্না বুঝেছে ঘনশ্যাম খালাস পেলে তার আপীলের মামলা ঘুরে যাবে। বসন্তকে চটিয়েছে সে। আরও লক্ষ্য করেছে এখানে পুলিশ ফাঁড়ি

বসে গেছে—ওই বসন্তের বাড়ির কাছাকাছিই। ওখানের অফিসারকেও ঠিক কায়দায় আনতে পারেনি সে।

গজেন এসে খবরটা জানায়—জেলেপাড়ায় নিশা সর্দার রতনদেরও দেখছি না, ঘনশ্যামের লঞ্চটাও নাই বেশ কদিন। এতদিন ওটা ওদিকে খাড়িতে তোলা ছিল। ভেবেছিল মহেশ—ওটা বিক্রী হয়ে গেছে বোধ হয়। মহেশ একটু ভাবনায় পড়ে। বলে সে—কাগজে লিখবো, আইন কানুন নাই? খুনীকে খালাস করবে। নটবর, বেশ জোরালো করে একখানা প্রতিবাদ পত্তর লেখো, পাঠিয়ে দেবো। তারপর দেখছি ওই ব্যাটা এস-ডি-ও কে। ওকে হঠাবোই—

নীলজলের বিস্তারে গুরু গুরু শব্দ ওঠে। রাজহাঁসের মত ভেসে আসছে বড় বড় লঞ্চটা ঢেউ টপ্‌কে। ওদের চেনা লঞ্চ। আজ ওটাকে চেনা যায় না। ঝক-ঝক করছে, বিকট শব্দে হুঙ্কার ছাড়ছে ওর হর্ণ টা, সারা সাগরদ্বীপকে যেন জানাচ্ছে ওর আগমন বার্তা।

নদীর ধারে বের হয়ে এসেছে কমলা, জেলেপাড়ার কদম ওই শব্দ-লঞ্চটাকে চেনে। চীৎকার করে সে—ঘনাবাবু এসতিছে গো—ছোটবাবু।

জেলেপাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা, নৌকোর বাওয়ালিরাও বের হয়েছে। ওরা আসছে ঘাটের দিকে। গঞ্জের ব্যাপারী—সাধারণ মানুষের দলও যেন ওর পথ চেয়েছিল। কলরব, কোলাহল করে তারা ছুটে আসে। পারঘাটের জেটি—আশপাশ ভর্তি হয়ে গেছে। চীৎকার করছে ওরা।

হাসিমুখে চেয়ে থাকে কমলা দূরের ঝাউবন থেকে। ওই ভিড়ে সে আসেনি। বাসিনীও এসেছে। মেয়েকে দেখে চাইল সে। আজ বাসিনীও খুশি হয়েছে।

বসন্ত পণ্ডিত চুপচাপ চেয়ে আছে ওই দিকে। আজ মহেশ মান্নাও তাকে সরিয়ে দিয়েছে, এখন মাথায় তার একমাত্র চিন্তা। কি করে বেঁচে থাকবে সে। তবু বিঘে দশেক ধানি জমি করেছে—সেইটুকু একমাত্র ভরসা। তবু ভয় হয়—মহেশ মান্না ভুবন মাইতির মত লোকের সর্বনাশ করেছে। তাকেও শেষ করতে বাধবে না তার।

চুপ করে চেয়ে থাকে। ঘনশ্যাম যদি ফিরে আসে তখন কি হবে জানে না। হয়তো তার দিন বদলাতে পারে।

মহেশ মান্না দেখছে ওই উৎফুল্ল মানুষগুলোকে। ঘনশ্যামের জন্য ওদের

মনের অতলে এত দরদ—এত ভালোবাসা ছিল ভাবেনি মহেশ। ভেবেছিল ঘনাকে মুছে ফেলে সেইই এখানের সর্বেসর্বা হবে। কিন্তু আজ ওই মানুষের ভিড় দেখে অবাক হয়েছে মহেশ। মনে মনে রেগে উঠেছে নিষ্ফল আতঙ্ক নিয়ে। বুঝেছে ঘনশ্যামকে মুছে ফেলা যাবে না। বলে সে—গজেন ভিড় হঠা।

গজেন গর্জন করে—এ্যাই। হঠো-হঠো জেটির কাছ থেকে। কে কার কথা শোনে। চীৎকার করছে ওরা।

ঘনশ্যাম লঞ্চটা জেটির ওপাশে নোঙর করে লাফ দিয়ে নেমেছে, সামনেই মহেশ মামা, সেও বের হয়ে এসেছে। একেবারে ঘনশ্যামের সামনে পড়বে ভাবেনি। ঘনশ্যাম ওকে দেখে এগিয়ে আসে—আরে মামা মশাই যে। সব কুশল তো?

মহেশ মামা দেখছে ঘনশ্যামকে। ক'মাস জেলখানায় থেকে আরও বলিষ্ঠ সুন্দর হয়েছে। দাড়িগুলো ওর পৌরুষকে দৃপ্ত করেছে। ঘনশ্যাম বলে—

—কি ব্যাপার? আবার কোন কেসে জড়িয়ে মেয়াদে পাঠাবেন তাই ভাবছেন? মাইরী ওসব করবেন না। ঘনশ্যাম এখন গুড বয় হয়ে গেছে। স্রেফ গাং-এর হাঙরটাকে মেরেই আবার ওই জেলের মধ্যে ফিরে যাবে। ওই এস-ডি-ও সাহেবই সাক্ষী।

হঠাৎ খেয়াল হয় তার সুমন্তের কথা। বলে ঘনশ্যাম—আরে স্যার, আপনি লঞ্চেই থাকবেন নাকি এদিকে আসামী যদি কেটে পড়ে। এ্যাঁ—চলুন স্যার। গরীবের বাড়ীতে যা হয় ডাল ভাত মুখে দিয়ে পরে প্লান করা যাবে।

মহেশ রাগটাকে সামলে নেয় কোন মতে। সামনে এস-ডি-ও কে দেখে এগিয়ে আসে। বলে সে সহজভাবে—তোমার ওখানে ওঁর অসুবিধা হবে ঘনশ্যাম, আমার বাংলোতেই যাবেন উনি।

সুমন্ত বলে—না, না। ঘনশ্যামবাবুর ওখানেই থাকতে হবে, জরুরী আলোচনা আছে।

হতাশ হয় মহেশ। তবু নিপুণ অভিনেতার মত দরদী কণ্ঠে বলে সে—সত্যি ঘনশ্যাম এসেছে দেখে খুব খুশি হয়েছি স্যার। যোগ্য লোককেই এনেছেন। ঘনশ্যাম পারবে।

ঘনশ্যাম দেখছে মহেশকে। অবাক হয়েছে সে।

মহেশ বলে—দরকার হলে আমাকেও বলবেন স্যার, সাধ্যমত আমিও সাহায্য করবো। যেভাবে হোক ওই হাঙরটাকে শেষ করতেই হবে। পারবে স্যার—ঘনশ্যাম পারবে।

হেসে ফেলে ঘনশ্যাম, বলে সে—কিন্তু হাঙর এখন জলে নয় ডাঙাতেও অনেক বেড়ে গেছে মহেশবাবু, একা ক'টাকে সামলাবো? এ্যাঁ—

মহেশ গুম হয়ে যায়। রাগে থম থম করছে ওর মুখটা।

ঘনশ্যাম বলে—চলুন অঘোর কাকা। চলুন সুমন্তবাবু—লোকদের উদ্দেশ্যে বলে সে—এখন যাও তোমরা। পরে কথা হবে। সর্দার দেরী করো না। আজ রাতের গোনেই বের হবো।

নিশাকর সায় দেয়—তাই হবে। পাড়ায় গে একটু জিরিয়ে নি গে।

সামনে দীর্ঘ সংগ্রামের প্রস্তুতি, বিপজ্জনক শত্রু। আর এটা ঘনশ্যামের কাছে যেন চ্যালেঞ্জ এনেছে। এ তার পণ—মারতেই হবে ওটাকে।

কমলা এসেছে, এখন এবাড়িতে কমলা আসে। গিরিবালা বলে—বাড়িতে সাহেবসুবো আসছে, আমার রান্না তো চলবেনা বাছা, তুই সামলে নে।

কমলা তাই রয়ে গেছে রান্নাঘরে।

ঘনশ্যাম ওকে দেখে অবাক হয়—তুই এখানে?

কমলা চাইল ওর দিকে। আজ তার দুচোখে হাসির আভা ফুটে ওঠে। বলে সে— কেন? আসতে নেই? পিসীকে একটু সাহায্য করছি।

ঘনশ্যাম বলে—আমি খুঁজছি ওকে এদিক ওদিকে, আর এখানে উনি পিসীমায়ের দোসর হয়ে বসে আছেন ধোঁয়ার রাজ্যে। আমি আর কে—আমার জন্য ভাববে কোন জন?

কমলা হাসছে। খুশি হয় সে। কথাটা বলে কমলা—এ্যাই। আজ সন্ধ্যায় পূজো দেব মন্দিরে, তুমিও যাবে।

ঘনশ্যাম চাইল ওর দিকে। বাইরে কে ডাকছে।

কমলা বলে—ওরা ডাকছে। যাও—

—শোনো।

ঘনশ্যাম কি বলতে চেয়েছিল, কিন্তু সময় হয় না। কমলা বলে—মাংস চাপিয়ে এসেছি এখন নয়। পরে কথা হবে। যাও।

সুমন্ত দেখছে ওদের। ঘনশ্যাম চাইতে সুমন্ত বলে—ডিসটার্ব করলাম নাকি?

কমলা চলে গেছে। ঘনশ্যাম বলে—ডিসটার্ব তো প্রথম দিন থেকেই

করছেন। চলুন। জেলের কয়েদীর মত নজরে রাখছেন বুঝি? যদি কেটে পড়ি।

সুমন্ত বলে—কেটে পড়তে পারবেন না। অনেক শক্ত বাঁধন রয়েছে না বুঝেছি।

কমলা সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করেছে সে। ঘনশ্যাম বলে—এদিকে আপনি ওদিকে কমলা, সত্যি জেলখানার অধম করে তুলেছেন স্যার বাড়িটাকে। এখানে গরীবের মাটির ঘরে কেন স্যার—চলুন মান্নাবাবুর পাকা বাগান বাংলোয় আরামে থাকবেন।

সুমন্ত বলে—পরে ভাবা যাবে। এখন অন্যকথা ভাবা যাক। সুমন্ত সঙ্গে করে বিরাট ম্যাপটা এনেছে। নিশাকর সর্দার দেখছে মেজেতে মেলা ম্যাপটা, এসব গাং খাড়ি—তাদের নখদর্পণে। তবে ছবিতে এসব দেখেনি। আর হাঙরটার প্রতিটি আক্রমণের জায়গাগুলো লাল পেন্সিলে মার্কা দেওয়া আছে ওতে।

ঘনশ্যাম দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা জিনিস বুঝতে পারে—সর্দার। ব্যাটা জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে খাড়িগুলোর মধ্যেকার গভীর জায়গাতেই থাকছে। আশপাশে চোট করে আবার সেই গভীর জলের পথেই ফিরে আসছে। ক'দিন ধরে তাকে দেখা যাচ্ছে কুলতলি, মৃদঙ্গভাঙ্গা, মনসার চর আর সাগর দ্বীপের এখানেই, দেখছ?

নিশাকর সর্দার গাং-এর মানুষ। সে বলে—বড় জানোয়ার—কম জলে থাকতে চায় না। আসে প্যাটের জ্বালায়, আর এলাকাটা চিনে রাখো ছোট বাবু, এই সীমানাতেই তাকে পাওয়া যাতি পারে। জোয়ারের গোনেই কেবল চোট করতিছে।

কতকগুলো অজানা ব্যাপার, হাঙরটার চরিত্র—গতিবিধির একটা হিসাব পায় তারা। মনে হয় এতে তাকে পাবার—আর লড়াই করার সুবিধা হবে।

সন্ধ্যা নামছে। তখনও গাং-এর আতঙ্ক সংযত করে রেখেছে যাত্রীদের। আর চারদিন পরই মকর সংক্রান্তি। তবু বালিচরে কর্মব্যস্ততা চলেছে। ওদিকে দু দশজন সাধু কোন রকমে এসে ডেরা জমিয়েছে। ধুনির আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে অন্ধকারে। সমুদ্রের গর্জন ওঠে।

অযোধ্যাপ্রসাদ শুনছে কথাটা। এতদিন তার কাছে প্রশ্ন হয়েছিল, ধর্ম আছে কি নেই। নাহলে এতবড় অন্যায়ের কোন প্রতিকার হয়নি কেন? আজ হঠাৎ খবরটা শুনে তাই খুশি হয়েছে অযোধ্যাপ্রসাদ। আরও খুশি

হয়েছে ঘনশ্যাম আর কমলাকে মন্দিরে আসতে দেখে। ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং। আরতির শিখা তখনও নেভেনি। অযোধ্যাপ্রসাদ বলে—এসো ঘনশ্যাম, কমলা মায়ি—

প্রণাম করে দেবতাকে। বলে ঘনশ্যাম—এলাম পণ্ডিতজী, সামনে বিরাট একটা কাজ। আশীর্বাদ করুন যেন এত মানুষের শত্রু ওই জানোয়ারটাকে মারতে পারি।

অযোধ্যাপ্রসাদ দেখছে ওকে।

কমলাও প্রণাম করে বসেছে। অযোধ্যাপ্রসাদও জানে লক্ষ লক্ষ মানুষ আটকে থাকবে। সারা দ্বীপের—আশপাশের বহু মানুষের রুজি রোজকার বন্ধ। বলে সে—সকলের প্রার্থনা তোমাকে শক্তি দেবে ঘনশ্যাম। শুভকাজে মানুষকে দেবতাও শক্তি দেয়। একাজ তুমিই পারবে বাবা।

কমলা ভীত ত্রস্ত চোখে চেয়ে থাকে। আজ তার জীবনে একটি পরম আনন্দের দিন। ঘনশ্যাম তাকে ভুল বোঝেনি—সে বাইরে এসেছে। আবার দুজনে ফিরে পেয়েছে দুজনকে। কিন্তু সামনে এক বিরাট শত্রু, সেই সর্বনাশা শত্রুর মুখে যেতে হবে ঘনশ্যামকে। কমলা ভীত স্বরে বলে—কি হবে বাবা?

হাসে অযোধ্যাপ্রসাদ—ডরো মৎ বেটি। সব ঠিক হো যায়েগা। ভগীরথ গঙ্গা আনলো বহুৎ দুঃখসে, সগর রাজার ষাটহাজার সন্তান উদ্ধার হলো। ঘনশ্যাম ভি এ আতঙ্ক—বিপদের অন্ধকারে তীর্থের পথ সাফ্ করে নোতুন রোশনী আনবে, দেওতার মাহাত্ম্য বজায় রাখবে। মা গঙ্গা, কপিলজীর আশীর্বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে মায়ি।

ঘনশ্যাম ওই দেবতার কাছে আজ সারা মন দিয়ে সেই আশীর্বাদই প্রার্থনা করে।

রাত্রি নামছে দ্বীপে। পারঘাটায় বাঁশের মাথায় বাতিটা টাঙানো, মিট মিট করে নিশানা রাখছে—গঞ্জের মানুষজন শীতের রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। লঞ্চটা ছাড়লো ঘনশ্যাম। তীরে দাঁড়িয়ে আছে অঘোর সরকার, গিরিবালা, কমলা আর জেলেপাড়ার কিছু মানুষ, বৃদ্ধ মুরারী ঘোষ আরও অনেকে।

রাতের গাং-এ লঞ্চটা ভেসে চলেছে—মাষ্টার ল্যাম্পটা জ্বলছে লঞ্চের মাথায় লালচে আলোর আভা নিয়ে। ওরা চলেছে কুলতালির গাং-এর দিকে, দ্বীপের উত্তর সীমান্ত বরাবর।

জেগে আছে মহেশ মান্না। তার দোতলা থেকে দেখা যায়, গাং-এ ভেসে গেল লঞ্চটা ঘনশ্যাম সুমন্তবাবুদের নিয়ে। মহেশ মান্নাও ভাবছে কথাটা।

ওকেও তৈরী হতে হবে। যে ভাবে হোক ঘনশ্যামকে ঠেকাবে সে। এই মামলাও ভেঙ্গে দেবে।

রাতে ঘুম আসেনি সুধাময়ীর। বারবার মনে পড়ে সুমন্তের কথা। অকূল গাং-এ ভেসে গেছে সুমন্তও। কোন দুর্বার শয়তান এসে হানা দিয়েছে। সীমাহীন গাং—কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সে। ওই রাক্ষসী গাং-কে সে এতটুকু বিশ্বাস করে না। একদিন অতীতে ওই রাক্ষসী তার সব কিছু লুট করে নিয়েছিল বুক খালি করে।

হঠাৎ যেন ঝড় উঠেছে—দিশাহারা হয়ে গেছে লঞ্চটা, ঢেউ এর ঝাপটায় জল উঠছে। চীৎকার করছে সুমন্ত, ঘনশ্যামকেও মনে পড়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় সুধাময়ীর। ঝড় নেই—শীতের নিথর রাত্রি। কি যেন স্বপ্ন দেখছিল সে। এখন সুমন্ত কোথায় জানে না। মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

সকালেই তাই সুধাময়ী খবর পাঠিয়েছে হেড সারেংকে।

এস-ডি-ওর নিজস্ব লঞ্চের হেডসারেং চেনে সুধাময়ীকে। তাই এসেছে।

সুধাময়ী বলে—একবার সাগরদ্বীপে ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে কাসেম বাবা।

কাসেম বলে—ওনাদের কি পাবেন সিখানে? কোথায় গেছেন—

সুধাময়ী জানায়—তবু যেতে হবে বাবা। ওদের খবরটা ওখানে গেলে তবু পাবো। আমার মন কেমন করছে।

কাসেম বলে—তালি চলেন। তবে সাহেব ঘনাবাবুর লঞ্চে আছেন মা। এ এলাকার সেরা সারেং উনি!

গিরিবালার মন ভালো নেই। মাঝরাতে ওদের বিদেয় দিয়ে এসে ঘুমোতে পারেনি। বারবার সেই হাঙ্গরটার কথা মনে পড়ে। রাক্ষুসে একটা জীব, শয়তান সে। সেই শয়তানের মুখে যেন তুলে দিল ছেলেটাকে। চোখের জল নামে গিরিবালার।

অঘোর সরকারও চুপচাপ আছে। সকাল হয়েছে—সকালের সোনালী রোদ অভ্র রং ধরেছে। ওদের কোন খবর নেই।

অঘোর বলে—এত কি ভাবছো দিদি। ঘনশ্যাম ঠিক ফিরে আসবে দেখো। মা গঙ্গার আশীর্বাদ আছে ওর উপর গো।

গিরিবালা কান্নাভেজা স্বরে বলে—তাই ভয় হয় দাদা, এতকাল ধরে নিজেদের ছেলের মতই মানুষ করেছি ওকে। দাদা সেদিন মা গঙ্গার বুক

থেকে তুলে নে এল কার এইটুকু ফুলের মত বাচ্চাকে, বুকে করে নিলাম। এতকাল পরে আবার কি তাকে মা গঙ্গা কেড়ে নেবে দাদা? না হলে কেন —কেন গেল জেল থেকে এমনি করি ফিরি এসে। আমরা কি ওকে মানুষ করিনি।

হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে চাইল গিরিবালা। বাইরের লোকের সামনে এ কথাটা কোনদিন প্রকাশ করেনি তারা। আজ হঠাৎ কে যেন জেনে ফেলেছে।

—আপনি আসুন মা।

সুধাময়ী এসেছিল, লঞ্চ থেকে নেমে ভেড়ি ধরে এদের বাড়িতে পা দিয়েই বাইরের উঠান থেকে কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ তার কানে গেছে ঘনশ্যামের জন্ম ইতিহাস। এদের নিজের ছেলে সে নয়—তাকে গঙ্গার বুক থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল ভুবন মাইতি, আর মানুষ করেছে এরা। তাহলে— সুধাময়ীর সারা মনে ঝড় ওঠে। কানে আসে সেই আর্ত চীৎকার—মা! আজও অচেনা কণ্ঠস্বর তাকে উদ্বেল করে তোলে। সুধাময়ী এগিয়ে আসে। শুধোয় সে—ঘনশ্যামকে তাহলে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন আজ থেকে সাতাশ বছর আগে—পৌষসংক্রান্তির সেবারের ঝড়ের পর?

চাইল গিরিবালা। অঘোর সরকারও ভাবছে কথাটা। মনে হয় সেদিনের কথা। তখনও গঞ্জের এত বসত হয়নি। তাদেরও বাড়িটা সবে উঠছে। নৌকা কাঠ নিয়ে ফিরছিল মাইতি কত্তা—সেদিন সকালে ওকে নিয়ে আসে বুকে করে। পরণে সোয়েটার, রঙীন প্যান্ট—সব ভিজে বসে গেছে বাচ্চাটার গায়ে!

সুধাময়ী ব্যাকুল কণ্ঠে শুধোয়—জবাব দিন। পৌষসংক্রান্তির পর দিন ওকে পেয়েছিলেন? আজ মনে করতে পারে সুধাময়ী নিজের হাতে বোনা হলুদ লাল বরফি তোলা সোয়েটার পরিয়েছিল ওকে, ওর নাম তুলেছিল উল দিয়ে হেমন্ত।

গিরিবালা দেখছে সুধাময়ীকে।

—মা। সুধাময়ী দুঃসহ কান্নায় ভেঙে পড়ে—বলুন। গায়ে হলুদ লাল বরফি সোয়েটার, উল দিয়ে ইংরাজীতে ওর নাম লেখাছিল। ওর নাম রেখে-ছিলাম হেমন্ত।

সরকার বলে—ঠিক মনে করতে পারছি না মা। বালি কাদায় রং তখন বোঝার উপায় ছিল না।

গিরিবালা বলে—সেগুলো পরিষ্কার করে তুলে রেখেছি—

—আছে।

গিরিবালা ঘরের মধ্যে তোরঙ্গ খুলে বের করে আনে সেই সোয়েটার আর উলের বোনা প্যান্টটা। সুধাময়ী স্তব্ধ হয়ে দেখছে হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে—এই আমার হেমন্ত। হেমন্ত বেঁচে আছে দিদি। আমার হেমন্ত—

গিরিবালা অবাক হয়।

সুধাময়ীর খেয়াল হয় আজ তার বিপদের কথা। একজনকে হারিয়ে আজ তার সন্ধান পেয়েছে কিন্তু সে আজ কাছে নেই। তার এছেলেই নয়—দুজনই গেছে সেই গাং-এ কোন শয়তানের সামনে। সুধাময়ী বলে—তাই বলছিলাম দিদি—গাং-কে ভয় করে। একদিন সে আমার সব ছিনিয়ে নিয়েছিল। আজও তারা দুজনেই আবার গেছে সেইখানে। কি হবে দিদি!

অঘোর সরকার যেন এক বিচিত্র নাটক দেখছিল। সে নাটকের শেষ এখনও বাকী। তারও ভয় করে ভগবান যেন আর কোন নিষ্ঠুর রসিকতা না করেন। বলে সে—আমি ঘাটে দেখছি মা, যদি কোন খবর আসে।

মুক্ত উদার গাং—দূরে দেখা যায় সমুদ্রের ঢেউগুলো—উঁচু স্তূপের মত হয়ে আসছে। লঞ্চটা ঘুরছে আবার খাড়ির ভিতর দিকে। নিশাকর, রতন চোখ মেলে বসে আছে সেই শয়তানের সন্ধানে, ভোর থেকে ওরা খুঁজছে তাকে। মাঝে মাঝে পিপে থেকে পচা মাংস—রক্তের তাল ফেলছে সমুদ্রে। কামট এর ঝাঁক ঘুরছে পিছু পিছু। নীল জলে ওদের রূপালী দেহগুলো চকচক করে।

রতন বলে—শালো গেল কুথায় গো খুড়ো—একেবারে নাপাত্তা হই গেল নাকি।

দুদিকের ছোট কামান দুটোতে টাটকা বারুদ পুরেছে সিসের বল ঠেসে যতীন, এদিকে মতি বসে আছে কামান আগলে।

নিশাকর বলে—মাছের চাওলা দেখছি তীর মুখো উজানে যাতিছে, মাহিন্দির বড়শি—দুতিনটে রামবড়শীতে টোপ গাঁথি ফেলি রাখ। লঞ্চের সাথি সাথি টানি যাবো টোপটারে।

ঝকঝকে ষ্টিল হুক-এর বিরাট বঁড়শীতে মাংসের তাল গেঁথে সরু তার দিয়ে আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে টোপ গাঁথছে মাহিন্দর। এক একটা টোপ প্রায় কেজি পাঁচেকের হবে। ষ্টিলরোপগুলো ড্রামে জড়ানো। সেই ষ্টিলরোপ থেকে ঝুলন্ত বঁড়শিগুলোকে ফেলেছে গভীর জলে। লঞ্চ চলেছে খাড়ির উজানে। দূরে দেখা যায় ক্ষীণ তটরেখা। সুমন্ত—ঘনশ্যাম দাঁড়িয়ে আছে ডেকে।

সুমন্তের হাতে বাইনাকুলার। সেও খুঁজছে গাং-এ কোন আলোড়ন—কিছু দেখা যায় কিনা। ঘনশ্যাম বলে—ব্যাটা শয়তান বোধ হয় কাছাকাছিই আছে সুমন্ত। ক'দিনেই তারা অনেক কাছে এসে গেছে। বিশেষ করে ঘনশ্যামের ভালো লাগে তরুণটিকে। কোন অহাঙ্কার নেই—আজ ঘনশ্যাম ওর কাছে কৃতজ্ঞ। সুমন্ত এই ডাকটা মেনে নিয়েছে।

—চা।

চা আর বিস্কুট খেতে খেতে দেখছে বিচিত্র এই জগৎকে সুমন্ত। ওর যেন ভালো লেগে গেছে।

মহেশ মান্না ভাবেনি যে তাড়াতাড়ি—এসব কাণ্ড ঘটে যাবে। তাই এবার চমকে উঠেছে। সকালেই আদালতের সমন এসেছে। ঘনশ্যামের আপীলের মামলার দিন পড়েছে। হাজির হতে হবে মহেশ মান্নাকে। সমনটা পেয়ে গর্জে ওঠে মহেশ—মামলা করা হয়েছে? আপীল। ওই মামলায় তেইশটা বাজিয়ে দিচ্ছি। গজেন!

গজেনই এখন একমাত্র বাহন। লোকটা বাদাবনের জানোয়ারের মত হিংস্র আর দুর্বার। কত্তাবাবুর ডাকে এগিয়ে আসে। মহেশ মান্না ভাবছে কথাটা। এবার সিদ্ধান্ত নেবে সে। বলে ওঠে মহেশ—গজেন! ওই বসন্তের মেয়েটাকে আজই রাতের মুখে জোর করে নৌকায় তুলে নে জম্বুদ্বীপের আবাদে চলে যাবি।

গজেন চমকে ওঠে। মেয়েটার উপর তার নজর অনেকদিন থেকেই রয়েছে। সুন্দরী রূপবতী মেয়েটার জন্য সেও ভেবেছে। কিন্তু এগোবার সাহস হয়নি। আজ মালিকের কথায় মনে মনে যেন স্বপ্ন দেখছে সে।

বলে মহেশ—কেউ জানবে না। জম্বু দ্বীপের নয়া আবাদে ওকে নিয়ে ঘর বাঁধবি। ওখানে পঞ্চাশ বিঘে সরেস জমি পাবি, আর হাজার টাকা নগদ। পারবি না?

গজেন বাদাবনের। অন্ধকারে তার চোখ জ্বলে। এবার সে ঘর বসত পাবে। সেখানের আবাদের সেই হবে নোতুন মহেশ মান্না। বলে গজেন—পারবো—আলবৎ পারবো।

মহেশ খুশী হয়—সাবাস। তাহলে দেরী করবি না। আজকের প্রথম রাতেই ভাটির মুখে ওটাকে সাফ করে নে চলে যা।

গজেন খুশি হয়ে বলে—তাই যাবো যখন বলছেন। তালে নৌকা তৈরী রাখতি হবে। জল খাবার—কাঠ কুটো তুলে নিতি বলি।

মহেশ সায় দেয়—তাই করগে। তবে হুঁশিয়ার। কেউ জানতে না পারে। মুখ বেঁধে তুলে নে যাবি।

এসব কাজ ভালোই পারে গজেন, ওকে শেখাতে হবে না। আর এমন সুযোগ জীবনে আর পাবে না, তাই গজেন সবদিক থেকে তৈরী হয়েই কাজটা করবে।

কমলাও ভাবনায় পড়েছে। কি অজানা ভয়ে বুক কাঁপে তার। এখনও কোন খবর পায়নি। তাই গেছে গিরিবালার কাছে।

সুধাময়ীকে দেখে অবাক হয় কমলা। আপনি।

সুধাময়ী দেখছে কমলাকে। সে বলে—ছেলেরা কোথায় গেছে, মায়ের মন। থাকাত পারলাম না তাই ছুটে এলাম বাছা। বড্ড ভয় করে।

কমলা নিজে ভীত হলেও সান্ত্বনা দেয়—না, না ভাবনার কিছু নেই। দেখবেন ঠিক ফিরে আসবে ওটাকে মেরে।

—তাই হোক মা। তাহলে দিনকতক তুমিও যাবে ওদের সঙ্গে সহরে।

কমলা কি ভাবছে। মনে পড়ে ঘনশ্যামের কথা। সেও স্বপ্ন দেখে ওরা দুজনে কোন নোতুন জগতে হারিয়ে গেছে। কমলা ঘাড় নাড়ে।

সেও তাই খবরের আশায় দুচোখ মেলে চেয়ে আছে দূর গাং-এর দিকে। সন্ধ্যা নামছে। শীতের সন্ধ্যা—আকাশের লাল রং ক্রমশঃ বেগুনে রং ধরে আঁধারে হারিয়ে যায়। তবু দেখা যায় না ওদের লঞ্চটা। দু'চারটে লঞ্চ যাত্রী—মালপত্র নিয়ে ওদিকে চলাচল করছে। তারাগুলো জেগে ওঠে আকাশে।

ফিরছে কমলা, ক্লান্ত ব্যর্থ মন নিয়ে। ঝাউবনে অন্ধকার নেমেছে। এদিকটা নির্জন, জোনাকি জ্বলে ঝোপে ঝোপে, ঢেউ ভাঙছে; গাং-এ ঝলসে ওঠে ফস-ফরাসের আভা।

হঠাৎ কার শক্ত হাতের চাপে চাইল, চীৎকার করার আগেই তার মুখে একটা গামছা ঠেসে দিয়ে ওর হাত দুটো বেঁধে ফেলে। ছটফট করেছে কমলা, কিন্তু করার কিছু নেই। ছায়ামূর্তির দলও ওকে তুলে নিয়ে ঝাউবনের মধ্য দিয়ে চলেছে খাড়ির দিকে।

দূরে নৌকার খোলে পুরেছে ওকে। ছটফট করছে কমলা। সে বুঝেছে বিপদের গুরুত্ব, কিন্তু সব বাধাই তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। কে বলে—ওটাকে দাড়ায় সাথে বাঁধি ফেলি রাখ। দেখিস যেন চেল্লাতি না পারে। গেরাপি তোল—

নৌকাটা অন্ধকারে ভেসে চলেছে। ভাটার টান তবু কয়েকটা দাঁড় পড়ছে —জোরে চলেছে নৌকা রাতের অন্ধকারে। গজেন বসে আছে ছই-এর বাইরে সাবধানী দৃষ্টি মেলে, কেউ টের পায়নি। নিঃশব্দে এমনি নিখুঁতভাবে এত বড় কাজটা হবে ভাবতেই পারেনি সে। এবার নিশ্চিন্ত হয়েছে।

রাত্রি নেমেছে কুলতলির হাটে, অন্যদিন হাটবারে লোকজন নৌকা ডিঙি আসতো, গাং-এ ভিড় জমতো। এখন ডাঙাপথে কিছু লোকজন আসে বিকি-কিনি করে চলে যায়। বাঁধি দোকানে দু'চারটে আছে মাত্র।

ওই গাং-এর ছোট খাড়িতে হাটের নীচে আজ রাতে এসে লঞ্চ ভিড়িয়েছে ঘনশ্যাম। দিনভোর ঘুরেছে, ইঞ্জিনটাকে বিশ্রাম দিতে হবে। নিজেদেরও বিশ্রাম চাই।

এর একটু পরেই লোকালয় শেষ, বাঁ হাতের ফোড়ন দিয়ে নৌকাগুলো বাদা-বনে যেতো। তাদের গতায়তও কম।

সুমন্ত দেখছে ঘুমনামা জগৎকে। দূরে গাজির গানের সুর ভেসে আসে, হাটতলার লোকজনও কমে গেছে। রান্না হচ্ছে লঞ্চে।

যাযাবর জীবনে সে অভ্যস্ত। বনে বনে ঘুরেছে বহু দিনরাত্রি। নদীর দেশে ঘুরে সে যেন অন্য জীবনকে দেখছে।

সকালের আগেই বের হয়েছে আবার। হাঙরটা কাল নাকি দেখা গেছে ওদিকের খাড়িতে। কোনরকমে একটা ফরেস্টের স্পিড বোট বের হয়ে এসেছে। ওকে দেখে, ইঞ্জিনের বিকট শব্দে হাঙরটা এগোয় নি।

ঘনশ্যাম বলে—তৈরী হয়ে নে চল সর্দার। ব্যাটা কাছাকাছিই আছে।

বাইনাকুলার দিয়ে দেখছে সুমন্ত চারদিক। হঠাৎ দূরে কি দেখে বলে ওঠে —ওটা কি ঘনশ্যাম?

ঘনশ্যামও দেখেছে নৌকটা, ওদিকে বাদাবনের গাং—কাঠ না হয় অন্য মালপত্র কিছু গোপনে আসে। তেমনি কারোও নৌকা হতে পারে। ঘনশ্যাম বলে—যেতে দাও না। হবে টানামালের নৌকা।

সুমন্ত বলে—কেমন সন্দেহ হচ্ছে। চলো তো ওদিকে—

ঘনশ্যাম হাসে—আরে বড় শিকারের সন্ধানে বের হয়ে চুনো পুঁটির পিছনে কেন? দেখি কি এত দেখছো ওদিকে?

গজেন এবার নিশ্চিন্ত হয়েছে, বড় গাং পাড়ি দিয়ে ওদিকের ফোড়নে ঢুকতে পারলে সুন্দরবনের ভিতর চলে যাবে, ওদিকে ভাটিতে জম্বু দ্বীপ। সেখানে নয়া আবাদ পত্তন করছে মহেশ মান্না। ওসব হবে গজেনের আবাদ।

কমলার মুখের বাঁধন খুলে দিয়েছে। জানে চীৎকার করলেও কিছু হবে না। গাং-এ পড়লে মৃত্যু। কমলা তবু বলে—কেন নিয়ে এলে?

হাসছে গজেন—এবার বিয়ে করে ঘর সংসার করব তাই। আমাকে পছন্দ হয় না? এঁ্যা—

—না। কুত্তা তুই।

গজেন একটা থাপ্পর মারতে পড়ে যায় কমলা। গজেন গর্জাচ্ছে—বেঁধে রাখ ওটাকে। এখনও তেল মরেনি। ঘনশ্যাম তোকে বাঁচাবে?

ঘনশ্যাম বাইনাকুলারে চোখ রেখে ওই নৌকার পাটাতনের দিকে চেয়েই চমকে ওঠে। তার চিনতে ভুল হয় নি। কমলাকে ঠিক চিনেছে সে। কার থাপ্পড় খেয়ে ছিটকে পড়লো সে। আর ওই লোকটাকেও চিনেছে। গজেনই।

গজেন ওকে নৌকায় জোর করে নিয়ে চলেছে

ঘনশ্যাম চীৎকার করে—মটরা। ফুল স্পিড লাগা। নিজে গিয়ে ষ্টিয়ারিং-এ বসেছে। নিমিষের মধ্যে লঞ্চটা দ্বিগুণ গতিবেগে ছুটে চলে। অবাক হয় সুমন্ত —কি ব্যাপার?

ঘনশ্যাম রাগে ফুলছে। বলে সে—ব্যাটা গজেনকে দেখছি—কমলাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে বাদাবনের দিকে।

নিশাকর ফুঁসে ওঠে—মহেশ মাল্লাও আছে নিশ্চয়। ধরো শালোর নৌকা। মাহিন্দর সড়কী—কোঁচ নে তৈরী থাক। শালাদের গেঁথে ফেলাব মাছ মারা কোঁচ দিই।

ইঞ্জিনের শব্দ শুনেছে মাঝিরা, দেখা যায় দিগন্ত ফুঁড়ে সাদা লঞ্চটা তেড়ে আসছে। ওদের চেনা লঞ্চ, হালের মাঝি চীৎকার করে।

—গজু লঞ্চটা ইদিকেই এসতিছে। ঘনাবাবুর লঞ্চ মনে লয়। গজেনও দেখেছে। এভাবে এখানেও ওই ঘনশ্যাম এসে পড়বে তা ভাবতে পারেনি ওরা। গজেন দেখছে চারিদিক। একটু ওদিকেই তীর আর এখানে সুন্দরবনের কেওড়া গরাণ, গেও গাছের ভিড়। সামনেই বাদাবনের খালটা চলে গেছে। দুদিকে অরণ্যভূমি। কেওড়া গাছগুলো নুইয়ে পড়েছে খালের জলের বুকে। ওই বনই তাদের লুকোবার জায়গা হতে পারে।

গজেন বলে—দুখান দাঁড় ফেল, সিধে সরু খাল দিই বনের মধ্যে সেঁদিয়ে চল। নাহলে ধরি ফেললে জান থাকবে না।

প্রাণের দায়ে ওরা বনের খালে ঢোকার জন্য চলেছে, ঘনশ্যাম বুঝতে পারে সেটা, সে লঞ্চটা এক পাক বেড় দিয়ে ওই খালের মুখের দিকেই চলেছে।

সুমন্তও তৈরী. তৈরী হয়েছে রতন, মাহিন্দর, রতনরা। ঘনশ্যামের লঞ্চ

দেখে চীৎকার করে ওঠে কমলা। একটা চীৎকার শান্ত গাং-এর বুক চিরে ভেসে আসে। চমকে ওঠে ঘনশ্যাম।

—বাঁচাও—

গজেন লাফ দিয়ে ওর মুখটা বাঁধবার চেষ্টা করে, খোলের নীচে ওকে লুকিয়ে রাখতে চায়। নৌকা ধরা পড়লেও কমলাকে যেন তারা তারা খুঁজে না পায়, তাহলেই ফিরে যাবে কিছু না করে।

কিন্তু লঞ্চটা এসে পড়েছে খালের মুখে, বলে ঢোকার পথ বন্ধ।

—গজেন।

গজেন তখন ব্যস্ত কমলাকে সামলাতে, লঞ্চটা একেবারে সামনে এসে পড়েছে গজেন চমকে ওঠে।

ঘনশ্যাম লঞ্চ-এর ডেক থেকে লাফ দিয়ে নেমেছে, আর্তনাদ করে ওঠে কমলা। গজেন সামনেই ঘনশ্যামকে দেখে একটা কুড়োল হাতের কাছে পেয়ে তুলে নেয়, কিন্তু ঘনশ্যাম-এর বেমক্কা লাথিতে ছিটকে পড়ে গজেন গাং এর জলে।

কমলাকে তুলে নিয়েছে নিশাকর সর্দার ওদের লঞ্চে। ক্লান্ত বিপর্যস্ত মেয়েটি কি অসহ্য উত্তেজনায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

এ নৌকার দাঁড়ি মাঝিরা মারের চোটে তখন পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে, দু একজন লাফ দিয়ে তীর ভূমিতে নেমে ঝোপ ঝাড়ের আড়াল দিয়ে পালাচ্ছে।

গজেন জোয়ারের স্রোতে চলেছে, সামনেই, তীরে ওঠার চেষ্টা করছে, হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে।

—ছোটাবাবু!

চীৎকার করছে গজেনও জল থেকে। একটু দূরেই ভেসে উঠেছে বিরাট হাঙরটা। সে যেন এদের লড়াই-এর সাক্ষী ছিল। এবার লড়াই-এর শেষে নিজে অবতীর্ণ হয়েছে আসরে। নীল জলের বুকে পালের মত পাখনাটা জেগে ওঠে, বিশাল মাথা মুখ হাঁ করে তেড়ে আসছে, ঝকঝক করে দাঁতগুলো, ল্যাজের একটা পাশ—পিঠ-এর লম্বা শির সব ভেসে উঠেছে।

গজেনের ভাসমান দেহটা নিমেষের মধ্যে ওই মুখগহ্বরে পুরে ডুব দিয়েছে। সুমন্ত চমকে ওঠে—এতবড় একটা জীব এভাবে আস্ত মানুষটাকে গিলে ফেলবে ভাবতেই পারে না।

গজেনের নামটা সে মুছে দিল মানুষের খাতা থেকে, সব হিসাব তার চুকে গেল। ঘনশ্যাম দেখছে বিস্মিত চাহনি মেলে জীবটাকে। এত কাছে রয়েছে সে তাদের এটা টের পায়নি। মনে হয় লঞ্চ-এর পিছনেই ঘুরছে সে মাংস-এর তালগুলো গিলে গিলে।

নিশাকর বলে—শালো পিছু পিছুই চলেছে ঘনাবাবু,

ঘনশ্যাম বলে—টোপগুলো যুৎ করে বেঁধে ফ্যাল, লঞ্চ নে চল মাঝ গাং-এ। ব্যাটা এখান থেকে সটকেছে।

নিশাকর বলে—প্যাট ভর্তি ওর, এখন গিলবে টোপ।

সুমন্ত বলে—ওদের খিদে মেটেনা ওতে। বরং রক্তমাংসের স্বাদ পেয়ে আরও লোভী হয়ে উঠবে। হয়তো টোপ গিলতে পারে।

মাহিন্দির, রতন টোপ বাঁধছে ইস্পাতের হুকে, ওরা কামান দুটোতেও নোতুন বারুদ পুরে তৈরী হয়ে নেয়। আবার সুরু হবে পরিক্রমা। শয়তানটাকে একবার দেখা দিয়েই আবার ডুবে গেছে। যেভাবে হোক ওটাকে পাকড়াতেই হবে।

ঘনশ্যামের খেয়াল হয় কমলার কথা। নীচের একটা বেঞ্চে উঠে বসেছে কমলা। চোখে তখনও আতঙ্কের ঘোর। ঘনশ্যামকে দেখে চাইল। দুচোখ জলে ভরে আসে তার।

ঘনশ্যাম বলে—ভয় কি! ওই শয়তানটাকে গিলেছে হাঙরে, না হলে ওকে তুলে এনে আমিই শেষ করতাম।

পটলা চা এনেছে। ঘনশ্যাম বলে—হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে নে। ক্রমশঃ কমলা সহজ হয়ে ওঠে কিছু সময়ের মধ্যে।

দেখছে সে লঞ্চটাকে। তার এসব যন্ত্রপাতিও অচেনা। সুমন্তকে দেখে চাইল। সুমন্ত বলে—ভালো আছেন তো?

হাসলো কমলা, মলিন বিষণ্ণ হাসি। তার কাছে জীবনটা যেন কেবল যন্ত্রণাতেই বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। বিস্তীর্ণ গাং—মুক্ত আকাশ বিরাট পৃথিবীর মাঝে তবু নিজের মনের অতলে কি আশ্বাস পেতে চেষ্টা করে সে।

ঘনশ্যাম বলে—তোকে পৌঁছে দে এসে আবার গাং-এ ঘুরতে হবে।

কমলার ফিরতে মন চায় না। জানে সেখানে অপেক্ষা করছে তার জন্য যন্ত্রণা আর অপবাদ। বলে সে—ফিরে কি হবে? তোমাদের সঙ্গেই থাকবো।

—সেকি! বিপদের মুখে রয়েছি রে। ঘনশ্যাম বলে—

কমলা চুপ করে থাকে। বলে সে—যা হবার হোক। এক সঙ্গেই ফিরতে পারি ফিরবো। তোমার বিপদে তবু তো পাশে থাকলাম।

ঘনশ্যাম দেখছে মেয়েটিকে। যেন কঠিন একটি সত্তা। অনেক ঠকে ঠকে এবার নিজেকে শক্ত করেছে সে আরো কঠিন সংগ্রামের জন্যই।

কমলা বলে—আমি যাবো না। আমার জন্য ভাবতে হবে না।

ঘনশ্যাম বলে—ঠিক আছে। তাহলে তুই চা, খাবার-টাবারগুলো কর।

খাবার মানে খিচুড়ই। ব্যস—দেখা যাক তারপর কি হয়।

লঞ্চটা ভেসে চলেছে নীল জলে। কয়েকটা টিন রোপে বাঁধা বড়শিতে ঝুলছে মাংসের তাল। ধীর, মন্থর গতিতে লঞ্চটা ভেসে চলেছে। রাত্রি নামে। ওরা লঞ্চ নিয়ে কোন লোকালয়ের নীচের খাড়িতে নোঙর করেছে যাযাবর প্রাণীদের মতই।

কমলাও এই বাঁধনহারা জীবনকে ভালোবাসে।

ঘনশ্যাম বলে—এই ভালো না রে? কোন বাঁধন নেই। শুধু ভেসে যাওয়া। রাত্রিতে কোথাও নোঙর করলাম এক ঘাটে, ভোরে আবার উধাও। কি বল সাহেব। নমুনাখানা দেখছো তো?

সুমন্ত বলে—দেখছি। মন্দ কি।

মহেশ মান্না এবার নিশ্চিন্ত হয়েছে। মামলার মূল সাক্ষী কমলাকেই চুপি-সাড়ে গায়েব করে দিয়েছে। এতক্ষণে ওরা বড় গাং পার হয়ে বাদাবনের ভিতর বহুদূর চলে গেছে। চার ভাটির পথ পার হয়ে জম্বুদ্বীপের আবাদ।

মহেশ নিশ্চিন্ত হয়েছে। পার ঘাটে বসে আছে—চারিদিকে খবর আসে।

কোথায় নাকি হাঙরটাকে দেখা গেছে। ঘনাবাবুর লঞ্চ ওর পাত্তা পায়নি। ওরা ঘুরছে।

হাসে মহেশ—ঘুরুক ওরা। মেলার দিন এগিয়ে আসছে। এদিকের গাং-এ বড় বড় ষ্টিমার আমদানী করা হচ্ছে যাত্রীদের কিছু পারাপার করা যাবে ওতে। আর লঞ্চ, ট্রলারগুলোও ঘুরছে। যাতে হাঙরটা ভয় পেয়ে এদিকে না আসে। তাই হয়তো সরে গেছে হাঙরটা।

নটবর মাষ্টার বলে—মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না মান্নাবাবু! কমলাকে—ওর বাবাও ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুজি করছে।

মহেশ মান্না খুশি হয় ভেবে যে কেউ তরে চক্রান্তটাকে জানতে পারেনি। সে রটিয়েছে গজেন সদরে গেছে ভোর বেলায় কি জরুরী কাজে। দু চার দিন দেরী হবে ফিরতে।

নরহরি ভটচাযও সমর্থন করে কথাটা—আমিও তাইতো ওকে চ্যবণপ্রাশ আনতি দেলাম। কদিন ঠাণ্ডায় জলে কাজ করতি হবে।

মহেশ বলে—গজেন থাকলেও লাগাতাম তাকে। তা হাঁ হে মাষ্টার, মেয়েটা আর কারোও সঙ্গে কেটে পড়ে নিতো। বি-ডি-ও অপিসের নোতুন ছোকরার সঙ্গে কথা টথা বলতো।

নটবর মাষ্টার এখনও কমলার আশা ছাড়েনি। বসন্ত পণ্ডিতকে নিয়ে তাই সে এসেছে মহেশের কাছে। মহেশ কাতর হয়ে বলে—কি ব্যাপার বসন্ত, এ্যা

খোঁজ খবর নিয়েছো তো? গাং-এ কোন বিপদ আপদ হয়নি?

বসন্ত খুঁজছে। বলে সে—দেখছি মামাবাবু, মা আমার অনেক দুঃখ পেয়ে বোধ হয় হারিয়ে গেল।

মামাবাবু বলে—থানাতেও খবর দিয়ে ছাখো। আমরাও দেখছি। এ ভালো কথা নয় হে! এ্যা—দিনদিন কি হচ্ছে?

নটবর বসন্তকে নিয়ে চলে গেল। দ্বীপের ওদিকে মন্দিরের ওখানে খুঁজতে।

গিরিবালাও খবরটা শুনে চমকে ওঠে। অঘোর সরকার বলে—খুঁজছে সবাই। মামাবাবুও জেলেদের ডেকেছেন যদি কোন খোঁজ মেলে।

সুধাময়ী অবাক হয়—লক্ষ্মী মেয়েটার জীবনে কম বিপদ যায়নি বাছা। ওদিকে ছেলে দুটোরও খবর নেই।

অঘোর বলে—কাল মনসাতলার গাং-এ দেখা গেছে তাদের।

খুশি হতে পারে না সুধাময়ী। সুমন্ত ঘুরতো এমনি বনে পর্বতে। আজ তাই বলে সে—ভালো বুঝছি না বাবা।

মহেশ মামা খুশি মনে ঘরে ফিরেই ভিতরের ঘরে মাঝি দুটোকে দেখে চাইল। কাদা মাথা—ঝড়ো কাকের মত চেহারা। লোকদুটো রাতভোর হাঁটাপথে এসে এখানে পৌঁচেছে খেয়া পার হয়ে। কান্নায় ভেঙে পড়ে তারা।

—কি হয়েছে? গর্জায় মহেশ মামা।

লোকদুটো সবিস্তারে বর্ণনা করে ঘটনাটা। মহেশ চমকে ওঠে—মেয়েটা কোথায়?

—মেয়েটাকে ঘনশ্যাম লঞ্চে তুলে নেছে।

গর্জে ওঠে মহেশ—ডুবিয়ে দিতে পারলি না ওটাকে? আর এসেছিস পোড়া মুখ নিয়ে সেই সুখবরটা দিতে? অপদার্থ—গর্জাচ্ছে মহেশ। এবার তার সব অপরাধই প্রকাশ পাবে। মায় কমলাকে পাচার করার ব্যাপারটা অবধি। মহেশ মামা ভাবছে কথাটা। বাঁচার কোন পথ নেই শুধু একটামাত্র পথই আছে, আর সেই শেষ পথ। অনেক বিপদ আর ঝক্কির সেই পথ। তবু সেই পথই নিতে হবে তাকে। গজেন নেই, না থাক—মাখন, হলধর আর কন্দর্প রায়ের সেই জলচর ডাকাতের দল আছে। ওরা চেনে এই গাং—ঘনশ্যাম ওদের ধরে একবার জেলে বাস করিয়েছে। তাদের রোজকার বন্ধ। মহেশ মামা ওদের দলকেই কাজে লাগাবে। মহেশ বলে—কন্দর্পকে ডাক। এখুনিই ডেকে আন। বাদাবনের বাঘের মত পায়চারী করছে মহেশ মামা।

রূপালী রোদ ঝিক মিক করে মুক্ত গাং-এর বিস্তারে। বিরাট প্রাণীটা জলের

নীচে বিশ্রাম করছে পাখনাগুলো মৃদুমৃদু নড়ছে। সমুদ্রের অতলে পাথর বালি গাছগুলোর চিহ্ন এখানে নেই। জলও অস্বচ্ছ—কাদা পাক ওঠে ঘূর্ণিতে। হাঙরটা পাখনা নাড়ছে—হঠাৎ তার মনে হয় খিদে পেয়েছে। মাছগুলোও নেই। ঝাঁকবন্দী মাছ সরে গেছে তার আসার খবর পেয়ে। উঠেছে হাঙরটা জল ঠেলে। সামনে কয়েকটা মাংসের তাল—নোনাজলে ধুয়ে ধুয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। নড়ছে স্রোতের টানে—হাঙরটা দেখছে—কোন প্রাণীই হবে। এগিয়ে আসে—বিশাল হাঁ-এর মধ্যে এক সঙ্গে তিনটে তাল পুরে একেবারে পাকস্থলীতে চালান করে দিয়ে সরে যাবে অকস্মাৎ হঠাৎ বোধহয় মুখে কি আটকে গেছে—আর বিশাল পাকস্থলীর নরম জায়গায় শক্ত মত বস্তুগুলো আটকে গেছে। যন্ত্রণা হয়, নড়তে গেলেই কষ্ট হচ্ছে—টান পড়ছে। মনে হয় বুকটা ফেটে যাবে। সরে যাবার উপায় নেই। হাঙরটা এবার মুখের মধ্যে ওই স্টিল রোপগুলো কাটার চেষ্টা করছে। কট কট শব্দ ওঠে। দাঁতগুলোর দু চারটে ভেঙে যায়—যন্ত্রণা হচ্ছে। কাঁটা তারগুলো নরম মাড়িতে, ঠোঁটে চেপে বসেছে—রক্ত ঝরছে। ভয়ে কাটার চেষ্টাও করে না আর। ঠেলে উঠছে এবার। সঙ্গে সঙ্গে উঠছে সেই স্টিল রোপগুলোও।

নিশাকর হাঁক পাড়ে—হুঁশিয়ার। ছোটবাবু ব্যাটা গিলেছে গো। ঘনশ্যামও তৈরী হয়। মাহিন্দর, রতনা, গেঁটে নিয়ে তৈরী থাক। রঞ্জঘরে আগুন দিবি হাঁক পাড়লেই—পটলা। ঘণ্টা বাজছে ইঞ্জিনে।

সুমন্তও বুঝেছে এতদিন রাতের প্রতীক্ষার পর এবার লড়াই শুরু হয়েছে। জীবনপণ লড়াই।

আলগা স্টিলরোপ সমেত একটু ওদিকে জল ঠেলে উঠেছে হাঙরটা মুখে স্টিল-রোপ তিনটে আটকানো, রক্ত ঝরছে। বিশাল হাঁ এর মধ্যে দেখা যায় রোপ-গুলো বঁড়শী সমেত আরও ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করার জন্য সাপট মারে সে, কিন্তু কঁকিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। পারে না। এবার তাই স্থির দৃষ্টিতে লঞ্চটাকে দেখে নয়, বুঝেছে। ওই তার শত্রু। তীব্র বেগে ছুটে আসছে হাঙরটা। এক ঝাপটায় লঞ্চ চুরমার করে দেবে। চীৎকার করে ঘনশ্যাম—মাহিন্দির, রতনা। গেঁটে দাগ—শালাকে উড়িয়ে দিতে হবে। মাথায়—সুমন্ত। গুলি করো। ওদের চীৎকার করে নিজে লঞ্চটাকে ওর গতিপথের সামনে থেকে এক মোচড়ে সরিয়ে নেয়, বিশাল মাথাটা এগিয়ে আসছে—হঠাৎ গর্জে ওঠে গেঁটে দুটো। মাথাতেই লেগেছে সামনের কামানের বলগুলো, প্রচণ্ড আঘাতে হাড় মাংস ছিটকে ওঠে, অন্য গেঁটেটার গোলা লেগেছে বিশাল পেটে।

সুমন্তও গুলি চালিয়েছে, পিঠের শিরদাঁড়া ছুঁড়ে বুলেটগুলো জলে ছিটকে যায়। দু একটা লেগেছে বোধ হয়।

হাঙরটা এতদিন নির্ভয়ে আক্রমণ করেছে কিন্তু এই প্রথম এই কঠিন বাধা পাবে ভাবতে পারেনি। মাথার একটা দিক—একটা চোখ বোধহয় উড়ে গেছে। পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা। গা থেকে মাংস গর্ত হয়ে উঠে গেছে—রক্তে লাল হয়ে যায় জল। ডুব দিয়েছে সে। এবার বুঝেছে হাঙরটা পালাতে হবে। মুক্ত সমুদ্রের দিকে ছুটেছে সে। হুইল ড্রাম থেকে হুইল রোপটা বের হচ্ছে, তিনটে ড্রামই বোধ হয় খালি হয়ে যাবে। লঞ্চটাও ছুটেছে ওর পিছনে।

লঞ্চটাকে টেনে নিয়ে চলেছে সে মুক্ত সমুদ্রের দিকে। চীৎকার করে নিশাকর—ছোটবাবু। দরিয়ায় নে যাবে ব্যাটা। লঞ্চ রাখতি পারবেন না। রোপ কাটিদিই—শালা ভেগে যাবে।

গর্জাচ্ছে ঘনশ্যাম—না। শেষ দেখবো ব্যাটার। ফুলস্পিড দে পটলা।

একশো পঁচিশ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিনটা গর্জে ওঠে পুরো শক্তি নিয়ে। আর ভাগ্যও সুপ্রসন্ন। জোয়ার আসছে—কোটালের ভরা জোয়ার। জল ঠেলছে সমুদ্র থেকে খাঁড়ির উজানে। ঘনশ্যামও লঞ্চটাকে এবার রুখেছে। ক্রমশ বুঝতে পারে হাঙরটার সেই টান আর নেই, দম ফুরিয়ে আসছে। ঘনশ্যাম লঞ্চটাকে স্পিড দেয়, কিন্তু অনড় লঞ্চ।

তখনও টানছে হাঙরটা প্রাণপণে—দুদিকের টানে হুইলরোপগুলো কড় কড় করছে। কেটে গেলে লঞ্চ ছিটকে পড়বে।

ছোটবাবু।

ঘনশ্যাম-এর হাতে ষ্টিয়ারিং—যেন লঞ্চটার নাড়ি ধরে আছে সে। ক্রমশ বুঝতে পারে সেই জয়ী হবে। লঞ্চটা নড়ছে—ভাটিতে নয়। চলছে এবার লঞ্চটা ভিতরের গাং-এর দিকে। হাঙরটাকে এবার সেইই টেনে নিয়ে চলেছে বেশ কিছুক্ষণ দাপাদাপির পর।

ক্লান্ত রক্তাক্ত জানোয়ারটা বন্দী অবস্থায় নীচে ছটফট করছে। নোনাজলে ক্ষতগুলো জলছে। পাকস্থলী—নাড়ি-ভুড়িগুলোতে আটকে গেছে বড় বড় বঁড়শীগুলো। টানাটানিতে বোধহয় একটা বঁড়শী এসে হৃৎপিণ্ডেই গেঁথেছে। দম নিতে কষ্ট হয়। ভারি হয়ে আসছে দেহটা। পাখনাটা নাড়তে পারে না। হাড়গুলো গুঁড়িয়ে গেছে। একটা চোখ বুঝে গেছে। ধুঁকছে সে।

টেনে নিয়ে চলেছে জানোয়ারটাকে। যন্ত্রণার ভয়ে সেও চলেছে জলের নীচে ভেসে ভেসে। শক্তিটুকু আহরণ-এর চেষ্টা করছে। এবার আবার হানা দেবে সে।

খবরটা পৌঁছে গেছে কামটের ঝাঁকগুলোর কাছে। এতদিন তারাই ভয়ে ভয়ে সরে গেছে ওই হাঙরটার ত্রিসীমানা থেকে। এবার তারা এগিয়ে আসে। রক্ত—নরম মাংস-এর স্বাদ পেয়েছে তারা।

বৈকাল হয়ে গেছে—এর মধ্যে ঘন্টা চার পাঁচ কোনদিকে কেটে গেছে। ওরা তৈরী—মাহিন্দির গেঁটে বোঝাই করছে আবার।

নির্জন গাং—হঠাৎ নিশাকর চীৎকার করে—ছোটবাবু, কামটের ঝাঁক লাগিছে—শালোর গায়ে।

সাংঘাতিক জীব ওরা। জলের মধ্যে ধারালো দাঁত দিয়ে খুবলে চেছে নেবে মাংস। রক্তের স্বাদ পেয়ে এবার তারা শয়ে শয়ে এসে জুটেছে।

হাঙরটাও বুঝেছে, বাঁচার পথ নাই। তাই মরীয়া হয়েই এবার মাথা তোলে সে। নিশ্বাস নিচ্ছে ওদিকে।

বীভৎস রক্তাক্ত মাথা, দেহ, পিঠটা গর্ত হয়ে গেছে। সেই তেজ আর নেই। এখন বীভৎস দেখায় তাকে।

আবার এগিয়ে আসছে সে, তেমন তেজ নেই—তবু মরীয়া সে। আর তারজন্য সেই অভ্যর্থনাই হয়। গেঁটেগুলো তার দেহটাকে থেঁতলে দিয়েছে।

ঘনশ্যাম হাঁকে—সুমন্ত, ল্যাজ, ল্যাজটা উড়িয়ে দাও। পরপর কয়েকটা বুলেট শিরদাঁড়া—ল্যাজ-এর হাড়েই লেগেছে। আবার ডুবে যায় সেটা। রক্তের রেখা জাগে জলে। কামটগুলো সরে গেছল—আবার ভিড় করে তারা।

ওই ঝাঁকুনি—আর প্রচণ্ড ধাক্কায় লঞ্চের কাচগুলো ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে। ল্যাজের ঝাপটে পিছনের রান্নাঘরের কাঠগুলো খুলে গাং-এ পড়েছে।

নিশাকর হাঁপাচ্ছে।

বলে সে—ওকে সামলাতি পারবে না ছোটবাবু। রাত নামছে—রোপ কাটি দিই। তবু জানে বাঁচবো।

কাঁচের টুকরোয় ঘনশ্যামের হাত মুখ কেটে গেছে। ছিটকে পড়েছে সুমন্ত। তবু ঘনশ্যাম বলে—না। শেষ দেখতি হবে ব্যাটার।

রেডি কর গেঁটে, ব্যাটাকে উড়িয়ে দিবি। সর্দার, এবার ঝাপটালে ওই তারের ফাঁসির মধ্যে ল্যাজটাকে জড়াতি হবে। ল্যাজখান আটকাতি হবে। ব্যস!

কয়েক মিনিট পরই আবার হানা দেয় সেটা—মরীয়া হয়ে গেছে সে। হাঙরটা বুঝেছে যা করার শীঘ্রই করতে হবে। তাই এবার কাছাকাছি ভেসে উঠেছে। ল্যাজটা শূন্যে তুলেছে—রক্তাক্ত হাড় মাংস বের হওয়া ল্যাজটা। এক ঘা মারতে পারলেই ছিটকে দেবে লঞ্চটাকে—

তার আগেই ঘনশ্যাম নিমেষের মধ্যে সরিয়ে নিয়েছে লঞ্চটাকে—আর

নিশাকরও খুঁজে উৎক্ষিপ্ত ল্যাজ লক্ষ্য করে ফাঁসটা ছুঁড়েছে। সুমন্তও গুলি করে। ল্যাজের হাড় মাংস নদীতে ছিটকে পড়ে ধোঁয়া গর্জনের সাথে। আটকে গেছে ল্যাজ, সেই ফাঁসে। বিরাট হাঁ মুখের ভিতর মাহিন্দির গেঁটের জলন্ত গোলা আর ধোঁয়াগুলোকে সেঁদিয়েছে।

ওদিকে চিৎ হয়ে পড়ে হাঙরটা প্রচণ্ড আক্রমণে। চিৎকার করে নিশাপতি —কিন্তু হাঙরটা সামলে নিয়ে এবারও তলিয়ে যায়।

ঘনশ্যাম বলে—শালা এখনও খতম হয়নি সর্দার। ভোগাবে রাত ভর। চল ব্যাটা—

লঞ্চটাকে নিয়ে চলেছে ঘনশ্যাম নদীর ধারের দিকে। আজ রাতে সজাগ হয়ে থাকতে হবে। ও ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই—এখনও লড়বে সে।

মহেশ মান্না বের হয়েছে রাতের অন্ধকারে। কন্দর্পের দলও তৈরী।

রাতের অন্ধকারে ঘনশ্যামদের লঞ্চটাকে খুঁজে ফিরছে। দ্রুতগামী বাইশ দাঁড়ের ছিপ চলেছে জল কেটে, মহেশ মান্না জানে ঘুমন্ত অবস্থায় মাঝ গাং-এ লঞ্চটাকে ফাটিয়ে দিতে পারলে ডুবেই শেষ হয়ে যাবে ওরা।

খবর পেয়েছে মনসাতলির গাং-এর ওদিকেই আছে। মহেশ দেখছে চারিদিক। দূরে দেখা যায় লঞ্চের মাষ্টার ল্যাম্পটা।

ওরা এগিয়ে চলেছে। আবছা অন্ধকারে লঞ্চটাকে দেখছে মহেশ। ঘনশ্যামের লঞ্চই। ছিপের বৈঠাগুলো থেমে গেছে। নীরব চারিদিক, মহেশ ওই ছিপ থেকেই গুলি করে।

স্তব্ধতার মধ্যে গুলির শব্দটা ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

চমকে ওঠে ঘনশ্যাম। হাঙরটা বাঁধা রয়েছে লঞ্চের সঙ্গে। জোরে যেতে পারে না। মুমূর্ষু হাঙরটা তখনও আর্তনাদ করছে—ক্ষীণ হয়ে আসছে ওর প্রাণশক্তি।

ওরা সকলেই সজাগ, হঠাৎ গুলিটা লঞ্চের মাথার উপর দিয়ে বের হয়ে যেতে দেখে চিৎকার করে—লঞ্চের স্পটলাইটটা ফেলতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গাং-এর বুক—দূরে দেখা যায় ছিপটা।

—ডাকাতের ছিপ গো!

সুমন্তও গুলি চালিয়েছে, আর মাহিন্দিরও গেঁটেতে আগুন দেয়—একসঙ্গে গর্জে ওঠে কামান দুটো। দু একটা শিসের গোলা এসে পড়েছে নৌকায়—কে ছিটকে পড়ে। ওরা পালাচ্ছে, মহেশের হাতে লেগেছে ছড়রার টুকরো। অন্ধকারেই ওরা সরে আসছে।

কে বলে—ঘনাবাবুর লঞ্চে চড়াও হতি আছিলে কত্তা। দিমু তোমারে গাং-এ বুড়াই। এই তোমার মতলব।

মহেশ মাঝি আর্তনাদ করে—ভুল হয়ে গেছে রে। ভাবিনি ওর ছিপ।

আহত মহেশ ফিরছে কোনমতে। আজ তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেছে।

সকাল হয়েছে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সংবাদটা। ঘনশ্যাম তিনদিন পর হাঙরটাকে মেরেছে। সারা গাং-এ হৈ চৈ পড়ে যায়। আসছে ওরা।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ঘনশ্যাম। বন্দী হাঙরটা এবার ভেসে উঠেছে—লঞ্চের পিছনে আর একটা বড় নৌকা যেন টেনে আনছে ও। চারিদিকের বসতের, গঞ্জের মানুষ ডিঙ্গি নিয়ে ধেয়ে আসে। আর ভয় নেই—শত্রু নিপাত হয়েছে। গঞ্জেও খবর আসে।

সারা গঞ্জের মানুষ ভেঙে পড়েছে। ছুটে এসেছে জেলেপাড়ার লোকজন, কদমও। ওরা রসি বেঁধে ডিঙ্গি নামিয়ে ক্ষতবিক্ষত বিরাট জীবটাকে বাঁশ দিয়ে ঠেলে আনছে বালিচরে।

....ছুটে এসেছে গিরিবালা, সুধাময়ী। ওদিকের লঞ্চ—পুলিশ লঞ্চও এসে গেছে। ফটো তুলছে তারা।

সুধাময়ী এগিয়ে আসে।

আধভাঙা লঞ্চটাকে দেখে সে, মনে হয় কোন রকমে ফিরে এসেছে তারা অনেক ভাগ্যে।

সুমন্ত এগিয়ে আসে—মা!

ঘনশ্যাম দাঁড়িয়ে দেখছে, আজ তার মা নেই যে কাছে টেনে নেবে। হঠাৎ চমকে ওঠে ঘনশ্যাম।

সুধাময়ী ওকে কাছে টেনে নেয়—আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে সে।

সুমন্তও অবাক হয়—মা!

সুধাময়ী বলে—তুই জানিস না সুমন্ত, ওকে তুইও চিনতে পারিসনি। ওরে আমি—আমি প্রথম দিনই ওকে দেখে চিনেছিলাম।

সেই চাহনি—

আজ আমি সব ফিরে পেয়েছি রে মা গঙ্গার দয়ায়। আমার সব কিছু।

বসন্ত ছুটে আসে। কমলাকে সে দেখছে লঞ্চ থেকে নামতে।

সারা গঞ্জের মানুষ ভেঙে পড়ে। নদীর বুকে শুরু হয় নৌকা ডিঙির ভিড়। হাজার হাজার যাত্রী আসছে তীর্থে। বালিচর—দ্বীপের বুকে মানুষের পায়ের চিহ্ন। আবার শান্তি নেমেছে মানুষের মনে।

একজন থমকে দাঁড়ালো। মহেশ মান্নাও এসেছে, দেখছে ওই জানোয়ারটাকে। ঘনশ্যামের কাছে সে নিহত। মহেশ মান্না হঠাৎ চাইল—ঘনশ্যামকে দেখে। ক্লান্ত বিপর্যস্ত চেহারা। ঘনশ্যামের কাছে আজ সব কেমন বিচিত্র ঠেকে। সে জানতো না তার পরিচয়।

কিন্তু মনে হয় এখানেরই মানুষদের একজন সে। এদেরই দুঃখ বিপদে সে আছে—থাকবে। এই মাটি—এই দ্বীপ—এই গাং তাকে দিয়েছে অনেক।

হঠাৎ মহেশকে দেখে চাইল।

নিহত হাঙ্গরটার মতই ওকেও একদিন শেষ করবে সে।

ঘনশ্যাম বলে—তোমার হিসাবও বাকী আছে মান্নাবাবু। বিচারে যা হবার হোক—আমার হিসেব মিটিয়ে দিতেই হবে।

মহেশ দেখছে ওকে।

মনে হয় এত বুদ্ধি কৌশল অর্থ দিয়েও ওই সত্যের কাছে সে হেরে গেছে। তাকে জয় করা যাবে না।

সুধাময়ী চেয়ে থাকে ঘনশ্যামের দিকে।

সুমন্ত শুনেছে সব। আজ তাদের সামনে নোতুন কি পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নোতুন আলোয়।

ঘনশ্যাম বলে—এখানেই আমি মানুষ মা, এই মাটিই আমার ঘরবাড়ি—এদেরই একজন আমি। সেইটাই বড় পরিচয়, এখানেই থাকতে হবে আমায় যদি খালাস পাই।

কমলাও চলেছে ওদের সঙ্গে। মামলার দিন পড়েছে আগামী পরশু।

মহেশ জানে এ মামলায় কি হবে। তার সাজানো সমাজ হারিয়ে যাবে। সেও চলেছে সদরে।

জনসমুদ্র নেমেছে দ্বীপের মন্দিরে, বালিচরে। ঘণ্টাধ্বনি ওঠে—বাতাসে ভেসে আসে গঙ্গা বন্দনার স্তোত্রের সুর। নৌকা, ডিঙ্গি-তে যাত্রীরা চলেছে। পথ মুক্ত, বিপদ মুক্ত হয়েছে তারা।

আবার ফিরে আসবে ঘনশ্যাম এই দ্বীপেই, এদের মধ্যে। সত্যকে শেষ করার সাধ্যি মহেশ মান্নার নেই। ঘনশ্যাম তা জানে।

সুধাময়ী দেখছে ওকে। তার ছোট্ট হারানো শিশু আজ এই মাটিতে নোতুন করে বেঁচে উঠেছে। ওই মাটি, সমুদ্র, উদ্বেল ঝড়ো-হাওয়া আর এখানের জীবনে সে এনেছে নোতুন কি সাড়া।

এই হেমন্তকে আজ সে চেনে না, ফিরে পেয়েও আবার তাকে তার এই অসীম জগতেই রেখে যেতে হবে। তবু একটি সুর জাগে—তারই সন্তান। সে আজও বেঁচে আছে নোতুন এক পরিচয়ে, ঘর বাঁধবে। সুখী হবে।